Dhaka University Institutional Repository

পরিবেশ নীতিবিদ্যায় মানবকেন্দ্রিকতাবাদের ভূমিকা

এম.ফিল. গবেষক

নাসরিন আক্তার, প্রভাষক, দর্শন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

রেজিস্ট্রেশন নং : ০৪৬, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

তত্ত্বাবধায়ক

ড. জসীম উদ্দিন

অধ্যাপক

দর্শন বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মে, ২০২১

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

আমার পরম শ্রদ্ধেয় মা-বাবা এবং শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপক ড. জসীম উদ্দিন এর প্রতি গবেষণাকর্ম উৎসর্গিত, যাঁদের নিরবচ্ছিন্ন
স্নেহ- মমতায় আমি লালিত পালিত ও বিকশিত হয়েছি।

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি নাসরিন আক্তার, রেজিস্ট্রেশন নং: ০৪৬, শিক্ষাবর্ষ: ২০১৪-২০১৫, এম. ফিল. গবেষক, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, এ মর্মে ঘোষণা দিচ্ছি যে, অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ড. জসীম উদ্দিন এর তত্ত্বাবধানে এক বছর কোর্সওয়ার্ক সমাপ্তির পর "পরিবেশ নীতিবিদ্যায় মানবকেন্দ্রিকতাবাদের ভূমিকা" শীর্ষক যে গবেষণাকর্মটি আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. ফিল. ডিগ্রি প্রাপ্তির লক্ষ্যে দাখিল করেছি, তাতে 'রিচার্স মেথোড' যথাযথ মেনে চলার চেষ্টা করেছি। এরপরও এই অভিসন্দর্ভে কোন ত্রুটি- বিচ্যুতি থেকে গেলে, তার দায়-দায়িত্ব ব্যক্তিগতভাবে আমার। আমি এও ঘোষণা করছি যে, কোন ধরনের আর্টিকেল, সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা বা অন্য কোন ডিগ্রী গ্রহণের উদ্দেশ্যে এই অভিসন্দর্ভটি বা এর অংশবিশেষ ইতোপূর্বে কোথাও দাখিল করিনি।

নাসরিন আক্তার
এম. ফিল. গবেষক
দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

আমি নিম্নসাক্ষরকারী এই মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রভাষক জনাব নাসরিন আক্তার কর্তৃক উপস্থাপিত "পরিবেশ নীতিবিদ্যায় মানবকেন্দ্রিকতাবাদের ভূমিকা" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বধানে সম্পন্ন হয়েছে। অভিসন্দর্ভটি গবেষকের একক মৌলিক গবেষণার ফল। তিনি এই অভিসন্দর্ভটি সামগ্রিক বা আংশিকভাবে অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোনো প্রকার ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করেননি। আমি অভিসন্দর্ভটি মনোযোগ দিয়ে পড়েছি এবং এর মৌলিকত্ব বিচার করে অভিসন্দর্ভটিকে এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপন করার অনুমতি প্রদান করছি।

অধ্যাপক ড. জসীম উদ্দিন
তত্ত্বাবধায়ক
দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তারিখ: মে, ২০২১

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এম.ফিল. ডিগ্রি অর্জনের লক্ষ্যে আমাকে গবেষণার সুযোগ প্রদান করায় আমি সর্বপ্রথম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। গবেষণার কাজে যাঁর নাম গভীর শ্রদ্ধাভরে উল্লেখ করতে হয় তিনি আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. জসীম উদ্দিন। সীমাহীন ব্যস্ততার মাঝেও তিনি অকৃপণভাবে আমাকে সময় দিয়েছেন এবং পুরো কাজটি যে নিঁখুতভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন তার কোন তুলনা নেই। দীর্ঘদিন ধরে তাঁর গবেষণা নির্দেশনার ফলে এবং অকৃত্রিম সহযোগিতার জন্যই আমার অভিসন্দর্ভ জমা দেওয়া সম্ভব হল। দেশী-বিদেশী পুস্তক, গবেষণা জার্নালসহ বিভিন্ন উপাত্ত সরবরাহ ও সযত্ন তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে শ্রদ্ধেয় স্যারের যথাযথ নির্দেশনাই মূলতঃ আমার কাজের গতি সঞ্চার করেছে। ব্যক্তিগত পর্যায়ে তাঁর সহমর্মিতা ভুলার নয়। এজন্য আমি স্যারের নিকট চিরঋণী।

আমার গবেষণাকর্মকে প্রাণবন্ত রাখার জন্য পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ড. এম. মতিউর রহমান এর নিকট কৃতজ্ঞ। তাছাড়া এ গবেষণাকর্ম সম্পাদন করতে গিয়ে আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের সম্মানিত শিক্ষকমন্ডলীর যথেষ্ট সহযোগিতা পেয়েছি। এক্ষেত্রে আমি বিশেষভাবে ড.ইকবাল শাহীন খান স্যারের নাম উল্লেখ করতে চাই। তাঁর সুচিন্তিত মতামত, সার্বক্ষনিক পরামর্শ ও সহযোগিতা, আন্তরিকতা ভাষায় প্রকাশের উর্ধ্বে এবং তাঁর ঋণ অপরিশোধ্য।

গবেষণার উপাত্ত সংগ্রহ করতে গিয়ে আমি যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা পেয়েছি সেগুলোর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, সেমিনার, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বিভাগের সেমিনার, চট্টগ্রাম পাবলিক লাইব্রেরী, চট্টগ্রাম খ্রিষ্টান মিশনারী, মন্দির, প্যাগোডা - এসব প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

গবেষণাকর্মে যাদের সহযোগিতা পেয়েছি তাদের মধ্যে আমার বাবা-মা, ভাই-বোন ও আমার জীবনসঙ্গী রাফিউল ইসলাম অন্যতম। তারা আমাকে গবেষণার প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে সাহস ও উৎসাহ দিয়ে সহায়তা করেছেন।

নাসরিন আক্তার

প্রভাষক

দর্শন বিভাগ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

তারিখ: মে, ২০২১, E-mail: nasrinakterphilcu@gmail.com

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

পরিবেশ নীতিবিদ্যা হল মানুষের সাথে প্রকৃতির বিভিন্ন প্রজাতি এবং প্রাকৃতিক সত্তাসমূহের মধ্যকার নৈতিক সম্পর্ক। এটি মূলত পরিবেশগত সুরক্ষার জন্য যে নৈতিক বাধ্যবাধকতাগুলো রয়েছে তাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে। পরিবেশ সংকট মোকাবেলা করে নিরাপদ ও সুরক্ষিত পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য পরিবেশ নীতিবিদ্যার গুরূত্ব রয়েছে। বর্তমান বিশ্বে বিজ্ঞানের প্রযুক্তিগত আবিষ্কারের প্রসারণ, শিল্পায়ন ও জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির ফলে ওজনস্তরের ক্ষয়, জীব-মন্ডলের পরিবর্তন, ভূপৃষ্ঠের উষ্ণতা বৃদ্ধি ইত্যাদি পরিবেশগত সংকটের সৃষ্টি হচ্ছে এবং ফলশ্রুতিতে প্রাকৃতিক সম্পদ হ্রাস পাচ্ছে ও এ পৃথিবী বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়ছে। এ থেকে পরিত্রাণের জন্য বিজ্ঞানীদের পাশাপাশি দার্শনিকগণও কতগুলো নৈতিক নীতিমালা প্রণয়ন করেন। এ নীতিমালাগুলোর বাস্তবায়ন পরিবেশ সুরক্ষায় বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে। ধরিত্রীর বুকে টিকে থাকতে হলে পরিবেশের সাথে আমাদের কার্যাদি পরিকল্পনাভিত্তিক ও নৈতিক হতে হবে। পরিবেশ নীতিবিদ্যা পরিবেশের প্রতি মানুষের যে নীতিবোধ এবং নৈতিক বাধ্যবাধকতাগুলো রয়েছে তা চিহ্নিত করতে সাহায্য করে। দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পরিবেশসংক্রান্ত আলোচনা দুটো মতবাদকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এগুলো হলো: মানবকেন্দ্রিকতাবাদ ও অ-মানবকেন্দ্রিকতাবাদ। মানবকেন্দ্রিকতাবাদ অনুসারে, সকল পরিবেশগত বিষয়গুলো মানুষের স্বার্থসংশিষ্ট হওয়া উচিত এবং পরিবেশগত নীতিমালাগুলো কেবল মানুষের উপর ভিত্তি করে মূল্যায়িত হবে। অন্যান্য অ-মানব যেমন: উদ্ভিদ ও প্রাণীসমূহের অস্তিত্ব কেবল মানবসত্তার ব্যবহারের সামগ্রী। তাছাড়া মানবকেন্দ্রিকতাবাদ মানুষ ব্যতীত প্রকৃতির অন্যান্য প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতকে কেবল পরতঃমূল্যের অধিকারী হিসেবে গণ্য করে থাকে। মানবকেন্দ্রিকতাবাদের দার্শনিক ভিত্তি দাবি করে যে, নৈতিক নীতিমালা কেবল মানুষের উপর প্রযোজ্য এবং মানুষের প্রয়োজন ও অধিকার সর্বোচ্চ, মূল্যবান এবং গুরুত্বপূর্ণ। এ মতবাদ মানুষের নিজের স্বার্থে ব্যবহারের ও ভোগের জন্য প্রকৃতির উপর মানবকর্তৃত্বকে অনুমোদন করে। পক্ষান্তরে অ-মানবকেন্দ্রিক মতবাদ কেবল মানুষ নয়, বরং মানুষসহ অ-মানব প্রাণী এবং প্রাকৃতিক সত্তাকে নৈতিক জগতের সদস্য হিসেবে মনে করে। এ মতানুসারে মানুষ প্রকৃতির অন্যান্য উপাদানের ন্যায় একজন সদস্যমাত্র।

অনেক পরিবেশ দার্শনিক বর্তমান পরিবেশ সংকটের জন্য মানবকেন্দ্রিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে দায়ী করেন। মানবকেন্দ্রিকতাবাদের এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গিকে খন্ডনের জন্য আমার এ প্রচেষ্টা।

Dhaka University Institutional Repository

মানবকেন্দ্রিকতাবাদ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। এর মধ্যে সবল ও দুর্বল অর্থে মানবকেন্দ্রিকতাবাদ অন্যতম। আমি এ গবেষণায় দেখানোর চেষ্টা করব যে মানবকেন্দ্রিকতাবাদের বিভিন্ন অর্থের মধ্যে সবল অর্থে মানবকেন্দ্রিকতাবাদ পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে হুমকিস্বরূপ হতে পারে কিন্তু দুর্বল অর্থে মানবকেন্দ্রিকতাবাদ পরিবেশ রক্ষায় এবং এ পৃথিবীকে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারে। পাশাপাশি আমি এটাও দেখানোর চেষ্টা করব যে, অ-মানবকেন্দ্রিক মতবাদ অবৈজ্ঞানিক, অবাস্তব এবং আবেগনির্ভর।

এ গবেষণার প্রধান ক্ষেত্র পরিবেশকেন্দ্রিক আলোচনায় নীতিবিদ্যার স্থান। পরিবেশসম্বন্ধীয় দার্শনিক আলোচনার দৃষ্টিভঙ্গিসমূহ, যেমন- মানবকেন্দ্রিকতাবাদ ও অ-মানবকেন্দ্রিকতাবাদ আলোচনার মূল বিষয়। মানবকেন্দ্রিকতাবাদের সবল ও দুর্বল অর্থ ব্যাখায় স্বতঃমূল্য ও পরতঃমূল্যও সংযোজন করব। এ গবেষণায় দুর্বল মানবকেন্দ্রিকতাবাদের অনুকূলে যে সকল মতবাদ রয়েছে সেগুলোর আলোচনা করা হবে। তাছাড়া অ-মানবকেন্দ্রিকতাবাদের (লিওপোল্ড, রলস্টন প্রমুখ এর সমর্থক) বিভিন্ন দিক আলোচনা করা হবে।

মূলতঃ পরিবেশের জন্য অনুকূল মতবাদ হিসেবে দুর্বল মানবকেন্দ্রিকতাবাদকে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গবেষণা পত্রটিকে পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে আলোচনা করা হবে।

- প্রথম অধ্যায়ে পরিবেশ নীতিবিদ্যার স্বরূপ ব্যাখ্যা, পরিবেশকেন্দ্রিক আলোচনায় নীতিবিদ্যার গুরুত্ব আলোচনা করা হবে।

- দ্বিতীয় অধ্যায়ে পরিবেশ নীতিবিদ্যার দুই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি, যেমন: মানবকেন্দ্রিকতাবাদ ও অ-মানবকেন্দ্রিকতাবাদ আলোচিত হবে। এর সাথে সংশ্লিষ্ট আলোচনাসহ ত্রুটিসমূহও খন্ডন করা হবে।

- তৃতীয় অধ্যায়ে মানবকেন্দ্রিকতাবাদের সাথে করণবাদের অপরিহার্য সম্পর্ক আছে কিনা এবং স্বতঃমূল্য ও পরতঃমূল্য মানুষের মূল্যায়নের উপর নির্ভর করে না- তা দেখানোর চেষ্টা করব।

- চতুর্থ অধ্যায়ে মানবকেন্দ্রিকতাবাদের উপর বিভিন্ন ধর্মের প্রভাব আলোচনা করা হবে।

- পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা দেখানোর চেষ্টা করব মানুষ হিসেবে মানবকেন্দ্রিকতাবাদের সমর্থন করা একটি যৌক্তিক ও ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা (Logical and Practical necessity) এবং সেটা সবল অর্থে নয় বরং দুর্বল অর্থে।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

উৎসর্গ..... i

ঘোষণাপত্র ii

প্রত্যয়নপত্র..... iii

কৃতজ্ঞতা স্বীকার..... iv

ভূমিকা..... v-vi

সূচিপত্র.....vii-x

প্রথম অধ্যায়

পরিবেশ নীতিবিদ্যার স্বরুপ, ক্রমবিকাশ ও গুরুত্ব.....১-১৮

১.১ পরিবেশ নীতিবিদ্যার স্বরূপ.....২

১.২ পরিবেশ নীতিবিদ্যা কি ?.....৪

১.৩ পরিবেশ নীতিবিদ্যার ক্রমবিকাশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস.....৫

১.৪ পরিবেশ নীতিবিদ্যার গুরুত্ব.....১১

দ্বিতীয় অধ্যায়

মানবকেন্দ্রিকতাবাদ ও অ-মানবকেন্দ্রিকতাবাদ..... ১৯-১০৪

২.১ মানবকেন্দ্রিকতাবাদের স্বরূপ.....২০

২.২ মানবকেন্দ্রিক শব্দের অর্থ ২৩

২.২.১ স্বতঃমূল্যের দিক থেকে মানবকেন্দ্রিকতা.....২৩

২.২.২ নৈতিকতার উৎসের দিক থেকে মানবকেন্দ্রিকতা.....২৩

Dhaka University Institutional Repository

২.২.৩ নৈতিকতার বিষয়বস্তুর দিক থেকে মানবকেন্দ্রিকতা.....২৪

২.২.৪ পরিপ্রেক্ষিতগত মানবকেন্দ্রিকতা.....২৪

২.৩ পাশ্চাত্য দর্শনে মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি.....২৫

২.৩.১ প্রাচীন যুগ.....২৬

২.৩.২ মধ্যযুগ.....৩১

২.৩.৩ আধুনিক যুগ.....৩৩

২.৪ মানবকেন্দ্রিকতাবাদের প্রকারভেদ.....৩৭

২.৪.১ সবল মানবকেন্দ্রিকতাবাদ.....৩৮

২.৪.২ দুর্বল মানবকেন্দ্রিকতাবাদ.....৪২

২.৪.২.১ নরটন এর দুর্বল মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি.....৪৫

২.৪.২.২ ইউজিন সি. হারগ্রভ এর দুর্বল মানবকেন্দ্রিকতাবাদ.....৫০

২.৪.২.৩ টিম হেওয়ার্ড এর দুর্বল মানবকেন্দ্রিকতাবাদ.....৫৫

২.৫ সবল ও দুর্বল মানবকেন্দ্রিকতাবাদের মধ্যকার পার্থক্য.....৫৯

২.৬ মানবকেন্দ্রিকতাবাদের সমস্যা.....৬১

২.৭ অ- মানবকেন্দ্রিকতাবাদ.....৬৭

২.৭.১ সংবেদনবাদ.....৬৮

২.৭.১.১ পিটার সিঙ্গারের উপযোগবাদ.....৬৮

২.৭.১.২ রিগানের এর অধিকার ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি.....৭০

২.৭.১.৩ সংবেদনকেন্দ্রিকতাবাদের সমস্যা.....৭৩

Dhaka University Institutional Repository

২.৭.২ বাস্তুকেন্দ্রিকতাবাদ.....৭৪

২.৭.২.১ আলবার্ট শোয়েটজার.....৭৪

২.৭.২.২ পল ডব্লিউ টেইলর.....৭৬

২.৭.২.৩ বাস্তুকেন্দ্রিকতাবাদের সমস্যা.....৭৯

২.৭.৩ পরিবেশকেন্দ্রিকতাবাদ.....৮০

২.৭.৩.১ ভূমি নীতিবিদ্যা.....৮১

২.৭.৩.২ গভীর বাস্তুবিদ্যা.....৮৩

২.৭.৩.৩ পরিবেশকেন্দ্রিকতাবাদের সমস্যা.....৮৮

২.৮ মানবকেন্দ্রিকতাবাদের সাথে অ-মানবকেন্দ্রিকতাবাদের পার্থক্য.....৯০

তৃতীয় অধ্যায়ঃ

মানবকেন্দ্রিকতাবাদ ও করণবাদ.....১০৭-১৩১

৩.১ অ-মানবকেন্দ্রিক ব্যবহারিক মূল্য.....১১৬

৩.২ মানবকেন্দ্রিক ব্যবহারিক মূল্য.....১১৬

৩.৩ অ-মানবকেন্দ্রিক অ-ব্যবহারিক মূল্য.....১১৬

৩.৪ মানবকেন্দ্রিক অ-ব্যবহারিক মূল্য.....১১৭

৩.৫ বিষয়গত অ-মানবকেন্দ্রিক স্বতঃমূল্য.....১১৮

৩.৬ বিষয়ীগত অ-মানবকেন্দ্রিক স্বতঃমূল্য.....১১৯

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়ঃ

মানবকেন্দ্রিকতাবাদের উপর বিভিন্ন ধর্মের প্রভাব.....১৩২-১৬৪

৪.১ ইসলাম ধর্ম.....১৩৩

৪.২ ইহুদি ও খ্রিষ্টান ধর্ম.....১৪০

৪.৩ হিন্দুধর্ম.....১৪৫

৪.৪ বৌদ্ধ ধর্ম.....১৫৩

৪.৫ জৈনধর্ম.....১৫৮

উপসংহারঃ ১৬৫-১৮৩

গ্রন্থপঞ্জি.....১৮৪-১৯৬

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

পরিবেশ নীতিবিদ্যার স্বরুপ, ক্রমবিকাশ ও গুরুত্ব

পরিবেশ ও মানব জীবন এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। পরিবেশ নিয়ে চিন্তাভাবনা প্রাচীনকাল থেকেই। ধারণা করা হয় মানুষ ও পরিবেশের মধ্যকার মিথস্ক্রিয়া প্রথম পরিলক্ষিত হয় ৭০০০০০ বছর আগে যখন আমাদের পূর্বপুরুষেরা আগুনের ব্যবহার শুরু করে। একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, পৃথিবীর সব প্রাচীন সভ্যতা, প্রাচীন গ্রন্থ (সাহিত্য, ধর্মগ্রন্থ) বিজ্ঞান, দর্শন, চিত্রকলা ইত্যাদি চিন্তাভাবনায় পরিবেশ সম্পর্কিত বিষয়গুলো আলোচিত ছিল। প্রাচীন বেদ, উপনিষদ, কোরআন, বাইবেলের মত ধর্মগ্রন্থ, বিভিন্ন সাহিত্যিক যেমন- রবীন্দ্রনাথ, কালিদাস, হোমার, কনফুসিয়াসের বাণীতে, এরিস্টটলের রাষ্ট্রচিন্তা, লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চির বিজ্ঞান চেতনায়, আল-বেরুণীর পর্যালোচনায় পরিবেশ ও মানুষের কথা, পরিবেশের প্রতি মানুষের দায়িত্বের কথা বারবার উঠে এসেছে। তবে পরিবেশ ও মানুষের বিস্তার ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফলে মানুষ পরিবেশ নিয়ে নতুন করে ভাবছে, যা আগে ভাবা হয়নি। বর্তমানে পরিবেশের সমস্যা প্রকট থেকে প্রকটতর হচ্ছে বিধায় তা মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মানুষ বেঁচে আছে পরিবেশের কোলে নিজেকে সমর্পণ করে। পরিবেশ মানুষের মৌলিক উপাদান ও চাহিদা নির্ধারণসহ সব ধরণের চাহিদা পূরণ করে। আমাদের মূল জীবনরক্ষাকারী উপাদান আমরা পরিবেশ থেকে পেয়ে থাকি। যেমন: শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য বায়ু (অক্সিজেন), পান করার জন্য পানি, খাদ্য, ঔষধ, বস্ত্র, বাসস্থান, ভূমি ইত্যাদি। সৃষ্টির উষালগ্ন থেকে এ পরিবেশে মানুষসহ অন্যান্য জীবমন্ডল নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে বেঁচে আছে। তবে কারো কারো মতে মানুষই হচ্ছে প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ জীব। তার বুদ্ধিবৃত্তি অন্যান্য প্রাণীদের থেকে উচ্চতর বলে মনে করা হয়। মানুষের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাদেও কর্মকান্ডের ফলস্বরুপ পৃথিবীর চেহারাও বদলাতে থাকে। প্রাচীনকালে প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে মানুষের সম্পর্ক বাস্তুবিদ্যার নিয়মে পরিচালিত হতো। কিন্তু মানুষের বুদ্ধিভিত্তিক ক্ষমতার উৎকর্ষতার কারণে ধীরে ধীরে প্রাকৃতিক পরিবেশকে নিজের ইচ্ছেমত পরিবর্তন করে। যার কারণে মানুষ পরিবেশের অন্যান্য উপাদান থেকে আলাদা হয়ে যায়। মানুষ পরিবেশের একটি প্রভাবশালী প্রাকৃতিক উপাদান হয়ে উঠে। সে তার নিজের প্রয়োজনে প্রাকৃতিক পরিবেশকে পরিবর্তন করে নিজের প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। এদিক থেকে বিবেচনা করলে এটাই বলা যায় যে, মানবসভ্যতার ইতিহাস মূলত মানুষের দ্বারা প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর প্রভাব বিস্তারের ইতিহাস। তাই একথা বলটা অত্যুক্তি হবে না যে, আদিকাল থেকেই মানুষ প্রকৃতির সাথে সুবিবেচনাপ্রসূত

Dhaka University Institutional Repository

আচরণ করেনি। প্রকৃতিকে ইচ্ছেমত ব্যবহার করেছে। যার ফলে প্রকৃতিতে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে।

বর্তমান বিশ্বে বিরাজমান বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে অন্যতম প্রধান সামাজিক সমস্যা হলো পরিবেশগত সমস্যা। কয়েক দশক পূর্বেও পরিবেশকেন্দ্রিক ধারণাটি ছিল মূলত পরিবেশ বিজ্ঞানীদের কৌতুহল এবং গবেষণার বিষয়। কিন্তু আজ আর বিষয়টি শুধু পরিবেশ বিজ্ঞানীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এটা এখন সমস্ত শ্রেণীর মানুষের উদ্বেগের বিষয় হয়ে উঠেছে। বিংশ শতকের ষাটের দশকের গোড়াতে যখন পরিবেশ সমস্যা তেমন একটা পরিচিত বিষয় হয়ে ওঠেনি সেই সময় প্রজাতির বিলুপ্তির রাসয়নিক পদার্থ ব্যবহার সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে লেখা জীববিজ্ঞানী র‍্যাচেল কারসন এর 'Silent Spring' নামক যুগান্তকারী গ্রন্থটি আমেরিকা তথা গোটা বিশ্বে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। কারসন অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলার চেষ্টা করেছিলেন যে, বিভিন্ন কীটনাশক ও আগাছানাশকের, বিশেষত DDT এর যথেষ্ট ব্যবহার পরিবেশকে দূষিত করে তুলছে এবং পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীর বসবাসের অযোগ্য করে তুলছে।[১] তিনি বিশেষ করে ঈগল পাখী বিলুপ্ত হওয়ার পেছনে DDT এর ব্যবহারকেই দায়ী করেছিলেন।

বর্তমান পৃথিবী পরিবেশগত সংকটে জর্জরিত। যে পরিবেশের উপর নির্ভর করে মানুষ হাজার হাজার বছর ধরে বেঁচে আছে সে পরিবেশ আজ বিপর্যস্ত। মানুষের নানাবিধ কর্মকান্ডের ফলে পরিবেশের ওপর চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে পরিবেশ ক্রমশ অবনতির দিকে ধাবিত হচ্ছে। ভূ-পৃষ্ঠের উষ্ণতা বৃদ্ধি, ওজোন স্তরের হ্রাস, জলবায়ুর পরিবর্তন, জীবমন্ডলের পরিবর্তন, জীববৈচিত্র্যের বিলুপ্তি, বনাঞ্চল হ্রাস, মাটি ক্ষয়, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ইত্যাদি পরিবেশগত সংকটের সৃষ্টি হচ্ছে এবং ফলস্বরূপ প্রাকৃতিক সম্পদ হ্রাস পাচ্ছে ও এ পৃথিবী বসবাসের অনুপোযোগী হয়ে পড়ছে। এ থেকে পরিত্রাণের জন্য বিজ্ঞানীদের পাশাপাশি দার্শনিকগণও সচেতন হচ্ছেন। এ সচেতনতায় যে দার্শনিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি তা থেকেই মূলত পরিবেশ দর্শন বা পরিবেশ নীতিবিদ্যার জন্ম।

১.১ পরিবেশ নীতিবিদ্যার স্বরূপঃ

পরিবেশ নীতিবিদ্যার স্বরূপ জানার জন্য প্রথমে আমাদেরকে জানতে হবে পরিবেশ কি, নীতিবিদ্যা বলতে কি বোঝায়। অতঃপর পরিবেশ নীতিবিদ্যা কি তা ব্যাখ্যা করা হবে।

পরিবেশ বলতে মানুষ, অন্যান্য জীবন্ত প্রাণী, উদ্ভিদ, জড় পদার্থ এবং অন্যান্য বিশেষ বিষয়ের সমষ্টিগত অবস্থাকে বুঝায়, যেখানে জীবন্ত প্রাণী এবং উদ্ভিদের জীবন-চক্র পরিচালনার জন্য পানি,

Dhaka University Institutional Repository

খাদ্য, সূর্যের আলো সবকিছুই বিদ্যমান। পরিবেশের মধ্যে জীবনধারণকারী এবং জীবন পরিচালনাকারী অন্যান্য সকল শর্তাবলি যেমন- বসবাসের স্থান, পরিবহন ব্যবস্থা, আলো, তাপমাত্রা, বিদ্যুৎ ইত্যাদি অন্তর্ভূক্ত।

অন্যভাবে বলা যায়, জীব ও জড় পদার্থ নিয়ে পরিবেশ গঠিত। এটি জীবন্ত প্রজাতির টিকে থাকার জন্য এবং তাদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে।

আরও বিভিন্নভাবে পরিবেশকে সংজ্ঞায়িত করা যায়। যেমন:

১. মানুষ এবং তার চারপাশের সকল সামাজিক, অর্থনৈতিক, জৈবিক, ভৌত এবং রাসায়নিক বিষয়াবলির সমষ্টিকে পরিবেশ বলে।
২. কোনো জীবের চারপাশের অবস্থানকারী জীবিত ও জড় উপাদানগুলো এবং এদের মিলিত সব রকমের প্রভাব ও ঘটনা প্রবাহের সামগ্রিক অবস্থাকে পরিবেশ বলে।
৩. পরিবেশ হচ্ছে শারীরিক, মানসিক ও জীব- জৈব উপাদানের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া ও গবেষণার ফলাফল অধ্যয়ন।

পরিবেশ নীতিবিদ্যা সম্পর্কিত আলোচনা শুরু করার পূর্বে নীতিবিদ্যা সম্পর্কে আলোকপাত করা যাক। নীতিবিদ্যা মানুষের আচরণ সর্ম্পকীয় বিজ্ঞান। আচরণের ভাল-মন্দ, ঔচিত্য-অনৌচিত্য এগুলো নীতিবিদ্যার বিচার্য বিষয়। মানুষের ক্রিয়া সমষ্টিকে আচরণ বলে। তবে নীতিবিদ্যায় মানুষের আচরণ বলতে ঐচ্ছিক ক্রিয়া ও অভ্যাসজাত ক্রিয়াকে বুঝায়। সুতরাং দর্শনের যে শাখা মানুষের আচরণ বা ঐচ্ছিক ক্রিয়ায় নৈতিক মূল্য বিচার করে যে বিজ্ঞান তাই নীতিবিদ্যা।

নীতিবিদ্যাকে Moral Philosophy বা নীতি দর্শনও বলা হয়। ম্যাকেনজী নীতিবিদ্যার সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেন, আচরণের ন্যায় বা ভাল নিয়ে যে আলোচনা, তাকে নীতিবিদ্যা বলা যায়। এ বিদ্যা আচরণ-সম্পর্কীয় সাধারণ মতবাদ এবং এ বিদ্যা ন্যায় বা অন্যায় ও ভাল বা মন্দ প্রবণতার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের ক্রিয়াবলীর আলোচনা করে।[২] নীতিবিদ্যার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে উইলিয়াম লিলি বলেন, নীতিবিদ্যা হচ্ছে সমাজে বসবাসকারী মানুষের আচরণ সম্পর্কিত আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান, যে বিজ্ঞান মানুষের আচরণকে উচিত কি অনুচিত, ভালো কি মন্দ বা অনুরূপভাবে বিচার করে।[৩] সমকালীন দার্শনিকদের পদ্ধতিগত পদ প্রয়োগ করে নীতিবিদ্যার সংজ্ঞার নতুন সূত্রায়ন এভাবে করা হয়, নীতিবিদ্যা আচরণ সম্পর্কীয় বিজ্ঞান। গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত দর্শনে নীতিবিদ্যা বলতে যা বোঝানো হয়েছে তা প্রধানত মানুষকেন্দ্রিক। কেননা,

Dhaka University Institutional Repository

সেখানে কেবল মানুষের প্রতি মানুষের আচরণ কেমন হওয়া উচিত তাই নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় ছিল। অর্থাৎ সে সময় নীতিবিদ্যার সাথে মানুষের স্বার্থ আবশ্যিকভাবে জড়িত ছিল। তবে এ নীতিবিদ্যা অ-মানব প্রাণী ও প্রাকৃতিক সত্তার মূল্যকে একেবারেই অস্বীকার করে না। বরং তারা মনে করে যে এগুলোর মূল্য অবশ্যই আছে এবং তা কেবল মানুষের মূল্যের প্রেক্ষিতে নির্ধারিত হবে। অর্থাৎ মানুষ তার প্রয়োজনে অ-মানব প্রাণী ও প্রাকৃতিক সত্তাকে ব্যবহার করবে। যদিও ধারণা করা হয় যে, সনাতনী নীতিবিদ্যায় মানুষকে নির্বিচারে প্রকৃতি ধ্বংস করতে উৎসাহ দিয়ে মানুষ-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটায়। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, বর্তমানে একদল মানবকেন্দ্রিক পরিবেশ দার্শনিকদের মধ্যে এর বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয়। এ ধরণের দার্শনিকরা মনে করেন যে, মানুষের প্রয়োজনেই পরিবেশকে ধ্বংস করলে, প্রযুক্তিগত উন্নয়নের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ করলে বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্য নষ্ট হবে যা প্রকারান্তরে মানুষেরই ক্ষতি হবে। তাই এই ধরনের নীতিবিদ্যার সমর্থকগণ প্রকৃতি ধ্বংস নয় বরং মানুষের কার্যকলাপের নিয়ন্ত্রণের কথা বলছেন।

এটা সত্য যে মানুষের আচরণ শুধু সমাজে বসবাসকারী অন্যান্য মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। সে যে পরিবেশে বসবাস করে সে পরিবেশের নানা উপকরণের সাথেও তাকে নানা রকম আচরণ করতে হয়। সমাজে বসবাসকারী মানুষের কল্যাণে নৈতিক নীতিমালা তৈরিই হল নীতিবিদ্যার লক্ষ্য। বস্তুত মানুষের জীবনে পরিবেশের এসকল উপকরণের মূল্য অপরিসীম। এ মূল্য নিরূপণের জন্যেই সাম্প্রতিককালে সৃষ্টি হয়েছে পরিবেশ নীতিবিদ্যা। পরিবেশের প্রতি মানুষের আচরণের মূল্যায়নই এ নীতিবিদ্যার বৈশিষ্ট্য।

১.২ পরিবেশ নীতিবিদ্যা কি ?

পরিবেশ নীতিবিদ্যার ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো ‘Environmental Ethics’। এটি মূলত: প্রায়োগিক নীতিবিদ্যার একটি নতুন সংযোজন। মানুষ যেখানে বসবাস করে তার চারপাশে বিরাজমান মানব, প্রাণীজগত, গাছপালা, নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত, বায়ুমন্ডল, বাস্তুতন্ত্র এগুলো নিয়েই পরিবেশ গঠিত। পরিবেশ নীতিবিদ্যায় প্রকৃতিতে বিদ্যমান মানুষ, পরিবেশ ও অমানব বিষয়গুলোর মধ্যে নৈতিক সম্পর্ক, মূল্য ও নৈতিক অবস্থান নিয়ে আলোচনা করে। এ শাস্ত্র নীতিবিদ্যার গতানুগতিক মানবভিত্তিক আলোচনার পাশাপাশি অ-মানব সত্তা নিয়েও অধ্যয়ন করে।

Dhaka University Institutional Repository

পরিবেশ নীতিবিদ্যার সংজ্ঞা মূলত মানুষ এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যকার যে একটি নৈতিক সম্পর্ক রয়েছে তার উপরই নির্ভর করে। এটি মূলত পরিবেশ সুরক্ষার জন্য যে নৈতিক বাধ্যবাধকতাগুলো রয়েছে তাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে মানুষ পরিবেশের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। আর পরিবেশ নীতিবিদ্যা পরিবেশের প্রতি মানুষের যে নীতিবোধ এবং নৈতিক বাধ্যবাধকতাগুলো রয়েছে তা চিহ্নিত করতে সহায়তা করে। এটি এমন সত্যকে তুলে ধরে যে, পৃথিবীর সকল ধরণের জীবজগতের জীবনধারণের ও বংশবিস্তারের অধিকার রয়েছে। কিন্তু প্রকৃতি ধ্বংসের মাধ্যমে আমরা এ সত্যকে অস্বীকার করি যা অনভিপ্রেত এবং অনৈতিক। খাদ্যশৃঙ্খল স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দেয় যে, মানুষ, উদ্ভিদ, প্রাণী এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ একে অপরের সাথে ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কিত।

প্রকৃতপক্ষে পরিবেশ নীতিবিদ্যার সন্তোষজনক সংজ্ঞা দেয়া সহজসাধ্য নয়। কারণ বৈচিত্র্যময় এ পৃথিবীর নৈতিক প্রেক্ষাপট খুব সহজে ব্যাখ্যা করা দুরুহ কাজ। নীতিবিদ্যায় অসংখ্য নৈতিক মানদন্ড রয়েছে। পরিবেশকেন্দ্রিক আলোচনায় এসকল মানদন্ডকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা সহজ ব্যাপার নয়। মোটকথা পরিবেশ নীতিবিদ্যা হল পরিবেশ ও নৈতিকতার একটি সমন্বিত পর্যালোচনা।

বর্তমানে দর্শনের আওতায় পরিবেশকেন্দ্রিক আলোচনাকে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে পরিবেশ নিয়ে আলোচনা করা যায়। যেমন-অধিবিদ্যক, মূল্যবিদ্যক, জ্ঞানবিদ্যক, নীতিবিদ্যক ইত্যাদি।

অধিবিদ্যক দিক থেকে পরিবেশ নীতিবিদ্যা মানব সংস্কৃতি এবং প্রকৃতির মধ্যকার বাস্তব স্বাতন্ত্র্যকে ব্যাখ্যা করে। এখানে অধিবিদ্যক প্রশ্ন হলো : মানুষ কি প্রকৃতির অংশ?

মূল্যবিদ্যক দিক থেকে পরিবেশ নীতিবিদ্যায় আলোচনা করা হয় মানুষ স্বত:মূল্যের অধিকারী নাকি অ-মানব প্রাণী ও প্রকৃতি স্বত:মূল্যের অধিকারী।

পরিবেশ নীতিবিদ্যা জ্ঞানবিদ্যক বিষয় নিয়েও আলোচনা করে। যেমন:- একজন কিভাবে জানতে পারে যে মানুষ এবং প্রকৃতির সম্পর্ক কি এবং প্রকৃতির নিজের কি মূল্য আছে?

নীতিবিদ্যক দিক থেকে স্পষ্টতই পরিবেশ নীতিবিদ্যা নৈতিক বাধ্যবাধকতাগুলি বিবেচনা করে। যেমন: অ-মানব প্রকৃতির প্রতি মানুষের নৈতিক বাধ্যবাধকতা কি রয়েছে?

বর্তমান গবেষণায় আমাদের আলোচনার পরিসর মূল্যবিদ্যা ও নীতিবিদ্যাকেন্দ্রিক।

Dhaka University Institutional Repository

১.৩ পরিবেশ নীতিবিদ্যার ক্রমবিকাশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসঃ

বর্তমান বিশ্বের অন্যতম প্রধান সামাজিক সমস্যা হলো পরিবেশগত সমস্যা। কয়েক দশক পূর্বেও পরিবেশকেন্দ্রিক আলোচনা কেবল পরিবেশ বিজ্ঞানীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এটা এখন সমস্ত শ্রেণীর মানুষের উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ সমস্যাটি এখন যে পর্যায়ে পৌঁছেছে তাতে মানুষের অস্তিত্বই বিপন্ন হওয়ার পথে। তাই আজ সরকারি-বেসরকারি, জাতীয়, আন্তর্জাতিক, সবক্ষেত্রেই পরিবেশ সমস্যা, তার প্রভাব ও সমাধান নিয়ে চিন্তাভাবনা ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ একটা ভিন্ন মাত্রা লাভ করেছে। একাডেমিক ক্ষেত্র হিসেবে পরিবেশ নীতিবিদ্যার উন্মেষ সাম্প্রতিক হলেও তার ইতিহাস অত্যন্ত প্রাচীন।

এখানে পরিবেশ নীতিবিদ্যার বিকাশের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

আমেরিকান পরিবেশ দার্শনিক, প্রাণীবিদ ও উদ্ভিদবিদ জন ম্যুর (John Muir, ২১ এপ্রিল ১৮৩৮-২৪ ডিসেম্বর ১৯১৪) ছিলেন পরিবেশ আন্দোলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তিনি উপবন সংরক্ষণ এবং জাতীয় উদ্যান প্রতিষ্ঠার অন্যতম সমর্থক ছিলেন। তাছাড়া তিনি সিয়েরা ক্লাবও (Sierra Club) প্রতিষ্ঠা করেন। প্রখ্যাত আমেরিকান পরিবেশবিদ ডেভিড ব্রাওয়ার (David Brower, ১৯১২-নভেম্বর ৫,২০০০) ম্যুরের (Muir) পদাঙ্ক অনুসরণ করে বিংশ শতাব্দির প্রথম দিকের পরিবেশবিদদের একজন এবং সিয়েরা ক্লাবের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ১৯৪৯ সালে আমেরিকান জীববিদ আলডো লিওপোল্ড (Aldo Leopold, ১৮৮৭-১৯৪৮) তাঁর "The Land Ethic" নামক প্রবন্ধে পরিবেশ বিষয়ক দার্শনিক আলোচনার সূত্রপাত করেন।[৪] উল্লেখ্য যে, এ প্রবন্ধ প্রকাশের ত্রিশ বছর পর বিষয়টি পরিবেশ নীতিবিদ্যা নমে পরিচিত হয়। বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকের গোড়াতে যখন পরিবেশ সমস্যা তেমন একটি পরিচিত বিষয় হয়ে ওঠেনি সেই সময় জীববিজ্ঞানী র‍্যাচেল কারসন (Rachel Carson) এর 'Silent Spring' নামক গ্রন্থটি আমেরিকা তথা গোটা বিশ্বে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। কারসন জোরালোভাবে বলেছেন যে, দ্রুতবর্ধনশীল জনসংখ্যার খাদ্যের চাহিদা পূরণার্থে বিভিন্ন কীটনাশক ও আগাছানাশকের বিশেষত DDT, অ্যালডিরিন এবং ডিইডিনিন ব্যবহার করে ফসলের ফলন এবং মুনাফা বাড়ানোর লক্ষ্যে যে বাণিজ্যিক চাষের প্রচলন হচ্ছে তা মূলত পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকিস্বরুপ।[৫] এ গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করেন যে, অতিমাত্রায় এসকল রাসায়নিক ব্যবহারের ফলে জীবজগতের জীবনচক্র পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। সাথে সাথে উদ্ভিদ জগতেও এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। যার ফলে বসন্ত এসেছে কিন্তু ফুল ফোটেনি, পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে না। মানুষের এরকম কর্মকান্ডের কারণে প্রকৃতির

Dhaka University Institutional Repository

বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন ঘটছে। কারসনের বক্তব্যের কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে রাসায়নিক সার এবং কীটনাশকের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচার ও প্রসার লাভ করে এবং জৈব-চাষের উপর অনেকেই আগ্রহ প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Paul R. Ehrlich ও Anne Ehrlich রচিত "Population Bomb" গ্রন্থটি পরিবেশবাদীদের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে।[৬] উক্ত গ্রন্থে তিনি জনসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধির কারনে পৃথিবীর ধারণ ক্ষমতার বাইরে চলে যাওয়া এবং মানুষ ও অন্যান্য অমানব প্রজাতির মধ্যে অসম বন্টনের ফলে ভবিষ্যতে বিপদের আশঙ্কার ইঙ্গিত দেন। তাছাড়া ষাটের দশকে বিশ্বে ব্যাপক উন্নতির ফলে মানুষের জীবনযাত্রার মান যখন বৃদ্ধি পেতে শুরু করে তখন কয়েকজন সমাজ সচেতন ব্যক্তি প্রধানত দুটি প্রশ্নকে সামনে রেখে ১৯৬৮ সালে ক্লাব অব রোম প্রতিষ্ঠা করেন।[৭] প্রশ্ন দুটি হচ্ছে -

১. উন্নতির এ ধারা অব্যাহত রাখা যাবে কী না?

২. এরূপ উন্নতির জন্য বিশ্বের সম্পদের নির্বিচার ব্যবহারের ফলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ রেখে যাওয়া সম্ভব হবে কি না?

১৯৭২ সালে এটি 'ক্রমোন্নতির সীমারেখা' নামে যে প্রথম রিপোর্টটি প্রকাশ করে তাতে পরিবেশ, জনসংখ্যা ও প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যকার সমস্যার স্বরূপ তুলে ধরা হয়। এভাবে ক্লাব অব রোম পরিবেশগত সমস্যাটির দিকে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সত্তরের দশকে পরিবেশ দার্শনিকরা পরিবেশগত সমস্যাগুলির দার্শনিক দিক বিবেচনা করার আহবান জানিয়েছিলেন। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক লিন হোয়াইট (Lynn White, এপ্রিল ২৯,১৯৭৭ - মার্চ ৩০, ১৯৮৭) এর "The Historical Roots of our Ecological Crisis"[৮] এবং আমেরিকান বাস্তুবিদ গ্যারেট হারডিন (Garrett Hardin, ২১ শে এপ্রিল, ১৯১৫-সেপ্টেম্বর ১৪, ২০০৩) এর "The Tragedy of the Commons" গ্রন্থে এ ধরণের আলোচনা স্থান পায়।[৯] তাছাড়া গ্যারেট হারডিন এর পরবর্তী আরেকটি প্রবন্ধ "Exploring New Ethics for Survival" এ পরিবেশের দার্শনিক ও নৈতিক দিকগুলো আলোকপাত করা হয় যা মূলত: সত্তরের দশকে পরিবেশ নীতিবিদ্যার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সত্তরের দশকে পরিবেশ নীতিবিদ্যা আমেরিকার দার্শনিকদের আলোচনার অন্যতম বিষয় হয়ে দাড়িয়েছিল। ১৯৭০ সালের ২২ এপ্রিল আমেরিকায় প্রথম 'ধরিত্রী দিবস' পালিত হয়। প্রাকৃতিক

Dhaka University Institutional Repository

পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা, এর স্বীকৃতি ও গুরুত্ব উপলব্দিই ছিল এ দিবস পালনের উদ্দেশ্য।[১০] এ দিবসটি বর্তমানে প্রতি বছর ২২ এপ্রিল ১৭৫টি দেশে পালিত হয়।

পরিবেশ নীতিবিদ্যাসংক্রান্ত প্রথম আন্তর্জাতিক একাডেমিক জার্নাল প্রকাশিত হয় ১৯৭০ এর দশকের শেষদিকে এবং ১৯৮০ এর দশকের প্রথম দিকে উত্তর আমেরিকায়। ১৯৭১ সালে জর্জিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনে উইলিয়াম ব্ল্যাকস্টোন এবং জোয়েল ফেইনবার্গ (Joel Feignburg) নামক দুইজন নীতিবিদ তাঁদের পরিবেশ সংক্রান্ত মতামত প্রকাশ করেন। ১৯৭২ সালে জন বি. কোব (John B. Cobb) রচিত *Is It Too Late? A Theology of Ecology* গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।[১১] তিনি যুক্তি দেখান যে, প্রকৃতির অবমূল্যায়ন হল খ্রিষ্টধর্মকে অবমূল্যায়ন যা মূলত পরিবেশ সংকটকে আরও বাড়িয়ে তোলে। ১৯৭২ সালে জাতিসংঘের উদ্যোগে সুইডেনের স্টকহোমে 'মানব-পরিবেশ সংকট' শিরোনামে প্রথম পরিবেশ বিষয়ক দার্শনিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে একই বছর ক্রিস্টোফার স্টোন "Should Trees Have Standing?" নামক প্রবন্ধে অমানব প্রকৃতির প্রতি বিদ্যমান আইনী নীতিগুলোকে প্রচার ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করেন। এছাড়া ১৯৭৩ সালে নরওয়ের দার্শনিক ও *Inquiry* জার্নালের প্রতিষ্ঠাতা আর্নে নায়েস (Arne Naess) "The Shallow and Deep, Long-Range Ecology Movement" নামক প্রবন্ধে মানবকেন্দ্রিক মতবাদের বিরূদ্ধে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন।[১২] তাঁর নেতৃত্বে পরবর্তীতে গভীর বাস্তুবিদ্যা (Deep Ecology) আন্দোলন বিকাশিত হয় যা অ-মানবকন্দ্রিক অবস্থানকে আরো সুদৃঢ় করে। আর্নে নায়েস আমাদের পুরো সভ্যতার পুনঃনির্মাণের পক্ষে যুক্তি দিয়েছিলেন। একই সময়ে অষ্ট্রেলীয় দার্শনিক রিচার্ড রাথলি (Richard Routhley) পঞ্চদশ World Congress of Philosophy -তে পরিবেশ নীতিবিদ্যা বিষয়ক প্রবন্ধ "Is there a Need for Nature?" উপস্থাপন করেন যা পরিবেশ দর্শন বিকাশে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে।

১৯৭৩ সালে বুলগেরিয়ায় অনুষ্ঠিত একটি সম্মেলনে দার্শনিক রিচার্ড সিলওয়ান (Richard Sylvan) একটি প্রস্তাব করেন। এতে তিনি প্রশ্ন করেন, পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার প্রাক্কালে শেষ মানুষটি যদি নিজের প্রাণ হারানোর আগে সমস্ত জিনিসকে ধ্বংস করে দেয় তাহলে মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে সমালোচনা করা যায় কি?[১৩] পরবর্তী বছর ১৯৭৪ সালে অষ্ট্রেলীয় দার্শনিক জন পাসমোর (John Passmore) প্রথম পরিবেশ নীতিবিদ্যার উপর বই আকারে পান্ডুলিপি প্রকাশ করেন। বইটির নাম "Man's Responsibility to Nature"।[১৪] তিনি এ গ্রন্থে রাথলির মতের বিরোধিতা করেন।পাসমোর বলেছিলেন পরিবেশগত সমস্যা যেহেতু মানুষের সামাজিক ও

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক কর্মকান্ডের দ্বারা সৃষ্ট সেহেতু সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডের দ্বারাই এর সমাধান করা যাবে। তাই তিনি এটাকে সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রদর্শনের আলোচ্য বিষয় মনে করেন, নীতিবিদ্যার নয়। পরবর্তীতে ১৯৭৫ সালে হোমস রলস্টন পাসমোরের বিরোধিতা করে পরিবেশ নীতিবিদ্যার একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি *Ethics* নামক জার্নালে Is There an Ecological Ethics? প্রবন্ধটি প্রকাশ করেন। এ প্রবন্ধের মাধ্যমে দর্শনের মূলধারায় পরিবেশ নীতিবিদ্যা স্থান পায়। তাছাড়া ১৯৭৭ সালে জন রডম্যান (John Rodman) "Moral Extensionism" নামক ক্রিটিকে পরিবেশ নীতিবিদ্যার কথা বলেন। এছাড়া ১৯৭৭ সালে জর্জ সেশনস (George Sessions) পশ্চিমা সমাজের "Impenetrable Ontological Divide" নিয়ে নিন্দা করেছিলেন। যা মূলত অধিবিদ্যক দ্বৈতবাদ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। তিনি যুক্তি দেখান যে, প্রকৃতির সকল কিছু একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন নয়ই বরং পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তিনি স্পিনোজার একত্ববাদে (Monism) বাস্তুবিজ্ঞানের অন্তর্দৃষ্টি খুঁজে পান। এছাড়া তিনি কবি রবিনসন জেফার্সের (Robinson Jeffers) পরিবেশ নীতিবিদ্যা নিয়ে নতুন দিক আলোচনার প্রশংসা করেন।

একই সময়ে অর্থাৎ ১৯৭৭ সালে আমেরিকার নর্থ টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বেয়ার্ড ক্যালিকট (J.B.Callicott, ১৯৪১-) নামক আমেরিকান পরিবেশ নীতিবিদ "Elements of Environmental Ethics" প্রকাশ করেন। তাঁর মতে, বাস্তুতান্ত্রিক সম্প্রদায়ের জৈব ও অজৈব সদস্যের প্রতি মানুষের নৈতিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে। ক্যালিকট পরিবেশ নীতিবিদ্যার সমষ্টিবাদ এবং অমানবকেন্দ্রিক মতবাদকে বিকশিত করেন। অতঃপর ১৯৭৯ সালে ডোনাল্ড ভ্যানডিভার (Donald Van DeVeer) প্রস্তাব করেছিলেন মৌলিক চাহিদা এবং পেরিফেরিয়াল চাহিদার মধ্যে পার্থক্য তৈরী করতে। মৌলিক চাহিদা নিয়ে যখন মানব এবং অমানব প্রাণীর মধ্যে মতদ্বৈততা দেখা দেয় তখন মানুষের স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়া হয় এবং এটা মূলতঃ Hierarchical Biocentrism এর কারণে হয়ে থাকে।

১৯৭৯ সালে নর্থ টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক ও পরিবেশ দার্শনিক ইউজেন সি হারগ্রভ "Journal of Environmental Ethics" নামে পরিবেশ নীতিবিদ্যার উপর প্রথম জার্নাল প্রকাশ করেন।[১৫] এটি ইউনিভার্সিটি অব নিউ মেক্সিকো থেকে প্রকাশিত হয়। এসব প্রকাশনা পরিবেশ নীতিবিদ্যার আলোচনাকে আরও যুগোপযোগী ও অপরিহার্য করে তোলে এবং পরিবেশ সম্পর্কিত দার্শনিক আলোচনা "পরিবেশ নীতিবিদ্যা" নামে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। মূলতঃ পরিবেশ

Dhaka University Institutional Repository

নীতিবিদ্যা বিকাশের ক্ষেত্রটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সত্তরের দশকে মানুষের সাথে প্রাকৃতিক পরিবেশের সম্পর্ক নিয়ে দুই ধরণের চিন্তার বিকাশ ঘটেছে:

১. গতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গঠিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ যেখানে মানবকেন্দ্রিকতাবাদকে পাসমোর এবং অ-মানবকেন্দ্রিকবাদকে সিংগার, স্টোন প্রমুখরা বিকশিত করেন।
২. অন্যটি প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি যা ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদকে প্রত্যাখ্যান করে সমষ্টিবাদের পক্ষে জোর দেয়। বস্তুত সত্তর এর দশকের দ্বিতীয়ার্ধে এ প্রগতিবাদীদের আধিপত্য ছিল। তবে সেক্ষেত্রে গতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গিকেও অগ্রাহ্য করা হয়নি।

লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, ১৯৮৩ সালের পূর্বে পাসমোরের বিরোধিতা করে কোন গ্রন্থ রচিত হয়নি। বৃটিশ দার্শনিক রবিন অ্যাটফিল্ড (Robin Attfield) পাসমোরের বিরোধিতা করে প্রথম *The Ethics of Environmental Concern* নামক গ্রন্থটি এই বছর রচনা করেন।[১৬] অ্যাটফিল্ড দেখানোর চেষ্টা করেন যে, পাশ্চাত্য ঐতিহ্যে প্রকৃতির প্রতি মানুষের প্রভুত্বের নয় বরং সেবকের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ন। তাই তিনি দাবি করেন যে, পাশ্চাত্য ঐতিহ্যে পরিবেশ নীতিবিদ্যার উপাদান রয়েছে। পরবর্তীতে পাসমোরের গ্রন্থের প্রতিক্রিয়াস্বরুপ Donald Scherer এবং Thomas Attig সম্পাদিত *Ethics and the Environment* এবং Eugene C. Hargrove রচিত *Foundations of Environmental Ethics* নামক গ্রন্থদ্বয় রচিত হয়।[১৭]

ইতোমধ্যে আমেরিকান পরিবেশ দার্শনিক হোমস রলস্টন 111 ১৯৯০ সালে The International Society for Environmental Ethics প্রতিষ্ঠা করেছেন যার প্রেসিডেন্ট তিনি নিজেই। এটি বিশ্বজুড়ে বড় বড় দার্শনিক সম্মেলনের আয়োজন করেছে। এর মধ্যে পরিবেশ নীতিবিদ্যা উন্নত বিশ্বের অনেক জায়গায় প্রাতিষ্ঠানিকভাবে জায়গায় করে নিয়েছে। তৃতীয় বিশ্বের পন্ডিতরাও এর বিকাশে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছেন। প্রয়াত হেনরি ওডেরা ওরুকা কেনিয়ার নাইরোবিতে একটি ইকোফিলোসফি সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ছিলেন এবং ১৯৯১ মালে নাইরোবিতে পরিবেশ, বিকাশ এবং দর্শনের মধ্যকার যোগসূত্র নিয়ে বিশ্ব দর্শনের একটি সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন। এর আরও একটি উদাহরণ হল ১৯৯৫ সালে মালয়েশিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আজিজান বাহারউদ্দিন দ্বারা মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে আয়োজিত উন্নয়ন, নীতি ও পরিবেশ সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সম্মেলন।

Dhaka University Institutional Repository

পরিবেশ নীতিবিদ্যা সংক্রান্ত এই আলোচনা পরবর্তীকালে ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর রুপ লাভ করেছে। তৃতীয় বিশ্বের পরিবেশ দার্শনিকরা প্রায়শই দারিদ্র্য ও অন্যায্যতার সমস্যাগুলির প্রতিকারের জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশের প্রয়োজনীয়তার সাথে পরিবেশবাদকে সংমিশ্রণ করে ফেলে। মূলত এভাবেই পরিবেশ নীতিবিদ্যা বিকাশ লাভ করে বর্তমানে অবস্থানে এসেছে। পরবর্তীতে পরিবেশ নীতিবিদ্যার মাধ্যমে প্রায়োগিক দর্শন বিকাশ লাভ করছে।

১.৪ পরিবেশ নীতিবিদ্যার গুরুত্বঃ

কোনো একটি জীব পরিবেশে এককভাবে বাঁচতে পারে না। জীবকে পরিবেশের অঙ্গ হিসেবে অন্য জীবের উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকতে হয়। অর্থাৎ পরিবেশের আনুকুল্য এবং সেই সাথে অন্যান্য জীবের মিথস্ক্রিয়া ব্যতীত কোনো জীব বাঁচতে পারে না। এটাকে জীবের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বলা হয়। উদ্ভিদ ও প্রাণীর পারস্পরিক নির্ভরশীলতা দ্বারা পরিবেশ সংরক্ষিত হয়। যেমন: একটি পুকুর বা দীঘির মধ্যে উদ্ভিদ ও প্রাণী নির্ভরশীলতায় পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান এবং দিঘির কোনো একটি প্রাণীর উপর সজীব এবং জড় উপাদানের প্রভাব পর্যালোচনা করলেই নির্ভরশীলতার পরিবেশ সম্বন্ধে একটি সম্যক ধারণা পাওয়া যায়। কিন্তু সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে মানুষের হাতে প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিবর্তিত হয়। মানুষ নিজের সুবিধার জন্য পরিকল্পনামাফিক প্রাকৃতিক পারিবেশের রূপান্তর ঘটাতে থাকে। ফলে সৃষ্টি হয় কৃত্রিম পরিবেশ। এ কৃত্রিম পরিবেশের মধ্য থেকেই মানুষকে তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভাল-মন্দ, কর্তব্য-অকর্তব্য, উচিত-অনুচিত ইত্যাদি নৈতিকবোধগুলো নিয়ে টিকে থাকতে হয়। প্রত্যেক সমাজের মানুষই তাদের উপযোগী কিছু নৈতিক নিয়ম তৈরী করে তা না হলে মানুষের জীবন সঙ্কটজনক অবস্থায় পতিত হতো। সমাজে জীবনধারণের জন্য যেমন কিছু নিয়মনীতির প্রয়োজন তেমনি সমাজের অপরিহার্য অংশ পরিবেশের প্রতি মানুষের সচেতনতা প্রয়োজন । মানুষের অস্তিত্ব পৃথিবীর জীবনধারক পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। পরিবেশের অঙ্গহানি বা ক্ষয় (যথা: প্রজাতির বিলুপ্ত বা মৃত্তিকা ক্ষয়) মানুষের অস্তিত্বের পক্ষে ঋনাত্মক পরিনতির ইঙ্গিত বহন করে। সুতরাং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অস্তিত্বের জন্য টেকসই পরিবেশগত উন্নয়ন বা পরিবেশের স্থায়িত্ব পরিচালনা অপরিহার্য। পরিবেশ পরিচালনের একটি অত্যাবশ্যক বৈশিষ্ট্য হলো পৃথিবীর সকল মানুষকে একটি সাধারণ পরিবেশ নীতির আওতায় আনা। দর্শনের একটি অন্যতম শাখা হিসেবে নীতিবিদ্যা কেবল মানুষের আচরণ সম্পর্কীয় আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও বর্তমানে এর নানা শাখা-প্রশাখা বিকাশ লাভ করেছে। নীতিবিদ্যার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এর

Dhaka University Institutional Repository

তিনটি ধারা লক্ষণীয়। এগুলো হলো-প্রচলিত নীতিবিদ্যা, পরানীতিবিদ্যা এবং প্রায়োগিক নীতিবিদ্যা। পরিবেশ নীতিবিদ্যা প্রায়োগিক নীতিবিদ্যার একটি নতুন সংযোজন।

পরিবেশ নীতিবিদ্যার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। কেউ কেউ মনে করছে মানুষে মানুষে যেখানে এত দ্বন্দ্ব সেখানে পরিবেশ বিপর্যয় হওয়া অবধারিত। প্রতিনিয়ত বিশ্বে যেসকল অনাকাঙ্খিত ঘটনা ঘটে যাচ্ছে তার নৈতিক সমাধান দেয়া কঠিন হয়ে যাচ্ছে। সেখানে পরিবেশকেন্দ্রিক সমস্যাগুলোর নৈতিক সমাধান অকল্পনীয়। তবে পরিবেশগত আলোচনাসমূহ অনেকটা তাত্ত্বিক হলেও এর ব্যবহারিক গুরুত্ব অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। আমরা জানি ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, কীটনাশকের ব্যবহার, প্রযুক্তি এবং শিল্প যখন পরিবেশের উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলতে শুরু করে তখনই পরিবেশ নীতিবিদ্যার উত্থান হয়েছে। সুতরাং একে পরিবেশ রক্ষার ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করতে পারি। পরিবেশ নীতিবিদ্যায় কেবল মানুষের স্বার্থরক্ষার কথাই বলা হয় না বরং এখানে অন্যান্য অমানব প্রাকৃতিক সত্তার বিষয়েও আলোকপাত করা হয়। এটি মূলত মানুষ এবং প্রাকৃতিক বিশ্বের মধ্যকার নৈতিক সম্পর্ককে বিবেচনা করে এবং পরিবেশ সম্পর্কে মানুষ কি ধরণের সিদ্ধান্ত নিবে তা আলোচনা করে। যেমন:

১. মানুষের ব্যবহারের স্বার্থে বন ধ্বংস করা উচিত কিনা?

২. আমরা কি জেনেশুনে অন্যান্য প্রজাতির বিলুপ্তির কারণ হবো?

৩. পরিবেশকে সুরক্ষা ও সংরক্ষণের জন্য মানুষকে কি সাধারণ জীবনযাপনে বাধ্য করা উচিত?

যেহেতু পরিবেশ নীতিবিদ্যার কোনো নির্দিষ্ট আন্তর্জাতিক পরিবেশগত কোড নেই তাই পরিবেশের সাথে মানুষের সম্পর্ক কেমন হবে, আমরা বিশ্বের সম্পদ এবং অন্যান্য প্রজাতির প্রতি কেমন আচরণ করব তা সহজভাবে উত্তর দেওয়া সম্ভব না হলেও পরিবেশ নীতিবিদ্যা তার অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পদ লুণ্ঠনের গুদামঘর নয় বরং জীবনের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য এটি একটি অত্যাবশ্যক রিজার্ভ। প্রাকৃতিক সম্পদের যত্রতত্র ব্যবহার আমাদের জন্যই ক্ষতিকর। আমরা বাড়িঘর তৈরির জন্য গাছপালা কাটছি। প্রতিনিয়ত প্রাকৃতিক সম্পদের উপর আমাদের হস্তক্ষেপ চলছে। সম্পদের অযৌক্তিক, অনিয়ন্ত্রিত ও অবিবেচনাপ্রসূত ব্যবহার আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মেকে ঝুঁকির মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে। এগুলো কি নৈতিক? যখন শিল্প প্রক্রিয়াগুলো সম্পদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে

যায় তখন এ নিখোঁজ সম্পদের পুনরুদ্ধার করা শিল্পের দায়িত্ব নয় কি? কিংবা তারা কি পারবে পরিবেশকে আগের অবস্থানে নিয়ে যেতে? এগুলো পরিবেশ নীতিবিদ্যার বিষয়। তাই বলা যায় পরিবেশ নীতিবিদ্যা কেবল বর্তমান প্রজন্মের প্রয়োজন সাধনের কথাই বলে না বরং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য পৃথিবীর কথাও বিবেচনা করে।

মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি এ পরিবেশের সঙ্গে পারস্পরিক ক্রিয়ার মাধ্যমে বেঁচে থাকে। মানুষের জীবনের প্রায় সব মৌলিক চাহিদার সংস্থান হয় পরিবেশের মাধ্যমে। কিন্তু এই মানুষেরই স্বেচ্ছাচারী ও অবিবেচনাপ্রসূত কর্মকান্ডের ফলে দিন দিন পরিবেশ দূষিত হচ্ছে, নষ্ট হচ্ছে পরিবেশের ভারসাম্য। এগুলো অনৈতিক নয় কি?

তাছাড়া নির্বিচারে বনাঞ্চল ধ্বংস করার কারণে প্রাণীদের আবাসস্থলের ক্ষতি হচ্ছে বিধায় তারা মানববসতিতে প্রবেশ করছে। এতে সেখানে বসবাসকারী জনগণের কাছে তা হুমকিস্বরূপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। কিছু ক্ষেত্রে মানুষ নিজেকে রক্ষার জন্য এ ধরণের বন্যপ্রাণীকে হত্যা করে। আবার প্রাণীরা মানুষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যার জন্যও তাদেরকে হত্যা করা হয়। এছাড়া প্রাণীদের উপর গবেষণাও তাদের জন্য ক্ষতি বয়ে আনে। এভাবে দিন দিন বহু প্রাণীর বিলুপ্তি হচ্ছে। তাই বলা যায় আমরা কিভাবে তাদের বেঁচে থাকার অধিকারকে অস্বীকার করতে পারি? আমরা কিভাবে তাদেরকে বাসস্থান এবং খাদ্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখতে পারি ? কে আমাদের স্বার্থের জন্য তাদের ক্ষতি করার অধিকার দিয়েছে? পরিবেশের প্রতি উচিত্য- অনৈচিত্যের এ সব বিষয়গগুলো পরিবেশ নীতিবিদ্যার অন্তর্গত যা আমাদের পরিবেশ সুরক্ষার জন্য প্রয়োজন।

যারা মনে করেন যে প্রকৃতির কোন মূল্য নেই তাদের কাছে পরিবেশ নীতিবিদ্যারও কোন মূল্য নেই। আবার কেউ কেউ মনে করেন প্রকৃতির যেহেতু স্বতঃমূল্য নেই তাই পরিবেশ নীতিবিদ্যা বলেও কিছু নেই। আমেরিকান পরিবেশ নীতিদার্শনিক হোমস রলস্টন এ শর্তকে প্রত্যাখ্যান করে প্রকৃতি ও পরিবেশের যে মূল্য আছে তা উল্লেখ করেন। তিনি প্রকৃতি ও পরিবেশের চৌদ্ধটি মূল্যের কথা বলেন। এগুলো হল: জীবন সহায়ক মূল্য, অর্থনৈতিক মূল্য, বিনোদনমূলক মূল্য, নান্দনিক মূল্য, বহুমাতৃক প্রজনন সম্পর্কিত মূল্য, ঐতিহাসিক মূল্য, চরিত্র গঠনকারী মূল্য, বৈজ্ঞানিক মূল্য, সাংস্কৃতিক-প্রতীকী মূল্য, জীবনের মূল্য, ধর্মীয় মূল্য, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের মূল্য, স্থায়িত্ব ও স্বত:স্ফূর্ত মূল্য, দ্বান্দ্বিক মূল্য।[১৮] এই মূল্যগুলো প্রকৃতির সকল সম্পদের স্বত:মূল্যের কথা বলে।

মূলতঃ পরিবেশ নীতিবিদ্যাকে অস্বীকার করলে পুরো নীতিবিদ্যাকেই অস্বীকার করা হয়। কারণ পরিবেশ ও মানব জীবন এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। প্রকৃতিতে মানুষসহ অন্যান্য জীবজন্তু, প্রাণী, পশুপাখি, জলবায়ু, উদ্ভিদ, মাটি, অনুজীব প্রভৃতি একে অন্যের সাথে সহাবস্থান করছে। যাকে আমরা বাস্তুসংস্থান বলি। জৈবিক ও বৌদ্ধিক স্বাতন্ত্র্যের কারণে মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব হওয়া সত্ত্বেও মানুষ পরিবেশরই অবিচ্ছিন্ন সত্তা। মানুষ প্রাকৃতিক পরিবেশের সন্তান এবং এ প্রাকৃতিক পরিবেশেই সে তার আপন অস্তিত্বের বিকাশ ঘটিয়েছে। মানুষকে সমাজের অন্যান্য সবকিছুরই পাশাপাশি বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদ এর সাথে বসবাস করতে হয়। ফলে একজন বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব হিসেবে মানুষকে নৈতিকভাবে তাদেরকে শ্রদ্ধা করা দরকার।

পরিবেশ নীতিবিদ্যার গুরুত্বপূর্ণ অবদান হলো প্রাকৃতিক সম্পদকে সংরক্ষণ করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য ও টেকসই পৃথিবী উপহার দেয়ার পক্ষে কথা বলা। এখানে বলা হয় যে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য পৃথিবী রেখে যাওয়া আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। কিন্তু পরিবেশগত অবনতি ও সম্পদের হ্রাসের ফলে আমরা আমাদের ভাবিষ্যৎ প্রজন্মকে হুমকির মধ্যে ফেলে দিচ্ছি যা কোনভাবেই কাম্য হতে পারে না। তাদেরকে ভাল পরিবেশ উপহার দেয়া কি আমাদের দায়িত্ব নয়? লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, অ-নবায়নযোগ্য সম্পদগুলি দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে এবং দুর্ভাগ্যবশত তাদেরকে প্রতিস্থাপিত করাও সম্ভব নয়। আমাদের উচিত প্রয়োজন ও সম্পদের পরিমানের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে ব্যবহার করা যাতে পরবর্তী প্রজন্ম উপকৃত হয় এবং বাসযোগ্য পৃথিবী পায়।

আমরা নৈতিকভাবে পরিবেশের অন্যান্য উপাদানের প্রয়োজনকে বিবেচনা করতে বাধ্য। পরিবেশের উপাদানগুলো কেবল মানবসত্তার জন্য নয় বরং এগুলো প্রাণী ও উদ্ভিদের জন্য। প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নৈতিকতার দাবি রাখে। পরিবেশ নীতিবিদ্যা প্রকৃতির অ-মানব সত্তার প্রতি মানুষের কোন নৈতিক দায়িত্ব আছে কিনা সেই প্রশ্নের উত্তর দেয়ার চেষ্টা করে। উন্নয়ন ও সুবিধার জন্য আমরা জ্বালানি নিঃসরণের মাধ্যমে যে দূষণ করি তা কি ন্যায্য অধিকার? প্রযুক্তিগত অগ্রগতি অব্যাহত রাখা ও যথেচ্ছ ব্যবহার কি পরিবেশের জন্য নৈতিকভাবে সঠিক? এ প্রশ্নগুলোর উত্তর পরিবেশ নীতিবিদ্যা থেকে পেয়ে থাকি। জলবায়ু পরিবর্তন উদ্ভিদের বৈচিত্রতার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এটি সত্য যে, মাত্রাতিরিক্ত দূষণ কেবল মানুষের জন্য নয় বরং উদ্ভিদ ও প্রাণীদের জন্যও ঝুঁকিপূর্ণ। উদ্ভিদ ও প্রাণীদের জন্য যা ক্ষতিকর তা আমাদের জন্যও ক্ষতিকর। কেননা আমাদের বেঁচে থাকা তাদের উপর নির্ভর করছে। এ থেকে এটাই স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে,

পরিবেশকে রক্ষা করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। পরিবেশের প্রতি আমাদেরও কর্তব্য আছে এবং অন্যান্য জীবসত্তাগুলোর প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি নৈতিক মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে হওয়া উচিত। এমনকি যদিও মানবসত্তাকে পরিবেশের প্রধান উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়, প্রাণী ও উদ্ভিদের গুরুত্বও কম নয়। তাদেরও সম্পদের ন্যায্য ভাগ এবং একটি নিরাপদ জীবন পরিচালনার অধিকার আছে। এগুলো পরিবেশ নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়।

নৈতিক দায়িত্ব বলতে সাধারন জ্ঞান, সমতা, পছন্দ এবং মূল্যের গুরুত্বকে বুঝায়। তাই এ কথাটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে, যদি একজন ব্যক্তি নৈতিকভাবে কোনকিছু করার জন্য দায়বদ্ধ হয় তাহলে তিনি-

১. প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানেন;

২. এটি সম্পাদন করতে সক্ষম;

৩. কোন কিছু করবেন কি করবেন না তা ইচ্ছামত স্বাধীনভাবে বেছে নিতে পারেন; এবং

৪. তার কার্যক্রম/কর্মদক্ষতা অন্যান্য সত্তার ক্ষেত্রে মঙ্গল বয়ে আনে। কারণ এ প্রয়োজনীয়তাগুলির প্রতিক্রিয়া একজন নৈতিক ব্যক্তি হিসাবে তার মূল্যের উপর প্রতিফলন ঘটায়।

তাই সমাজের ভারসাম্য অবস্থা বজায় রাখার জন্য ব্যক্তি পর্যায়ে নৈতিকতা থাকা প্রয়োজন। ব্যক্তির কঠোর সংকল্প এবং পরিবেশগগত নীতিবাক্য পৃথিবীর জীবনধারায় অনেক পরিবের্তন আনবে। তাই পরিবেশ নীতিবিদ্যা পাঠের ফলে মানুষের মধ্যে নৈতিক ব্যক্তি হিসেবে কর্তব্যবোধ জাগ্রত হয়, মানুষ নৈতিক দায়িত্ব সম্পর্কে আরো সচেতন হয়।

পরিবেশ নীতিবিদ্যার গুরুত্ব বোঝানোর জন্য একটি উদাহরণ দেয়া যাক। ধরা যাক পাহাড়ঘেরা, ছায়া সুনিবিড় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য অতুলনীয় যা এখানের সবাইকে নানাভাবে আন্দোলিত করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের চারপাশে ঘন বনাঞ্চলবেষ্টিত পাহাড়, নানা প্রজাতির জীবজন্তু, পাখি রয়েছে। ছুটির দিনগুলোতে অনেকে চিত্তবিনোদনের জন্য এখানে আসেন এবং এখানে শিক্ষানুরাগীদের জন্য গবেষণার জন্য অসংখ্য উপকরণও রয়েছে। কিন্তু দীর্ঘদিনের অনুসন্ধানে জানা যায় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত পাহাড়গুলোর তলদেশে নানা মূল্যবান ধাতব সামগ্রী রয়েছে। এসব ধাতব সামগ্রী উত্তোলনের জন্য পাহাড় খুঁড়তে হবে। এতে করে অসংখ্য গাছপালা ধ্বংস হবে,

জীবজন্তু ও পশুপাখি তাদের আবাসস্থল হারাবে। অপরদিকে মূল্যবান ধাতু উত্তোলন করলে দেশ আর্থিকভাবে লাভবান হবে। এক্ষেত্রে প্রশ্ন দেখা দেবে যে, নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের করণীয় কি হবে? আমরা কি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অক্ষুন্ন রাখবো, নাকি মূল্যবান ধাতব পদার্থ উত্তোলন করবো? একমাত্র নৈতিক নীতিমালাই পারে এ নৈতিক প্রশ্নের সঠিক উত্তর করতে। এখানেই মূলত পরিবেশ নীতিবিদ্যার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব নিহিত। আমাদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং অভাবগুলোকে পূরণ করার জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ সংরক্ষণ ও পরিচালনার ক্ষেত্রে পরিবেশ নীতিবিদ্যা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই আমাদের উচিত টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য পরিবেশ নীতিবিদ্যার দিকগুলোর অনুশীলন করা।

তথ্য নির্দেশ

1. Rachel Carson, *The Silent Spring,* Houghton Miffin Company, 1962.
2. William Lillie, *An Introduction to Ethics*, London: Methuen & Co. Ltd., 1964.
3. J.S. Mackenzie, *A Manual of Ethics*, Univ. Tutorial Press Ltd., London, 1964.
4. Aldo Leopold, *A Sand County Almanac*, Oxford University press, 1949.
5. Rachel Carson, *The Silent Spring*, Ibid.
6. Joseph R. DesJardins, *Environmental Ethics: An Introduction to Environmental Philosophy*,Wardsworth, 2013, p.77.
7. K.Suter, "The Club of Rome: The Global Conscience", *Contemporary Review*, 1999, pp.1-5.
8. Lynn White, "The Historical Roots of our Ecological Crisis", *Science*, Vol. 155, March, 1997.
9. Garrett Hardin, "The Tragedy of the Commons", *Science*, Vol. 162, Dec, 1968.
10. Eugene C. Hargrove, "Weak Anthropocentric Intrinsic Value", *The Monist*, Vol. 75, No. 2, April, 1992, p. 183.
11. John B. Cobb, *Is Too Late? A Theology of Ecology*, Beverley Hills, Bruce, 1972.

12. কালীপ্রসন্ন দাস, "পরিবেশ নীতিবিদ্যা: উদ্ভব ও বিকাশ", *কুসুমে কুসুমে চরণচিহ্ন*, মফিজউদ্দিন আহমদ স্মৃতিসংসদ, রাজশাহী, ২০০৩, পৃ. ১৫৪।

13. R. Routley, "Is There a Need for a New An Environmental Ethics?", *Proceedings of the XVth World Congress of Philosophy*, Varna, Sofia Press, 1973, pp. 205-210.

14. John Passmore, *Mans Responsibility for Nature*, Duckworth, England, 1974, (2nd edition 1980).

15. সত্তর দশকে *Inquiry* ছিল পরিবেশ নীতিবিদ্যাবিষয়ক একমাত্র জার্নাল। *Evironmental Ethics*- এর পর *Evironmental Values(1991)* জার্নালে পরিবেশ নীতিবিদ্যাবিষয়ক আলোচনা করা হয়।

16. Robin Attfield, *The Ethics of Evironmental Concern*, The University of Georgia Press, London, 1983 (2nd edition1991).

17. Donald Scherer & Thomas Attig, *Ethics and the Environment*, Prentice Hall, New Jersey, 1983; Eugene C. Hargrove, *Foundations of Evironmental Ethics*, Prentice Hall, New Jersey,1989.

18. এ. এস. এম.আব্দুল খালেক, *প্রায়োগিক নীতিবিদ্যা*, অনন্যা, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

মানবকেন্দ্রিকতাবাদ ও অ-মানবকেন্দ্রিকতাবাদ

১৯৪৯ সালে আমেরিকার জীববিদ অ্যালডো লিওপোল্ড তাঁর "The Land Ethics" প্রবন্ধে পরিবেশ সম্পর্কিত দার্শনিক আলোচনার সূত্রপাত করেন। উক্ত প্রবন্ধে তিনি ভূ-নীতিবিদ্যা নামক এক নতুনধরণের নীতিবিদ্যার প্রস্তাব দেন এবং এ প্রস্তাবের মাধ্যমেই পরোক্ষভাবে পরিবেশ নীতিবিদ্যার সূত্রপাত ঘটে। তবে উল্লেখ্য যে, প্রবন্ধটি প্রকাশের ত্রিশ বছর পর বিষয়টি 'পরিবেশ নীতিবিদ্যা' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। মূলতঃ এজন্যই লিওপোল্ডকে পরিবেশ নীতিবিদ্যার জনক বলা হয়। তবে তাকে পরিবেশ নীতিবিদ্যার জনক বলা হলেও 'পরিবেশ নীতিবিদ্যা' শব্দগুলো প্রথম ব্যবহার করেন নর্থ টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক ও পরিবেশ দার্শনিক ইউজিন সি. হারগ্রভ। তিনি তাঁর 'Environmental Ethics' নামক জার্নালে ১৯৭৯ সালে তা প্রকাশ করেন। এ প্রসঙ্গে হারগ্রভ বলেন যে, পরিবেশ নীতিবিদ্যার নাম পরিবেশ দর্শন হলে আরও যথার্থ হতো। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমার জার্নালের নামেই এ বিষয়টির নামকরণ করা হয়। আমার জার্নালের নাম পরিবেশ দর্শন ছিল না, ছিল পরিবেশ নীতিবিদ্যা। আমি জার্নালের এরকম নাম রাখি মূলত নৈতিক মূল্যের উপর গুরুত্ব প্রদান, সুনির্দিষ্টভাবে পরিবেশ নিয়ে নৈতিক আলোচনামূলক লেখা প্রকাশ করার জন্য এবং বিজ্ঞানের দর্শনবিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশকে নিরুৎসাহিত করার জন্য।[১]

পরবর্তীতে ধীরে ধীরে পরিবেশ নীতিবিদ্যা বিকাশ লাভ করতে থাকে। যেহেতু পরিবেশ নীতিবিদ্যা মানুষ ও অ-মানব প্রাকৃতিক সত্তার মধ্যকার নৈতিক সম্পর্ক নিয়ে পদ্ধতিগত আলোচনা করে তাই পরিবেশগত সুরক্ষার জন্য যে নৈতিক বাধ্যবাধকতাগুলো রয়েছে সেগুলোকে কেন্দ্র করে এটি গড়ে ওঠে। পরিবেশ সংকট মোকাবেলা করে নিরাপদ ও সুরক্ষিত পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য পরিবেশ নীতিবিদ্যার গুরুত্ব রয়েছে। বর্তমান বিশ্বে বিজ্ঞানের প্রযুক্তিগত আবিষ্কারের প্রসারণ, শিল্পায়ন ও জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির ফলে ওজনস্তরের ক্ষয়, জীব-মন্ডলের পরিবর্তন, ভূ-পৃষ্ঠের উষ্ণতা বৃদ্ধি ইত্যাদি পরিবেশগত সংকটের সৃষ্টি হচ্ছে এবং ফলশ্রুতিতে প্রাকৃতিক সম্পদ হ্রাস পাচ্ছে ও এ পৃথিবী বসবাসের অনুপোযোগী হয়ে পড়ছে। এ থেকে পরিত্রাণের জন্য বিজ্ঞানীদের পাশাপাশি দার্শনিকগণও কতগুলো নৈতিক নীতিমালা প্রনয়ণ করেন। এ নীতিমালাগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে পরিবেশ সুরক্ষায় বিশেষ ভূমিকা পালন করা যায়। ধরিত্রীর বুকে টিকে থাকতে হলে পরিবেশের সাথে আমাদের কার্যাদি পরিকল্পনাভিত্তিক হতে হবে। পরিবেশ নীতিবিদ্যা পরিবেশের প্রতি মানুষের যে নীতিবোধ এবং নৈতিক বাধ্যবাধকতাগুলো রয়েছে তা চিহ্নিত করে কার্যাবলী পরিকল্পনা অনুযায়ী সম্পাদন করতে

সাহায্য করে। তাছাড়া এখানে বিভিন্ন প্রকারের প্রশ্ন করা হয়। যেমন, অ-মানব প্রাকৃতিক সত্তার সাথে আচরণের সময় মানুষের নৈতিক নিয়ম মান্য করা প্রয়োজন কি-না। যদি প্রয়োজন হয় তবে আমাদের কি কি নৈতিক নিয়ম মেনে চলতে হবে ? পরিবেশের প্রতি মানুষের নৈতিক দায়িত্বের পরিসর কতটুকু? মানুষের এ দায়িত্ব যথার্থ কি-না। এ ধরণের দায়িত্ব কিভাবে প্রতিপাদিত হবে? পরিবেশ নীতিবিদ্যা এ ধরণের নানা প্রশ্নের উত্তর দেয়। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে উক্ত প্রশ্নগুলোর মধ্যে বিভিন্ন মতভিন্নতা রয়েছে। পরিবেশ নীতিবিদ্যার উষালগ্ন থেকেই প্রধানত দুটি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এ ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। এগুলো হল:

১. মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি; ও

(Anthropocentric Approach)

২. অ- মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি।

(Non-Anthropocentric Approach)

মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিবেশকে ব্যবহার করার নীতিবিদ্যা এবং অ- মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিবেশের নীতিবিদ্যা হিসাবে গণ্য করা হয়।[২]

আলোচ্য অধ্যায়ে আমরা প্রথমে মানবকেন্দ্রিকতাবাদের স্বরূপ, মানবকেন্দ্রিক শব্দের বিভিন্ন অর্থ, মানবকেন্দ্রিক নৈতিকতার উৎস অনুসন্ধানে পাশ্চাত্য দর্শনে পরিবেশের প্রতি মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি কি ছিল তা আলোচনাপূর্বক মানবকেন্দ্রিকতাবাদের বিভিন্ন মতবাদ, মানবকেন্দ্রিকতাবাদকে কাটিয়ে উঠার প্রচেষ্টা হিসেবে গড়ে উঠা মতবাদসমূহসহ এগুলোর খন্ডন আলোচনা করবো। এছাড়া অ-মানবকেন্দ্রিকতাবাদ, অ-মানবকেন্দ্রিকতাবাদের ত্রুটি,মানবকেন্দ্রিকতাবাদ ও অ-মানবকেন্দ্রিকতাবাদের মধ্যকার পার্থক্যও আলোচনা করা হবে।

২.১ মানবকেন্দ্রিকতাবাদের স্বরূপঃ

যে কোন সাধারণ মানুষকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে কি উদ্দেশ্যে সবকিছু অস্তিত্বশীল ? নিঃসন্দেহে উত্তর হবে সকল কিছু আমাদের ব্যক্তিগত ব্যবহার এবং স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের জন্য সৃষ্টি হয়েছে। সংক্ষেপে সকল বস্তু মানবজাতিকে বিশেষ সুবিধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তৈরী হয়েছে। তাই মানবজাতির অধিকাংশই তাদের চারপাশের অসংখ্য বিষয়বস্তু নিজেদের উন্নয়ন সাধনের জন্য ব্যবহার করে। পরিবেশ নীতিবিদ্যা এ ধরণের চিন্তাভাবনা নিয়েই যাত্রা শুরু করে যা ছিল মূলত মানবকেন্দ্রিক।

মানবকেন্দ্রিকতাবাদের ধারণা মূলতঃ মেসোপটেমিয়া থেকে শুরু হয়।[৩] অনেক নীতিবিদ মানবকেন্দ্রিকতাবাদের শিকড় খুঁজে পেয়েছেন জুডো ক্রিশ্চিয়ান বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্বে। সাধারণভাবে মানবকেন্দ্রিক বলতে মানুষ-কেন্দ্রিককে বুঝায়। আর মানবকেন্দ্রিকতা অনুসারে মানুষ হলো পৃথিবীতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতি এবং তারা অন্যসব প্রাণীর চেয়ে উচ্চতর। সুতরাং যে মতবাদ মনে করে মানুষ বিশ্বের কেন্দ্রবিন্দু,জগতের সবকিছু তার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে, সেই মতবাদকে মানবকেন্দ্রিকতাবাদ বলে। অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারি মানবকেন্দ্রিকতাবাদকে সংজ্ঞায়িত করেছে এভাবে– মানুষ সকল কিছুর কেন্দ্রস্থল। সুতরাং এটি মানুষ-কেন্দ্রিকতা (Human-Centered) হিসেবেও পরিচিতি। মানবকেন্দ্রিক মতবাদের কেন্দ্রবিন্দু হল মানুষ এবং তাদের স্বার্থ। এ মতবাদ অনুসারে সকল পরিবেশগত বিষয়গুলো মানুষের স্বার্থের বিবেচনায় রাখা উচিত এবং সমস্ত পরিবেশ নীতিমালাগুলি কিভাবে মানুষকে প্রভাবিত করে তার ভিত্তিতেই মূল্যায়ন করা উচিত। উদ্ভিদ এবং প্রাণীসহ অ-মানব প্রাকৃতিক সত্তা কেবল মানুষের উদ্দেশ্য সংরক্ষণের জন্য বিদ্যমান। যেহেতু কেবল মানুষেরই যুক্তির ক্ষমতা রয়েছে, কেবল তাদের নৈতিক চিন্তা আছে তাই মানুষের স্বার্থের ক্ষেত্রে পরিবেশকে উপকরণ হিসেবে মূল্যবান মনে করা হয়। এ মতবাদে ভাল-মন্দের একমাত্র মাপকাঠি হিসেবে মানুষের স্বার্থকে বিবেচনা করা হয়। এটি আরও বিশ্বাস করে যে, মানুষের যে সক্ষমতাগুলো অ-মানব প্রাকৃতিক সত্তার মধ্যে নেই তা অ-মানবের যে সক্ষমতাগুলো মানুষের মধ্যে নেই তার চেয়ে মূল্যবান।

দার্শনিক দিক থেকে মানবকেন্দ্রিকতাবাদ হল নৈতিক নীতিমালাগুলি কেবল মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এবং মানুষের চাহিদা এবং স্বার্থেরই উচ্চতর মূল্য আছে এমনকি এটি ব্যতিক্রম, মূল্যবান এবং গুরুত্বপূর্ণ।[৪]

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকামানবকেন্দ্রিকতাবাদকে সংজ্ঞায়িত করেছে এভাবে – দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে মানুষ বিশ্বের কেন্দ্রীয় বা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সত্তা। উল্লেখ করা যায় যে, এটি অনেক পশ্চিমা ধর্ম ও দর্শনে একটি মৌলিক বিশ্বাস হিসেবে অন্তর্ভূক্ত।[৫]

মানবকেন্দ্রিকতাবাদ মানুষকে প্রকৃতি থেকে পৃথক এবং উচ্চতর হিসাবে বিবেচনা করে এবং ধরে নেয় যে, মানব জীবনের স্বতঃমূল্য আছে এবং প্রকৃতির অন্যান্য অ-মানব প্রাকৃতিক সত্তাসমূহ (প্রাণী, উদ্ভিদ, খনিজ সম্পদ ইত্যাদি) মানবজাতির সুবিধার্থে কাজে লাগানো যেতে পারে এবং এটি সমর্থনযোগ্য।[৬] মানবকেন্দ্রিক নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে পরিবেশগত নীতি নির্ধারণের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা রয়েছে। এ ঘটনাটি অস্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত কাকাডু ন্যাশনাল পার্ক এর খনন বিতর্ক[৭] নামে পরিচিত। এ পার্কটিতে জীববৈচিত্র্য ধারণ করার মতো বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন:

পার্কটি বৃক্ষময় অসমতল বনভূমি, জলাভূমি ও নাব্য খাল দ্বারা পরিবেষ্টিত। এখানে এমন কিছু দুর্লভ প্রাণী রয়েছে যা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। পার্কটির ভূ-গর্ভে অত্যন্ত মূল্যবান খনিজ সম্পদ যেমন: প্লাটিনাম, প্যালেডিয়াম ও ইউরেনিয়াম রয়েছে। তাছাড়া পার্কটি জাওয়িন আদিবাসীদের নিকট আধ্যাত্মিক তাৎপর্য বহন করে। এছাড়া এর নন্দনতাত্ত্বিক সৌন্দর্যও অতুলনীয় এবং সবকিছু মিলে কাকাডুর প্রাকৃতিক মূল্য অবর্ণনীয়।

কাকাডুর ভূ-গর্ভে যেসকল খনিজ সম্পদ রয়েছে সেগুলোর অর্থনৈতিক মূল্যও অনেক। এ খনিজ সম্পদ বিক্রয় করে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়া যাবে। আবার কাকাডুর নন্দনতাত্ত্বিক সৌন্দর্য, বাস্তুবিদ্যাগত তাৎপর্য ও আধ্যাত্মিক মূল্য অপরিসীম। ইতোমধ্যে কাকাডু থেকে খনিজ সম্পদ আহরণ করার উদ্যোগ নেয়া হলে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়। বিতর্কের মূল বিষয় হল, কাকাডুতে খননকার্য পরিচালনা নৈতিকভাবে সমর্থনযোগ্য কিনা? এর উত্তরে ভূ-তত্ত্ববিদ, জীববিদ, পরিবেশবিদরা দুইটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়েন। একদল খনিজ সম্পদ আহরণকে নৈতিকভাবে সমর্থনযোগ্য মনে করেন এবং অন্যদল খনিজ সম্পদ আহরণকে অসমর্থন করেন। প্রথম দলের ভাষ্যমতে, খনিজ সম্পদ আহরণের মাধ্যমে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া যাবে। ফলে দেশের মানুষের জীবনমান অর্থনৈতিক দিক থেকে সমৃদ্ধতর হবে। অন্যদল মনে করেন যে কেবল মানুষের ভাল-মন্দ দ্বারাই নৈতিকতার মানদন্ড নির্ধারণ করা যায় না। অ-মানব প্রাকৃতিক সত্তাসমূহের ভালোমন্দকে নৈতিকতার মানদন্ড হিসাবে নির্ধারণ করতে হবে। এ বিতর্কের ক্ষেত্রে যারা প্রথম দলের সমর্থক তাদেরকে সাধারণ অর্থে মানবকেন্দ্রিকতাবাদী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। তারা কেবল মানুষকেই নৈতিক বিবেচনার যোগ্য মনে করে। তারা অ-মানব প্রাকৃতিক সত্তাকে নৈতিকতার আওতাভুক্ত নয় বলে দাবি করে । তাই তারা মানুষের প্রয়োজনে কাকাডুর ভূ-গর্ভে অবস্থিত খনিজ সম্পদ ব্যবহার করা নৈতিক দিক থেকে অনুমোদনযোগ্য বলে মনে করেন।

উপরের আলোচনার মূলকথা হলো, মানবকেন্দ্রিকতাবাদে কেবল মানুষই নৈতিক বিবেচনাধীন, মানুষ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর অস্তিত্ব নৈতিকতার জগতে নেই। মানবকেন্দ্রিকতাবাদের এ দৃষ্টিভঙ্গিটি মূলতঃ পাশ্চাত্য নীতিবিদ্যার গতানুগতিক সংজ্ঞা থেকে উৎসারিত। গতানুগতিক পাশ্চাত্য সনাতনী নীতিবিদ্যার সংজ্ঞানুসারে নীতিবিদ্যা হল এমন একটি আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান যা সমাজে বাসবাসকারী মানুষের আচরণের ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ ইত্যাদি মূলায়ন করে।[৮] এ সংজ্ঞায় কেবল মানুষের সাথে মানুষের আচরণের নৈতিক সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। প্রকৃতির অন্যান্য সত্তাসমূহ নৈতিক বিবেচনার বিষয় নয়।

লক্ষ্য করলে দেখা যায় পরিবেশ নীতিবিদ্যায় মানবকেন্দ্রিক শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানবকেন্দ্রিকতাবাদের অর্থ বিভ্রান্তি পরিলক্ষিত হয়। তাই মানবকেন্দ্রিকতাবাদের বিশদ আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে এর বিভিন্ন অর্থ সম্পর্কে অবহিত হওয়া আবশ্যক।

২.২ 'মানবকেন্দ্রিক' শব্দের অর্থ ঃ

পরিবেশ নীতিবিদ্যায় 'মানবকেন্দ্রিক' শব্দের বিভিন্ন অর্থ আলোচনা করা হয়েছে ।[৯] এগুলো হল:

১. স্বতঃমূল্য অর্থে মানবকেন্দ্রিকতা;

২. নৈতিকতার উৎস অর্থে মানবকেন্দ্রিকতা;

৩. নৈতিকতার বিষয়বস্তুর দিক থেকে মানবকেন্দ্রিকতা; ও

৪. পরিপ্রেক্ষিতগত মানবকেন্দ্রিকতা ।

' মানবকেন্দ্রিকতা' শব্দের উপরিউক্ত চারটি অর্থকে নিম্নে ব্যাখ্যা করা হলোঃ

২.২.১ স্বতঃমূল্যের দিক থেকে মানবকেন্দ্রিকতা:

এই অর্থে মানবকেন্দ্রিকতা বলতে বুঝায় একমাত্র মানুষেরই স্বতঃমূল্য রয়েছে। অ-মানব প্রাকৃতিক সত্তার কোন স্বতঃমূল্য নেই, তাদের আছে ব্যবহারিক মূল্য। আমেরিকার পরিবেশ নীতিবিদ জন বেয়ার্ড ক্যালিকটস্বতঃমূল্য অর্থে মানবকেন্দ্রিক শব্দটি ব্যবহার করেন। তিনি তাঁর Non-Anthropocentric Value Theory and Environmental Ethics নামক প্রবন্ধে এ প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। ক্যালিকটের মতে: মানবকেন্দ্রিক মূল্যতত্ত্ব সাধারণভাবে এ বিষয়ে একমত পোষণ করে যে, কেবল মানুষই স্বতঃমূল্যে মূল্যবান। মানুষ ব্যতীত সকল প্রকারের প্রাণী এবং অন্য সবকিছুর কেবল যন্ত্রতুল্য মূল্যে মূল্যবান।

অর্থাৎ ক্যালিকটের মতানুসারে মানবকেন্দ্রিকতা অনুযায়ী কেবল মানুষের স্বতঃমূল্য রয়েছে।

২.২.২ নৈতিকতার উৎসের দিক থেকে মানবকেন্দ্রিকতা:

ইউজিন সি হারগ্রভ নৈতিকতার উৎসের দিকে থেকে মানবকেন্দ্রিকতার কথা বলেন। নৈতিকতার উৎস বলতে মূল্যের উৎপত্তিস্থলকে বোঝানো হয়। গতানুগতিক নীতিবিদ্যায় নৈতিকতার উৎস বলতে মানুষকে বুঝানো হয়েছে। কেননা তখন কেবল মানুষের স্বতঃমূল্যকে স্বীকার করা হত। ইউজিন সি. হারগ্রভ 'মানবকেন্দ্রিক' শব্দটির মানে 'মানুষের মূল্যায়ন নির্ভর' বুঝিয়েছেন। তাঁর মতে এর দ্বারা মানুষের কেবল স্বতঃমূল্য রয়েছে, মানুষই নৈতিক মূল্যের উৎপাদক বা আরোপকারী, মানুষ যা

কিছুকে নৈতিক মনে করে মূল্যায়ন করবে তাই মূল্যবান মনে করতে হবে। মানুষের উপর মূল্য নির্ভর করে বিধায় এ অর্থে মানবকেন্দ্রিকতা হলো বিষয়ীগত অর্থাৎ সেক্ষেত্রে বলা যায়, যে জগতে মানুষের অস্তিত্ব নেই সেই জগতে নৈতিকতাও নেই।

২.২.৩ নৈতিকতার বিষয়বস্তুর দিক থেকে মানবকেন্দ্রিকতাঃ

জন ও'নিল তাঁর "The Varieties of Intrinsic Value" নামক প্রবন্ধে নৈতিকতার বিষয়বস্তুর দিক থেকে মানবকেন্দ্রিক শব্দটি ব্যবহার করেন। লক্ষ্য করলে দেখা যায় ক্যালিকট 'মানবকেন্দ্রিক' শব্দটিকে স্বতঃমূল্যের দিক থেকে বিবেচনা করেছেন। তিনি বলেন, স্বতঃমূল্য হলো অ-ব্যবহারিক মূল্য। কিন্তু পরবর্তীতে হারগ্রভ ক্যালিকটকে সমালোচনা করে বলেন, স্বতঃমূল্য ব্যবহারিক কিংবা অ-ব্যবহারিক উভয়ই হতে পারে এবং নৈতিকতার উৎসের দিক থেকে তিনি মানবকেন্দ্রিকতাকে বিষয়ীগত অর্থে ব্যবহার করেন। (উল্লেখ্য যে, এ বিষয়ে পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে)। আবার ও'নিল হারগ্রভকে সমালোচনা করে বলেন 'মানবকেন্দ্রিক' বিষয়গত হতে পারে আবার বিষয়ীগতও হতে পারে। তাঁর মতে, নৈতিকতা কেবল মানুষের উপর প্রয়োগ করা যায়। কেননা মানুষই নৈতিক বিবেচনার আওতাভুক্ত। মানুষ ব্যতীত অন্য কোন সত্তার নৈতিক মূল্য নেই।

২.২.৪ পরিপ্রেক্ষিতগত মানবকেন্দ্রিকতাঃ

মানুষের প্রেক্ষাপট, দৃষ্টিভঙ্গি কিংবা অবস্থান থেকে দেখা হল পরিপ্রেক্ষিত দিক থেকে মানবকেন্দ্রিকতা। এ অর্থে মানবকেন্দ্রিক বলতে বুঝানো হচ্ছে মানুষের পক্ষে তার চিন্তা-কাঠামোর বাহিরে গিয়ে চিন্তা করা সম্ভব নয়। মানুষ যখন চিন্তা করে তখন তার নিজস্ব চিন্তা কাঠামোর মধ্যে থেকেই চিন্তা করে। তার পক্ষে এ অবস্থান অতিক্রম করা সম্ভব নয়। তাই মানুষের ক্ষেত্রে পরিপ্রেক্ষিতগত দিক মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির অবস্থান তৈরী করে। এটা মূলতঃ মানুষের চিন্তা কাঠামোরই একটি অংশ যার কোন বিকল্প নেই। R.E. Purser বলেন যে, মানবকেন্দ্রিকতার ক্ষেত্রে সমস্যার বিষয় খুব একটা নেই কারণ মানুষের পক্ষে নিজেকে তাদের প্রেক্ষিতে কেন্দ্রবিন্দুতে রাখা একেবারেই স্বাভাবিক মনে হয়।[৯]তাছাড়া Henryk Skolimowski তাঁর "The Dogma of Anti-Anthropocentrism and Ecophilosophy" নামক প্রবন্ধে এ বিষয়ে আলোচনা করেন। বস্তুত মানুষ যখন চিন্তা করে তখন তার দেহ -মন -মস্তিষ্কের গড়ন কাঠামো তাকে যে ধরণের চিন্তা করতে বলে সে ধরণের চিন্তাই সে করে। এ গন্ডির বাইরে যাওয়ার কোন সুযোগ মানুষের নেই।[১০]

পরিবেশ নীতিবিদ্যা যে মৌলিক প্রশ্নের মুখোমুখি হয় তা হল প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে আমাদের কেন বাধ্যবাধকতা রয়েছে? যদি উত্তরটি এভাবে হয় যে আমরা মানুষ হিসেবে আমাদের বাধ্যবাধকতা আছে তাহলেই তা মানবকেন্দ্রিক হিসাবে গণ্য হবে। এক অর্থে সমস্ত নীতিবিদ্যাকেই মানবকেন্দ্রিক হিসাবে বিবেচনা করা যায়। কেননা, আমরা জানি কেবল মানুষই নৈতিক বিষয়ে বিতর্ক করতে পারে এবং তার প্রতিফলন ঘটাতে পারে। তবে পরিবেশ নীতিবিদ্যায় মানবকেন্দ্রিকতাবাদের অর্থ সাধারণত এর চেয়ে বেশি কিছু বোঝায়। মূলতঃ মানবকেন্দ্রিকতাবাদ এমন একটি নৈতিক কাঠামোকে বোঝায় যা কেবল মানুষকেই নৈতিক অবস্থানের জন্য স্বীকৃতি দেয়।

সুতরাং মানবকেন্দ্রিক নীতিবিদ্যা দাবি করছে যে কেবল মানুষই নৈতিকভাবে তাদের নিজস্ব বিবেচনায় বিবেচিত। যার অর্থ আমরা পরিবেশের সাথে আমাদের যে সমস্ত প্রত্যক্ষ নৈতিক বাধ্যবাধকতা অর্জন করি সেগুলি আমরা মানুষ হওয়ার কারণেই করে থাকি। মুলতঃ পরিপ্রেক্ষিতগত মানবকেন্দ্রিকতায় নৈতিক চিন্তা মানুষের যেকোন চিন্তার অপরিহার্য পূর্বশর্ত হিসাবে বিদ্যমান থাকে। হারগ্রভ বলেন, মানুষের পক্ষে পরিপ্রেক্ষিতগত মানবকেন্দ্রিকতাকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব বলে মনে হয় না। মানুষ হিসেবে আমরা যখনই যা কিছুকে মূল্য দিই সবকিছুই মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকেই দিয়ে থাকি। এমনকি আমরা যখন একটি বাদুর, একটি গাছ কিংবা একটি পাহাড়ের কথা চিন্তা করি তখনও মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকেই বিশ্বের দিকে তাকাই।[১১] এক্ষেত্রে ফের (Ferre) বলেন যে, মানুষের মানুষ হিসেবে চিন্তা করা ছাড়া উপায় নেই- যাকে তিনি পরিপ্রেক্ষিতগত মানবকেন্দ্রিকতাবাদ বলে অভিহিত করেছেন।[১২]

২.৩ পাশ্চাত্য দর্শনে মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিঃ

বুদ্ধিবৃত্তির কারণে মানুষ সুশৃঙ্খলভাবে যৌক্তিক চিন্তা করতে পারে। মানুষের এই চিন্তা যখন সকল প্রকারের কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে যুক্তিনির্ভর হয়ে ওঠে তখনই দর্শনের সৃষ্টি হয়। কখন থেকে মানুষ দার্শনিক চিন্তা করে আসছে তার কোন সুস্পষ্ট ও সুনিশ্চিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি। দর্শনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে লক্ষ্য করা যায় এর শুরু হয় পাশ্চাত্যেই এবং এ পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাশ্চাত্য ঐতিহ্য মানবকেন্দ্রিক। বর্তমান অধ্যায়ের এই অংশে আমরা মূলত পাশ্চাত্য দর্শনে মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করবো। লক্ষ্য করলে দেখা যায়, প্রচলিত পাশ্চাত্য সনাতনী নীতিবিদ্যার কারণে এর পরিধি আরও বিস্তৃতি লাভ করে।

বিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত পাশ্চাত্য দর্শনে নীতিবিদ্যা বলতে যা বোঝানো হয়েছে তা প্রধানত মানবকেন্দ্রিক। সে সময়কার যেকোন নীতিবিদ্যার পাঠ্যপুস্তকের আলোচ্য বিষয় ছিল মানুষের প্রতি মানুষের আচরণ কিরূপ হওয়া উচিত। অর্থাৎ কেবল মানুষই ছিল সনাতনী নীতিবিদ্যার নৈতিক জগতের মূল বাসিন্দা। তবে সনাতনী নীতিবিদ্যায় অ-মানব প্রাণী ও প্রকৃতির মূল্যকে অস্বীকার করা হয়নি। বরং তারা এদের মূল্যকে অবশ্যই স্বীকার করেন। তবে ধারণা করা হয় এই মূল্য সবসময় মানুষের মূল্যের প্রেক্ষিতে নির্ধারিত হবে। অর্থাৎ যে প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষের জন্ম, বেড়ে ওঠা সে পরিবেশের সাথে মানুষের আচরণের মূল্যায়ন না করে মানুষের সাথে মানুষের আচরণের মূল্যায়ন করাই সনাতনী নীতিবিদ্যার বিষয়বস্তু। এখানে মানুষের প্রয়োজনের নিরিখে পরিবেশের অপরিহার্য অংশ অ-মানব প্রাণী ও প্রকৃতিকে মূল্যায়ন করা হয়। মানুষের প্রয়োজনে এদেরকে যন্ত্রের ন্যায় ব্যবহার করা হবে অর্থাৎ জঙ্গল কাটলে যদি মানুষের বাসস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়, প্রাণী হত্যা করলে যদি মানুষের সুখ বৃদ্ধি পায়, বাঁধ দিয়ে নদীর গতিরোধ করলে যদি মানুষের সুযোগ সুবিধা বাড়ে তবে সেসকল কাজ নৈতিক হবে এবং মানুষের সমৃদ্ধির পরিপোষক হবে বলে মনে করা হয়। তাছাড়া বনভূমি ধ্বংস থেকে বিরত থাকলে, প্রাণীহত্যা বন্ধ করলে, পানিদূষণ, বায়ুদূষণ বন্ধ করলে যদি মানুষের উপকার হয় তবে তা করাও মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি। এ ধরনের মানবকেন্দ্রিক পরিবেশ দার্শনিকরা বর্তমানে মানুষের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেই পরিবেশ সচেতন হচ্ছে। তাই তারা বর্তমানে নিয়ন্ত্রণের কথা বলেন।

নিম্নে ধারাবাহিকভাবে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের দর্শনের ইতিহাসের আলোকে পরিবেশের প্রতি পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোচনা করা হলো:

২.৩.১ প্রাচীন যুগঃ

এশিয়া মাইনরের পশ্চিম সীমান্তবর্তী আইওনিয়া রাজ্যের মাইলেটাস নগরে গ্রিক দর্শনের সূত্রপাত হয়। মাইলেসীয়দের দার্শনিক চিন্তাধারা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বাস্তব জগতকে কেন্দ্র করে তাদের চিন্তার সূত্রপাত ঘটে। তাদের আলোচনার দুইটি প্রশ্ন হল– ক. এই বিশ্বব্রহ্মান্ডের মূলতত্ত্বের স্বরূপ কি? খ. স্থায়ী মূল জগত থেকে দৃশ্যমান ইন্দ্রিয়জগতের উদ্ভব হলো কিভাবে?[১৩] এ প্রশ্ন দুটি থেকে মানব মনের একটি স্বাভাবিক সন্দেহের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তা হলো ইন্দ্রিয় জগত প্রকৃত জগৎ নয়। সক্রেটিস পূর্ববর্তী দার্শনিকদের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু যদিও বিশ্বতত্ত্ব ছিল তবুও তারা মানুষকে তাদের আলোচনা থেকে বাদ দেননি। পাশ্চাত্য দর্শনের জনক থেলিস বিশ্বতাত্ত্বিক মতের পাশাপাশি নৈতিক মতবাদের উপরও গুরুত্ব দিন। তিনি মানুষকে নৈতিকভাবে চলার দিক নির্দেশনা দিয়েছেন।

যেমন 'নিজেকে জান', 'বাড়াবাড়ি পরিহার করো' ইত্যাদি নৈতিক সূত্র তিনিই প্রথম প্রচার করেছিলেন বলে কোন কোন ভাষ্যকার মনে করেন। থেলিস যে বিশ্বতাত্ত্বিক চিন্তাভাবনার সূচনা করেন এন্যাক্সিম্যান্ডার তা অব্যাহত রাখেন।

এন্যাক্সিম্যান্ডারের মতে মানুষ জীবজগতের অংশবিশেষ[১৪]। তাঁর এ মতকে একজন আধুনিক চিন্তাবিদের মত বলে মনে হয় এবং এটি একটি বাস্তুবিদ্যাক আলোচনার অংশ বলা যায়। প্রাচীনযুগের বেশিরভাগ দার্শনিকরা বাহ্যজগৎ নিয়ে খুব বেশি আগ্রহী ছিলেন না বরং তারা বাহ্যজগতের গভীরে মূল বা আদি সত্তা নির্ণয়ে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু বাস্তুবিদ্যা পরিদৃশ্যমান জগৎ নিয়েই আলোচনা করে। এক্ষেত্রে অ্যানাক্সিমিনিসের দর্শনে বাহ্যসত্তা ও মানবসত্তার উভয়ের সমন্বয় দেখতে পাওয়া যায়।

হিরাক্লিটাসের মতে, সবকিছুই পরিবর্তনশীল, স্থিতি বা স্থায়িত্ব বলে জগতে কিছু নেই[১৫]। তাঁর এই উক্তির সাথে বাস্তুবিদ্যাগত চিন্তাভাবনার বেশ কিছু সাদৃশ্য রয়েছে। কেননা বাস্তুবিদ্যার মতে কোনকিছুই স্থায়ী নয়। বিশ্বপ্রকৃতি অস্থায়ী ও নিয়ত পরিবর্তনশীল। তাঁর মতে, মানুষের চিন্তার ঐক্যমূলে প্রজ্ঞাই নিহিত। হিরাক্লিটাসের এ ধরণের চিন্তায় মানুষকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়ার ইঙ্গিত লক্ষ্য করা যায়। আবার দেখা যায় তিনি বলেন যে, এই পৃথিবী সকলের জন্য সমান। এক্ষেত্রে তাকে বাস্তুবিদ্যকও বলা যায়।[১৬]

সংখ্যাতত্ত্বের জনক পিথাগোরাস-এর দর্শনে মানুষ ও অ-মানব প্রাণীর প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয়। 'ফিলোসফি' কথাটির প্রথম ব্যবহারকারী ও প্রবর্তক পিথাগোরাস ফিলোসফি বলতে বুঝতেন জ্ঞানপ্রীতি বা প্রজ্ঞার প্রতি অনুরাগ। তাঁর মতে দৈবসত্তার প্রতি যার ভক্তি আছে অর্থাৎ যিনি প্রজ্ঞার অনুরাগী তিনি যথার্থ মনুষ্য পদবাচ্য। দার্শনিক বলতে তিনি এ শ্রেণির মানুষকেই বুঝিয়েছেন। পিথাগোরাসের আলোচনায় মানুষ ছাড়াও অ-মানব প্রাণীর প্রতি তাঁর সম্মানসূচক দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করা যায়।[১৭]

বহুত্ববাদী দার্শনিক এম্পিউক্লিস (খ্রি.পূ. আনুমানিক ৪৯০-৪৩৫) এর মতবাদেও পিথাগোরীয় প্রভাব বিদ্যমান ছিল। মানুষের আকারে দেবতাদের সৃষ্টি বলে যে রক্ষণশীল ধর্মতাত্ত্বিক মত ছিল, এম্পিডক্লিস তার বিরোধিতা করেন।[১৮] তাঁর মতে, বিরুদ্ধভাবাপন্ন শক্তির প্রভাবে আত্মা তার আদিম অবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ক্রমশ জীবদেহে প্রবেশ করে। প্রথমে উদ্ভিদ, এরপর ইতর প্রাণী এবং সর্বশেষে মানুষ – এ তিনটি স্তরে আত্মার পর্যায়ক্রমিক উন্নতি ঘটে। তাঁর মতে মানুষ হল সর্বশ্রেষ্ঠ জীব। মানব পর্যায়ে বিবর্তন গতির পরিসমাপ্তি ঘটে। মানুষ হল বিশ্বপ্রকৃতির প্রতিবিম্ব। বিশ্বের

যাবতীয় গুন মানবসত্তায় কেন্দ্রীভূত। এ জন্যই বুদ্ধিবৃত্তিতে মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ জীব।[১৯] এম্পিডক্লিসের এ বক্তব্যে মানুষের মর্যাদাকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। সুতরাং তাঁর চিন্তাধারায় মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির উপস্থিতি ছিল।

উপরের আলোচনায় গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, গ্রিক দার্শনিকরা প্রাকৃতিক দর্শন বা বিশ্বতত্ত্ব নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও তাদের কারো কারো মধ্যে মানবকেন্দ্রিক চিন্তাধারার উপস্থিতি ছিল। মূলত মাইলেসীয় দার্শনিকদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল তারা মানুষ নয় বরং বিশ্বব্রহ্মান্ডের উৎপত্তির স্বরূপ ব্যাখ্যায় তৎপর ছিলেন। পরবর্তীতে সোফিস্টদের সময়ে এ দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হয়। এর ফলে মানুষের প্রয়োজন, ইচ্ছা, আদর্শ প্রভৃতি দার্শনিক চিন্তার মূল উপজীব্য হয়ে ওঠে। তাই বলা যায়, সক্রেটিসপূর্ব দার্শনিকরা কেবল বিশ্বতাত্ত্বিক প্রশ্নের উত্তরই অনুসন্ধান করেননি মানুষের আলোচনাও তাদের আগ্রহের বিষয় ছিল। F.Coplestone বলেন সোফিস্টদের সময়েই প্রথমবারের মতো দার্শনিক আলোচনার আগ্রহের বিষয় বিশ্বতত্ত্ব থেকে মানুষে স্থানান্তরিত হয়।"[২০]

প্রথম পর্বের গ্রিক দার্শনিকরা যেখানে জগতের স্বরূপ ও মৌলসত্তা নিয়ে সচেষ্ট ছিলেন, সেখানে সোফিস্টদের হাতে দর্শন সম্পর্কে পূর্ববতী ধারণার পরিবর্তন ঘটে। তাদের পূর্ববর্তী দার্শনিকরা যেখানে বহির্জগৎ নিয়ে আলোচনাকে দর্শনের কেন্দ্রবিন্দু মনে করতো সেখানে সোফিস্টরা ঘোষণা দিলেন: "জগৎ নয় মানুষ নিজেই মানুষের অনুসন্ধানের মূল লক্ষ্য ও উপজীব্য।" তারা দর্শনের ইতিহাস এমন এক গতিশীল মানবকেন্দ্রিকতাবাদের সূচনা করেন যার ফলে দার্শনিক চিন্তায় এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হলো। সোফিস্ট সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা প্রোটোগোরাস এর মতে, ব্যক্তি মানুষই সবকিছুর মাপকাঠি। সফোক্লিস বলেন, "মানুষ জগতের সর্বশ্রেষ্ট অলৌকিকতা।"[২১] এভাবে সোফিস্টরা মানুষের জন্য এই শিক্ষা রেখে যান যে, প্রকৃতি নয়, মানুষ নিজেই তার চিন্তার প্রথম ও প্রধান সমস্যা। তাদের এ ধরনের দার্শনিক চিন্তা ও আলাপ-আলোচনা মানুষকে দার্শনিক আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে আসে। মানুষ ও তার বহুবিধ সমস্যা সম্পর্কে দার্শনিকরা সে সময় যেসব প্রশ্ন তুলেছিল, সেগুলো আজকের দিনের নীতিবিদরাও নৈতিক মানদন্ডের আপেক্ষিকতা নিয়ে আলোচনা করেন। যেমন- মানবকেন্দ্রিকতাবাদ, উপযোগবাদ, প্রয়োজনবাদ, প্রত্যক্ষবাদ, অস্তিত্ববাদ প্রভৃতি সমকালীন দার্শনিক আন্দোলনে সোফিস্ট চিন্তার বীজ খুঁজে পাওয়া যায়।

সক্রেটিস (খ্রি.পূ ৪৭০-৩৯৯ খ্রি.পূর্ব) প্রথম পর্বের গ্রিক দার্শনিকদের ন্যায় জগতের মৌল সত্তার অনুসন্ধান নিয়ে তেমন আগ্রহী ছিলেন না। তিনি মনে করতেন, যে সকল প্রশ্নের কোন নিশ্চিত উত্তর এবং সমস্যার কোন চূড়ান্ত সমাধান নেই সেগুলো নিয়ে বৃথা আলোচনা না করে মানুষের জীবনের

সঙ্গে যার সম্পর্ক রয়েছে এমন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। চিন্তাশীল মানুষের প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন হল মানবজীবনের উদ্দেশ্য কী ? সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মানুষের করণীয় কী ? এ ধরণের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করা। তাঁর মতে, এ জগতে মানুষই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।[২২]

সক্রেটিসের মতে, বুদ্ধিবৃত্তি সকল মানুষের মধ্যেই বিদ্যমান। সক্রেটিস প্রকৃতিকে দেখেছেন এক উদ্দেশ্যের রাজত্ব হিসাবে। প্রকৃতির ঘটনাবলির শৃঙ্খলা ও প্রাণী জগতের গঠন ও বিন্যাসে তিনি এক বুদ্ধিমান সত্তার কথা বলেন। সক্রেটিসের এ ধরনের উদ্দেশ্যেবাদী ব্যাখ্যা থেকেও তাঁর মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠে।[২৩] তাছাড়া সক্রেটিস দেখান যে, সকল মানুষই ভালো কিছু চায়, নিজের কল্যাণ চায়। এর দ্বারা তিনি বুঝিয়েছেন মানুষের সবসময় নিজেকে নিয়ে ভাবাটা এক ধরনের স্বভাব ধর্ম।

সক্রেটিসের পরবর্তীসিনিক সম্প্রদায়ের মতানুসারী ডায়োজিনিস সমগ্র প্রাণীকুলের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছিলেন।[২৪] এ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা এরিস্টিপাস মনে করেন, চেতন প্রাণী আজীবন সুখের সন্ধানে এবং দুঃখ পরিহারে সচেষ্ট থাকে। স্বয়ং প্রকৃতির নির্দেশেই সকল প্রাণীর কাছে সুখ শুভ এবং দুঃখ অশুভ বলে প্রতীয়মান হয়। ভোগসুখই মানুষের পরম শ্রেয়। তিনি সক্রেটিস ও প্লেটো যে সার্বিকের কথা বলেছেন তার বিরোধিতা করে বলেন, বস্তুতঃ প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই একটি শ্রেণী বা জাতি এবং সে নিজেই তার যাবতীয় বিধি নিয়মের প্রণেতা।

দর্শনের ইতিহাসে বিশিষ্ট দার্শনিক প্লেটো (খ্রিঃ পূঃ ৪২৭-৩৪৭) তাঁর টাইমিয়াস (Timaeus) সংলাপে জগৎ সৃষ্টির ইতিহাস থেকে শুরু করে মানব সৃষ্টির ইতিহাস পর্যন্ত বর্ণনা করেন। তিনি টাইমিয়াস সংলাপের শেষ অনুচ্ছেদে বলেন, আমরা এখন বলতে পারি জগতের প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের আলোচনা শেষ হয়েছে। জগৎ নশ্বর ও অবিনশ্বর প্রাণী লাভ করেছে এবং জগত তাদের দ্বারা পরিপূর্ণ। দৃষ্টিগোচর প্রাণীর আবাস জগত নিজেও দৃষ্টিগোচর প্রাণীতে পরিণত হয়েছে।[২৫]

প্লেটোর টাইমিয়াস সংলাপে আরও লক্ষ্য করা যায়, তিনি পুনর্জন্মের বিভিন্ন প্রকার ধারণা আলোচনা করেন। এ বর্ণনা অনুসারে কাপুরুষ ও অধার্মিক ব্যক্তি পরবর্তী জীবনে স্ত্রীলোক হয়ে জন্মগ্রহণ করবে। যে সব মূর্খ লঘুচিত্রের মানুষ মনে করে গণিতের জ্ঞান ব্যতীত শুধু আকাশ পর্যবেক্ষণ করেই জ্যোতির্বিদ্যার জ্ঞান লাভ করা যায়, তারা পাখি হয়ে জন্মাবে। যাদের দার্শনিক জ্ঞান নেই, তারা বন্য স্থলচর প্রাণীরূপে জন্মগ্রহণ করবে। আর যারা নির্বোধ, তারা মৎস্যরূপে জন্মগ্রহণ করবে।[২৬] প্লেটোর এ

ধরনের চিন্তাভাবনা থেকে লক্ষ্য করা যায় তিনি নারীর চেয়ে পুরুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং প্রকৃতির বিভিন্ন প্রাণীকে তিনি তুচ্ছার্থে ব্যবহার করেন যা বাস্তবিদ্যক চিন্তাধারা বিবর্জিত।

গ্রিকদর্শন এর অন্যতম দিকপাল এরিস্টটল (খ্রি:পূ: ৩৮৫-৩২২) তাঁর জ্ঞানের বিশাল অংশে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান তথা বাস্তবিদ্যাসংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করেন। এসকল বিষয়ে তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। পাশ্চাত্যে অ্যারিস্টটলই প্রথম জীববিদ্যার আলোচনা করেন এবং জীববিজ্ঞানে তিনি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের চেয়ে বেশি অবদান রাখেন। ইউজিন সি. হারগ্রভ তাঁর সম্পর্কে বলেন, গ্রীক দর্শনের উল্লেখযোগ্য দার্শনিকদের মধ্যে এরিস্টটলই জগতকে বাস্তুবিদ্যাগত দৃষ্টিভঙ্গি জগতের জীবন থেকে দেখতে সচেষ্ট হয়েছেন।[২৭]অ্যারিস্টটলই প্রথম বলেছিলেন,মানুষ হচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন প্রাণী। এর মাধ্যমে তিনি মানুষকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দিয়েছেন। তিনি তাঁর 'ডি এনিমা' নামক গ্রন্থে বলেন প্রকৃতির শেষ ও চরম লক্ষ্য হল মানুষ। মানুষের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল বিচারশক্তি বা প্রজ্ঞা (reason)। এই মানবীয় প্রজ্ঞার স্তরে উন্নীত হওয়ার জন্য পুরো প্রকৃতি নিয়োজিত। অ্যারিস্টটল আত্মাকে শ্রেষ্ঠতা অনুসারে ক্রমবিন্যাস করেন যা থেকে প্রতীয়মান হয় যে মানুষ শ্রেষ্ঠ। তিনি তিন ধরনের আত্মার কথা বলেন, যেগুলো সর্বনিম্ন থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত ক্রমবিন্যস্ত হয়ে আছে। তাঁর ক্রমবিন্যাস অনুযায়ী সবচেয়ে অনুন্নত আত্মা হলো উদ্ভিদাত্মা। এর কাজ হলো কেবল আত্মতুষ্টি সাধন ও বংশবৃদ্ধি করা। তাঁর মতে, এ ধরনের আত্মা কেবল উদ্ভিদেরই নয়, প্রাণীদেরও রয়েছে। এরপরের স্তরের আত্মা হলো সংবেদনশীল আত্মা। তার মধ্যে রয়েছে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষন, বাসনা এবং স্থানীয় গতি। অ্যারিস্টটল মনে করেন, এ ধরনের আত্মা উচ্চশ্রেণীর প্রাণীর মধ্যে দেখা যায়। কেননা প্রাণীদের আত্মা সামান্য সুখ-দুঃখেই বিচলিত হয়। এরা সুখ প্রত্যাশী এবং দুঃখ বিমুখ। প্রাণীদের নিজেদের চলাফেরার উপর কোন প্রকার নিয়ন্ত্রণ নেই।[২৮]সর্বোচ্চ স্তরের আত্মা হলো প্রাজ্ঞিক আত্মা যা মানুষের মধ্যে রয়েছে। এ আত্মা প্রাণীর আত্মার চেয়ে উন্নত। মানুষের আত্মার মধ্যে সুখের প্রতি আসক্তি ও দুঃখবিমুখতা রয়েছে। কিন্তু মানুষ তার প্রজ্ঞা এবং বিচারশক্তি দ্বারা তার কর্তব্যকে নিরূপণ করে। যার কারণে মানুষ জীব জগতের শ্রেষ্ঠ বলে আখ্যায়িত।[২৯]

আরো লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, অ্যারিস্টটল প্রাণী জগতের বিভিন্ন ধাপ নির্ধারণ করেন।[৩০] এ সকল ধাপের মধ্যে মানুষের স্থান সর্বোচ্চ স্তরে রয়েছে। এরপরের স্তরে রয়েছে চতুস্পদ প্রাণী, সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী প্রাণী। তারপরের স্তরে পাখি, সরীসৃপ, উভচর, মাছ, পতঙ্গ প্রভৃতি। এরপরের স্তরে উদ্ভিদসদৃশ প্রাণী, জেলিমাছ, স্পঞ্জ প্রভৃতি। অতঃপর উচ্চ শ্রেণীর উদ্ভিদ এবং পরবর্তী স্তরে নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদ এবং সর্বনিম্ন স্তরে রয়েছে জড় পদার্থ। তাঁর এ শ্রেণীবিন্যাসতত্ত্ব পর্যালোচনা করলে

দেখা যায় যে তিনি মানবকেন্দ্রিকতাকে সমর্থন করেছেন। তাছাড়া তাঁর শ্রেণীবিন্যাসতত্ত্বে পুরুষতন্ত্র, শ্রেণীবৈষম্য, দাসপ্রথা ইত্যাদিও পরিলক্ষিত হয়। তিনি মনে করতেন জীবসত্তা একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অস্তিত্বশীল। এই উদ্দেশ্য প্রাকৃতিকভাবেই নির্ধারিত এবং জীব জগতের যে শ্রেণীবিন্যাস তাও প্রাকৃতিক। নিম্নস্তরের জীবসত্তা উচ্চস্তরের জীবসত্তার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবে।[৩১]সেই হিসেবে মানুষ যেহেতু সর্বোচ্চ স্তরে রয়েছেতাই সকল অ-মানব সত্তা ও প্রকৃতিকে মানুষ তার উদ্দেশ্যে সাধনের উপায়স্বরূপ ব্যবহার করতে পারবে।

এছাড়াও তিনি প্রকৃতি ও পরিবেশ সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করে বলেন যে, মানুষের প্রয়োজনেই জড়জগৎ এবং জীব-জগৎ এর বিবর্তন ঘটেছে। এরিস্টটলের মতে, উদ্ভিদের অস্তিত্ব মানবেতর প্রাণীর প্রয়োজনে, নির্বোধ পশুর অস্তিত্ব মানুষের প্রয়োজনে, গৃহপালিত মানবেতর প্রাণীর অস্তিত্ব মানুষের ব্যবহার ও খাদ্যের প্রয়োজনে, বন্য প্রাণীর (অথবা অধিকাংশ বন্যপ্রাণী) অস্তিত্ব মানুষের খাদ্য ও অন্যান্য সহায়ক বস্তু, পোশাক-পরিচ্ছদ ও বিভিন্ন ধরণের হাতিয়ার তৈরীর প্রয়োজনে।[৩২] যেহেতু প্রকৃতি কোনকিছুই পরিকল্পনাহীনভাবে অথবা বৃথা সৃষ্টি করে না সেহেতু এটি অবশ্যস্বীকার্য সত্য যে, প্রকৃতি সমস্ত মানবেতর প্রাণীকে মানুষের প্রয়োজন সাধনের জন্যই সৃষ্টি করেছে।[৩৩]

সুতরাং প্রাচীন যুগের পাশ্চাত্য দার্শনিকদের চিন্তাধারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিশ্বতাত্ত্বিক হলেও কিছু কিছু দার্শনিকের মধ্যে মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিও পরিলক্ষিত হয়।

২.৩.২ মধ্যযুগঃ

খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতক থেকে শুরু করে চতুর্দশ শতকের মধ্যবর্তী একহাজার বছর ইউরোপের দেশসমূহের যে দার্শনিক চিন্তার বিকাশ ঘটে দর্শনের ইতিহাসে তা মধ্যযুগীয় দর্শন নামে পরিচিত। এ যুগের দর্শন ছিল ধর্মভিত্তিক। সেন্ট টমাস একুইনাস (st. Thomas Aquinas, ১২২৫-১২৭৪) মধ্যযুগের দার্শনিকদের মধ্যে অন্যতম দার্শনিক। তিনি মনে করেন যে, কেবল মানুষেরই স্বজ্ঞা আছে। মানুষ তার স্বজ্ঞার মাধ্যমে ঈশ্বরকে জানতে পারে। তাই ঈশ্বরের পরের স্তরেই মানুষের অবস্থান। তিনি অ-মানব প্রাকৃতিক সত্তাসমূহকে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হিসাবে মনে করেন। এদিক থেকে এরিস্টটলের সাথে একুইনাসের মতের সাদৃশ্য রয়েছে। যেমন, এরিস্টটল মনে করেন ঈশ্বরের পরেই মানুষের স্থান, একুইনাসও তাই মনে করেন। এরিস্টটল মনে করেন যে স্বজ্ঞামূলক জ্ঞান সর্বোচ্চ শুভ। একুইনাসও অনুরূপ মত পোষণ করেন। তাঁরা দুজনেই মনে করেন উদ্দেশ্যবাদের গতি

ঈশ্বর থেকে মানুষের দিকে। আবার মানুষ থেকে প্রাণীজগত এর দিকে ধাবিত হয়। এ কারণে একুইনাস এরিস্টটলের নীতিবিদ্যার খ্রিষ্টীয় পূর্ণতা দিয়েছেন বলে কিছু দার্শনিক মনে করেন।[৩৪]

মানুষ ও অ-মানব প্রাকৃতিক সত্তার প্রতি একুইনাসের দৃষ্টিভঙ্গি মানবকেন্দ্রিক। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই তিনি মানুষও অ-মানব প্রাকৃতিক সত্তাকে পৃথক মনে করেন। একুইনাস তাঁর Summa Contra Gentiles এবং Summa Theologica নামক বিখ্যাত গ্রন্থদ্বয়ে এ সংক্রান্ত আলোচনা করেন। তিনি বলেন, মানুষ যেহেতু বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব সেহেতু মানুষ অন্য অ-মানব প্রাকৃতিক সত্তার উপর কর্তৃত্ব করতে পারবে । পক্ষান্তরে অ-মানব প্রাকৃতিক সত্তার মানুষের ন্যায় অনন্য গুণাবলি না থাকার কারণে তাদের নিজের কাজের উপর নিজের কোন প্রভূত্ব নেই। তাই এ সকল সত্তা বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন প্রাণীর উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য সাধনের উপায় স্বরূপ ব্যবহৃত হবে।[৩৫] এ প্রসঙ্গে একুইনাস বাইবেলের উদ্বৃতি দেন। বাইবেলে বলা হয়েছে– "প্রত্যেক গমনশীল প্রাণী তোমাদের খাদ্য হইবে, আমি হরিৎ ওষধির ন্যায় সে সকল তোমাদিগকে দিলাম।"[৩৬]

একুইনাস মনে করেন যে পশুহত্যা কোন অন্যায় নয়। কেননা ঈশ্বর এদেরকে মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং ঈশ্বরের নির্দেশ অনুযায়ী অ-মানব প্রাকৃতিক সত্তাকে ধ্বংস করা যাবে। তিনি তিন ধরনের পাপের কথা বলেন– ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ, নিজের বিরুদ্ধে পাপ, প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে পাপ। লক্ষ্য করলে দেখা যায়, তিনি অ-মানব প্রাকৃতিক সত্তাকে ধ্বংস বা অন্যায় করাকে পাপ বলে বিবেচনাই করেন নি।[৩৭] মূলত পশুহত্যা বা অ-মানব প্রাণীর প্রতি অন্যায় করা তাঁর নৈতিক জগতে ছিলই না। কেননা তিনি জানতেন যে, মানুষ পশুহত্যা ছাড়াও জীবনধারণ করতে পারে। তাঁর সময়ে একটি ম্যানিচিস নামক সম্প্রদায় ছিল যারা পশুহত্যা নিষিদ্ধ করেছিল। তা সত্ত্বেও তিনি অ-মানব প্রাণীকে মানুষের ব্যবহারের সামগ্রী হিসেবে মনে করতেন। তিনি তাঁর Summa Theologica গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে বলেন, একটি তুর্কি মোরগ ক্ষুধার্ত বলে আমরা মোরগটাকে ভালবেসে খাবার দিতে পারি না। বরং যদি আমরা মোরগটিকে কারও বড়দিনের নৈশভোজের জন্য বিবেচনা করি তবেই খাবার দিতে পারি।[৩৮]একুইনাস মনে করেন যে, মানুষের জীবনই কেবল স্বকীয় মূল্যে মূল্যবান। পশুপাখি, উদ্ভিদ ইত্যাদির মূল্য হচ্ছে ব্যবহারিক মূল্যে মূল্যবান। তারা কেবল মানুষের ভোগের জন্যই মূল্যায়িত হবে। তিনি পশুহত্যাকে অন্যায় বলেননি তবে পশুপাখি হত্যা বা বনাঞ্চল ধ্বংস যদি মানুষের প্রয়োজনকে ক্ষুন্ন করে, মানুষের জীবনকে বিপন্ন করে তবে সেসব অন্যায় ও অনুচিত কাজ হবে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত অধিকাংশ খ্রিষ্টানরা উপরোক্ত নির্দেশগুলোকে সমর্থন করতো। তবে তারা প্রয়োজনবোধে বৃক্ষছেদন ও অ-মানব প্রাণী হত্যাকে সমর্থন করলেও নির্বিচারে বৃক্ষছেদন ও অ-মানব প্রাণী হত্যাকে সমর্থন করেনা। তারা মনে করতেন যে, মানুষের প্রয়োজনেই প্রকৃতি এবং বিপুল সম্পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই মানুষের উচিত এগুলোর এমন সদ্ব্যবহার করা যাতে করে এ সকল অ-মানব প্রাকৃতিক সত্তাসমূহ বিপন্ন না হয়। খ্রিষ্টধর্মালম্বীরা পরিবেশের সুরক্ষাকে মূল্যহীন মনে করেন না। তারা স্পষ্টতঃ মানবকেন্দ্রিকতাবাদী আর সেজন্যই মানুষের জীবনকে রক্ষার জন্য অ-মানব প্রাকৃতিক সত্তাসমূহকে সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন।

২.৩.৩ আধুনিক যুগঃ

ফরাসী দার্শনিক রেনে ডেকার্টে (Rene Descarte,১৫৯৬-১৬৫০) প্রাণীজগৎ সম্পর্কে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন। তিনি তাঁর Discourse on Method এবং Marquess of Newcastle এর নিকট লিখিত পত্রে প্রাণীজগৎ নিয়ে আলোচনা করেন। প্রাণীকূলকে তিনি মানুষের উদ্দেশ্য অর্জনের উপায়স্বরূপ বর্ণনা করেন।[৩৯] তাঁর মতে মানুষ যেহেতু চিন্তাশক্তিসম্পন্ন জীব তাই নির্দ্বিধায় নিজের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রকৃতিকে ব্যবহার করতে পারবে। তবে কোন কোন প্রাণী মানুষের চেয়ে শক্তিশালী এবং চালাক। এক্ষেত্রে ডেকার্টে বলেন যেসকল কাজ মানুষ চিন্তাহীনভাবে সম্পন্ন করে কেবল সেকল কাজকেই তারা অনুকরণ করতে পারে বা ছাড়িয়ে যেতে পারে। আবার দেখা যায় যে, অ-মানব প্রাণীরা মানুষের চেয়ে দক্ষতার সাথে কাজ করতে পারে। ডেকার্টের মতে এ দক্ষতা যন্ত্রের ন্যায়। একটি ঘড়ি যেমন করে সময় দেয় তেমন করে অ-মানব প্রাণীরা প্রাকৃতিকভাবে এবং যান্ত্রিকভাবে কাজ করে। তিনি আরও বলেন মানুষের ন্যায় প্রাণীর মধ্যে আত্মা বা মন নেই। এজন্যই মানুষ অন্যসব অ-মানব প্রাণীর উপর কর্তৃত্ব করতে পারে। অ-মানব প্রাকৃতিক সত্তাকে যন্ত্র হিসাবে গণ্য করার কারণে ডেকার্টের দর্শনকে শিল্প বিপ্লবের সনদ বলে মনে করা হয়।[৪০]কেননা সমগ্র অ-মানব প্রাকৃতিক সত্তাকে যন্ত্র এবং মানুষ ব্যতীত প্রকৃতির সব কিছুকে শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে গণ্য করা শিল্পবিপ্লবের জন্য আবশ্যক ছিল। ডেকার্টের দর্শন এক্ষেত্রে উৎসাহ যুগিয়েছে। আমেরিকান অর্থনীতিবিদ এইচ. সি. ক্যারে (H.C. Carey) বলেন, "পৃথিবী একটি যন্ত্র এবং এ যন্ত্রটি মানুষকে তার উদ্দেশ্য পুরণের জন্যই তৈরি করা হয়েছে।[৪১] ডেকার্টের চিন্তাধারায় গ্রিক খ্রিষ্টীয় ঐতিহ্যের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কেননা খ্রিষ্টীয় ঐতিহ্যে মানুষকে প্রকৃতির প্রভু হিসেবে গণ্য করে। আবার গ্রিক ঐতিহ্য মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে গুরুত্ব দিয়েছে। গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, ডেকার্টে বুদ্ধিবৃত্তির প্রাধান্য দিয়েই মানুষকে প্রকৃতির প্রভু হিসেবে আখ্যায়িত করেন। ফলে ইউরোপে প্রকৃতির

উপর মানুষের কর্তৃত্বের ধারণা বিদ্যমান থাকে এমনকি চীনেও তা বিস্তৃতি লাভ করে। মূলত ডেকার্টের এই ধারণা ছিল মানবকেন্দ্রিকতাবাদী।

বৃটিশ অভিজ্ঞাতাবাদী দার্শনিক জন লক (John Locke,১৬৩২-১৭০৪) এর রাষ্ট্রদর্শনে বুদ্ধিবাদী জ্ঞানবিদ্যা ও আত্মবাদী নীতিবিদ্যা মানুষকে প্রকৃতির প্রভু হিসেবে মনে করেন। লকের মতে, 'প্রকৃতির রাজ্য' ছিল পরম সুখকর এবং মনোরম। প্রাকৃতিক অবস্থায় মানুষের জীবন ছিল মুক্ত এবং স্বাধীন। প্রশ্ন ওঠে যে, প্রকৃতির রাজ্য এমন শান্তিময় হলে এবং ব্যক্তির অধিকার এত নিরাপদ থাকলে সাধারণ মানুষ প্রকৃতির রাজ্য পরিত্যাগ করে রাজনৈতিক সমাজ গঠনে উদ্যেগী হলো কেন? এ প্রসঙ্গে লক বলেন যে, ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষের মনে এমন কতগুলো প্রবণতা সংযোগ করেছেন যার ফলে মানুষ একাকী থাকতে পারে না। সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করার জন্য যা প্রয়োজন, সে অনুযায়ী এবং সে পরিমাণ বুদ্ধিবৃত্তি ও ভাষা দিয়ে ঈশ্বর মানুষকে সুসজ্জিত করে তৈরী করেছেন। তিনি বলেন যে, মানবিক অধিকার বা কর্তব্যের উদ্ভব হয় প্রাকৃতিক বিধানথেকে। প্রাকৃতিক বিধান থেকে মানুষ তার অধিকার লাভ করে। প্রাকৃতিক অধিকারসমূহ মানুষের এক চিরন্তন ও সহজাত অধিকার। এদের মধ্যে তিনটি অধিকারের কথা জন লক উল্লেখ করেন, এগুলো হলো জীবনের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার এবং সম্পত্তির অধিকার। লকের সম্পত্তি তত্ত্বে তিনি প্রকৃতির প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেন।[৪২]সম্পত্তি সম্পর্কে লকের মতবাদ মূলত তাকে একজন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী হিসেবে চিহ্নিত করেছে। তাঁর মতে প্রকৃতির রাজ্যে সম্পত্তির উদ্ভব হয়। সৃষ্টিকর্তা আপন প্রতিচ্ছবিতে মানুষ সৃষ্টি করেন এবং এটি তিনি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য করেন । তাই প্রকৃতির রাজ্যে প্রাকৃতিক বিধান মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করত। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের লক্ষ্য ছিল সমগ্র মানব জাতির সংরক্ষণ এবং তাদের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। এজন্য ঈশ্বর মানুষের জীবন রক্ষা ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য সকল মানুষকে পৃথিবীর সম্পদরাজি উপভোগ করতে দিয়েছেন। পৃথিবীর সম্পদ সীমিত, অপরদিকে মানুষ কর্মক্ষম এবং বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন জীব। তাই মানুষ তার প্রচেষ্টা ও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে সীমিত উৎপাদনকে আরও বৃদ্ধি করতে পারে।

লক বলেন, পৃথিবী ও পৃথিবীর মধ্যে আর যা কিছু আছে তার সবই মানুষের পরিপোষণ ও আয়েশের জন্য দেওয়া হয়েছে।[৪৩] তাঁর মতে, প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন: ফল-ফলাদি, ও জীবজন্তুর উপর সকল মানুষের অধিকার রয়েছে। তবে দৈহিক পরিশ্রম, মানসিক তৎপরতা মানুষের একান্তভাবে নিজস্ব। এ নিজস্ব সহযোগে যা উৎপন্ন তা ব্যক্তির নিজস্ব সম্পদ। তবে লক কোন ব্যক্তিকর্তৃক সীমাহীন সম্পত্তি অর্জনের পক্ষপাতী ছিলেন না। ফল-মূল-শস্য কুড়ানো যদি যুক্তিযুক্ত হয় তাহলে যে কেউ যেকোন

পরিমান সম্পত্তির অধিকারী হতে পারে। লক এর উত্তরে বলেন তা যথার্থ নয়। কেননা যে প্রাকৃতিক বিধান সম্পত্তির অধিকার সৃষ্টি করেছে, তা আবার সম্পত্তির সীমারেখাও নির্ধারণ করেছে। ঈশ্বর পৃথিবীর সকল সম্পদ শান্তি এবং সংরক্ষণের জন্য সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং ঈশ্বরের সৃষ্টি মানুষ উপভোগের জন্য সম্পত্তি লাভ করবে, তা বিনষ্ট করার জন্য নয়।[৪৪]এথেকে বুঝা যায় যে, লকের দৃষ্টিভঙ্গি মানবকেন্দ্রিক এবং তিনি প্রকৃতি সুরক্ষার মাধ্যমে মানুষের স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন।

জার্মান দার্শনিক ইম্যানুয়েল কান্ট (Immanuel Kant,১৭২৪-১৮০৪) মনে করেন যে, মানুষের বোধজগতই নৈতিকতার উৎসস্থল।[৪৫] মানুষ একমাত্র বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব হওয়ার কারণে নৈতিক নিয়ম তৈরী করতে পারে। আর সেজন্যই মানুষ নৈতিক নিয়ম তৈরি করে। তাই প্রকৃতির সকল বস্তুই সে নিয়ম মেনে চলে।

কান্ট নৈতিকতার প্রয়োগের ক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন সত্তার জগতেই সীমাবদ্ধ ছিলেন। তিনি মনে করেন যে, যেসব সম্প্রদায়ের বুদ্ধিবৃত্তি রয়েছে কেবল তার উপরই নৈতিকতা আরোপ করা যাবে। এটি তাঁর শর্তহীন আদেশের দ্বিতীয় আকারে খুঁজে পাওয়া যায়। সেখানে তিনি বলেন, মানুষকে সর্বদা উদ্দেশ্য হিসাবে গণ্য করে কাজ করো, কখনোই উপায় হিসেবে গণ্য করো না, তা সে মানুষ তুমি নিজে হও বা অন্য কেউ হোক।[৪৬]

তাছাড়া তিনি লক্ষ্য রাজ্যের ধারণা দিতে গিয়েও একই কথা বলেন। তিনি তাঁর শর্তহীন আদেশের তৃতীয় সূত্র, যা স্ব-নিয়ন্ত্রণের সূত্র (formula of autonomy) নামে পরিচিত, সেখানে বুদ্ধিবৃত্তিক প্রাণীর নিঃশর্ত মূল্যের ভিত্তিকে নির্দিষ্ট করে দেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, প্রতিটি বুদ্ধিবৃত্তিক সত্তার ইচ্ছার ধারণা হলো সর্বজনীন নিয়ম বা আইন প্রদানের ইচ্ছা। তিনি মনে করেন, জড়বস্তু সম্পূর্ণরূপে মানুষের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। অ-মানব প্রাকৃতিক সত্তার প্রতি কর্তব্য পালন কেবল আমাদের প্রতি আমাদের কর্তব্য পালনের দৃষ্টিকোণ থেকে নির্ধারিত হয়। কান্ট বলেন, প্রাণীদের প্রতি আমাদের প্রত্যক্ষ কোনো কর্তব্য নেই। প্রাণীরা আত্মসচেতন নয়। তারা উদ্দেশ্য সাধনের উপায় মাত্র। অ-মানব প্রাণীদের প্রতি আমাদের কর্তব্য সম্পাদনের অর্থ হলো মানুষের প্রতি পরোক্ষভাবে আমাদের কর্তব্য সম্পাদন করা।[৪৭]

এক্ষেত্রে কান্ট উদাহরণ দিয়ে বলেন যে, কোন ব্যক্তি তার পোষা কুকুরকে গুলি করে হত্যা করতে পারে যদি কুকুরটি তাকে সেবা দিতে অক্ষম হয় এবং এ কাজটি অন্যায় বা অনৈতিক বলে বিবেচিত হবে না। এছাড়া তিনি বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে প্রাণী ব্যবহারকে বৈধ বলেছেন। কারণ তা মানুষের

প্রয়োজনেই করা হয়। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, জীবব্যবচ্ছেদবাদীরা যখন পরীক্ষার জন্য জীবন্ত প্রাণীদের ব্যবহার করেন তখন তারা প্রাণীদের উপর নিঃসন্দেহে নিষ্ঠুর আচরণ করেন। কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য প্রশংসনীয়। যেহেতু জীবব্যবচ্ছেদবাদীগণ প্রাণীকে মানুষের উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হিসেবে গণ্য করে থাকেন সেহেতু প্রাণীদের উপর সংঘটিত নিষ্ঠুরতার যথার্থতাকে প্রতিপাদন করতে পারেন। কিন্তু বিনোদনের জন্য এ ধরণের নিষ্ঠুর কাজের যথার্থতা প্রতিপাদন করা যাবে না।[৪৮]

কান্টের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বুঝা যায় যে, তিনি প্রাণিজগৎ, উদ্ভিদজগৎ এবং অচেতন সত্তার জগতের নৈতিক মূল্যকে মানুষের প্রয়োজনের মাপকাঠিতে নির্ধারণ করেন। তিনি বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন সত্তা হিসাবে মানুষকে প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব করার উৎসাহ দেন। তবে তিনি অকারণে অ-মানব সত্তার সাথে নিষ্ঠুর আচরণকে অনুমোদন দেন না। এর থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কান্টের দর্শনে মানবকেন্দ্রিকতাবাদের প্রাধান্য পেয়েছে। কেননা তিনি অ-মানব প্রাণীর উপর নিষ্ঠুর কাজের অনুমোদন দেন না একারণে যে এতে করে মানুষেরই ক্ষতি হবে।

আধুনিক যুগের অধিকাংশ দার্শনিক কেবল মানুষকে তার বুদ্ধিবৃত্তির কারণে নৈতিক বিবেচনাধীন মনে করে। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, আঠার শতকের শেষার্ধে এবং উনিশ শতকের প্রথমার্ধে মাত্র একজন পাশ্চাত্য দার্শনিক অ-মানব প্রাণীকেও নৈতিক বিবেচনার অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি হলেন উপযোগবাদী দার্শনিক জেরেমি বেনথাম (Jeremy Bentham,১৭৪৮-১৮৩২) । এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, যুক্তিবুদ্ধি থাকা বা কথা বলতে পারা কি নৈতিক বিবেচনার মানদন্ড? একটি পূর্ণবয়স্ক ঘোড়া বা কুকুর, একদিন বা এক সপ্তাহ এমনকি এক মাস বয়সী একটি মানবশিশুর চেয়ে বেশি বুদ্ধিসম্পন্ন বা ভাববিনিময়ে সক্ষম। কিন্তু এদেরকে (পূর্ণবয়স্ক ঘোড়া বা কুকুরকে) অন্যভাবে দেখা হয়। এভাবে দেখার কি কোন যৌক্তিকতা আছে?[৪৯]

মূলতঃ বেন্থাম বুদ্ধিবৃত্তি বা ভাষা ব্যবহারের ক্ষমতাকে নৈতিক বিবেচনার মানদন্ড হিসেবে গ্রহণ না করে অনুভূতিশীলতাকে নৈতিক বিবেচনার মানদন্ড হিসেবে গ্রহণ করেন।

উপর্যুক্ত আলোচনায় আমরা পাশ্চাত্য দর্শনের প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের বিশিষ্ট দার্শনিকদের পরিবেশ বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি। পাশ্চাত্য সভ্যতার হাজার হাজার বছরের ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় এই সভ্যতা পরিবেশের প্রতি কম মনোযোগী ছিল। টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক ও পরিবেশ দার্শনিক ইউজিন সি. হারগ্রভ তাঁর ‘Foundations of Environmental Ethics’ গ্রন্থে বলেন, “পাশ্চাত্য দর্শনের তিন হাজারের

বেশি বছরের ঐতিহ্যকে পর্যবেক্ষণ করলে এতে বাস্তুবিদ্যাগত দৃষ্টিভঙ্গির অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এ সময়ের দার্শনিক আলোচনা পরিবেশবিষয়ক চিন্তা-ভাবনাকে হয় প্রাসঙ্গিক নতুবা অসঙ্গত বলে বিবেচনা করছে।" গভীরভাবে লক্ষ্য করলে প্রতীয়মান হয় যে, অধিকাংশ দার্শনিকই মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি, চিন্তনক্ষমতা এবং ভাষার ব্যবহারের ক্ষমতাকে নৈতিকতার মানদন্ড হিসাবে বিবেচনা করেছেন। এক্ষেত্রে দেখা যায় অ-মানব প্রাকৃতিক সত্তাসমূহ মানুষের ব্যবহারের জন্যই সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করেন। এ ধরণের দৃষ্টিভঙ্গি নিঃসন্দেহে মানবকেন্দ্রিক। তাদের কিছু কিছু মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবেশ সুরক্ষার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকাও পালন করে। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে প্রাপ্ত শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টির পরিবর্তে পরিবেশকে ব্যবহার করার দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয়। ধারণা করা হয় পরিবেশের প্রতি পাশ্চাত্য মানুষের বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গি মূলত পাশ্চাত্য দার্শনিক ঐতিহ্য থেকে উৎসারিত।

২.৪ মানবকেন্দ্রিকতাবাদের প্রকারভেদঃ

মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকৃতির উপর মানুষের আধিপত্য, শোষণ এবং ভোগের অনুমতি দেয় এবং মনে করে যে, এটি কেবল বাস্তব অর্জন নয় বরং সভ্যতার জন্যও আবশ্যক। তারা তাদের এ ধরণের অবস্থানকে মানুষের কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে ন্যায়সঙ্গত করার চেষ্টা করে। উদাহরণস্বরূপ তারা যুক্তি দেয় যে, মানুষের লক্ষ্য, আশা-আকাঙ্ক্ষা, সচেতনতা, যুক্তির ক্ষমতা, যোগযোগের দক্ষতা, ভাষার ব্যবহার ইত্যাদি রয়েছে। অপরদিকে অ-মানব প্রাকৃতিক সত্তা এ ধরণের বৈশিষ্ট্যগুলো প্রকাশে অক্ষম তাই তারা নৈতিক বিবেচনাধীন নয়। এক্ষেত্রে দেখা যায় পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে বিশিষ্ট চিন্তাবিদগণ যেমন- রেনে ডেকার্টে এবং ইমান্যুয়েল কান্ট মানুষের মর্যাদাকে সমর্থন করেন এবং একইভাবে অ-মানব প্রাণীকে মানুষের অধীনস্ত করেন।[৫০]

কিন্তু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, মানবকেন্দ্রিকতাবাদের এ যুক্তিকে সমসাময়িক দার্শনিকরা আরও এগিয়ে নিয়ে গেছেন। এদের মধ্যে অন্যতম হলেন- ব্রায়ান নরটন, ইউজিন সি. হারগ্রভ, হেওয়ার্ড প্রমুখ।

জর্জিয়ার ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির অধ্যাপকব্রায়ান নরটন এর রচিত গ্রন্থগুলো হল:The Preservation of Species, Why Preserve Natural Diversity?, Toward Unity among Environmentalists and Ecosystem Health: New Goals for Environmental Managementপ্রভৃতি। এ সকল গ্রন্থে তিনিএকজন মানবকেন্দ্রিকতাবাদী

দার্শনিক হিসেবে পরিবেশসংক্রান্ত নানাদিক তুলে ধরেন ও তাঁর চিন্তাধারাকে বিকশিত করেন। এক্ষেত্রে তিনি বলেন:-

Moralists among environmental ethicists have erred in looking for a value in living things that is independent of human valuing. They have therefore forgetten a most elementary point about valuing anything. Valuing always occurs from the viewpoint of a concious valuer ... only the humans are valuing agents.[৫১]

অর্থাৎ নরটন বলতে চেয়েছেন যে, পরিবেশ নীতিবিদদের মধ্যে কিছু নীতিবিদ মানব নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র মূল্য খুঁজে ভুল করেছে। তারা ভুলে গেছে যে মূল্য সবসময় সচেতন মূল্যায়নকারীর দৃষ্টিকোণ থেকেই সংঘটিত হয়। আর এক্ষেত্রে মানুষই একমাত্র প্রতিনিধি।

এ ধরণের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী পরিবেশগত মূল্য মানুষের ক্রিয়াকলাপ এবং যুক্তিসঙ্গত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের বিষয় হিসাবে বিবেচিত হয়। প্রাকৃতিক পরিবেশ মানুষ থেকে একেবারে পৃথক সত্তা হিসেবে বিবেচিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষের মূল্য পরিবেশ থেকে উৎসারিত কারণ তারা পরিবেশের উপর নির্ভর করে। নরটন মানবকেন্দ্রিকতাবাদকে দুভাগে ভাগ করেন।[৫২] এগুলো হল:

১. সবল মানবকেন্দ্রিকতাবাদ ; ও

(Strong Anthropocentrism)

2. দুর্বল মানবকেন্দ্রিকতাবাদ ।

(Weak Anthropocentrism)

নিম্নে মানবকেন্দ্রিকতাবাদের এই দুই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করা হলো:

২.৪.১ সবল মানবকেন্দ্রিকতাবাদ:

সবল মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকৃতির প্রতি মানুষের আধিপত্য, শোষণ এবং ভোগের অনুমতি দেয়। এ মতবাদ অনুসারে, মানুষ হল সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দু, মানুষই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ ইত্যাদি। সুতরাং বলা যায়, যে মতবাদ বিশ্বজগতেমানুষকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করে এবং জগতের অন্যসকল অ-মানব প্রাকৃতিক সত্তাসমূহকে মানুষের জন্য সৃষ্টি হয়েছে বলে বিশ্বাস করে সে মতবাদই সবল মানবকেন্দ্রিকতাবাদ। মূলতঃ সবল মানবকেন্দ্রিকতাবাদ দাবি করে যে, মানুষ হল একচেটিয়াভাবে স্বতঃমূল্যের অধিকারী এবং কেবল তারাই নৈতিকভাবে বিবেচনাযোগ্য। এ মতানুসারে, নীতিবিদ্যায় অ-মানব সত্তার স্বার্থকে মোটেই গ্রহণ করা উচিত নয় এবং যেকোন

শোষণমূলক, কর্তৃত্বমূলক এবং ভোগমূলক দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে নৈতিক বিবেচনার প্রয়োজন নেই। ইমান্যুয়েল কান্ট বিশ্বাস করতেন যে, কেবল মানুষ বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব হওয়ার কারণে নৈতিক বিবেচনাধীন। তাঁর মতে, কেবল যুক্তিবাদী সত্তাই যৌক্তিক বিশ্বে অবদান রাখতে পারে সেজন্য তারা নৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। আর যুক্তিহীন সত্তাকে যৌক্তিক বিশ্বে কেবল কোনো কিছু অর্জনের জন্য বা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যবহার করা হবে। তাই অ-মানব সত্তার প্রতি আমাদের কোন দায়িত্ব নেই। কান্ট এর মতে, প্রাণী সম্পর্কিত বিষয়ে আমাদের কোন প্রত্যক্ষ কর্তব্য নেই। প্রাণী আত্ম-সচেতন নয় এবং তারা কেবল উদ্দেশ্য অর্জনের উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হয়। প্রাণীদের প্রতি আমাদের কর্তব্য হলো পরোক্ষ কর্তব্য যা মূলত মানুষের জন্যই ... মানুষ প্রাণীর প্রতি দয়ালু হবে এ কারণে যে সে যদি প্রাণীর প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করে তাহলে সে মানুষের সাথেও অনুরূপ আচরণ করবে।[৫৩] এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, অ-মানব প্রাণী স্বতঃমূল্যে মূল্যবান নয় বরং মানুষের উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হিসাবেই এদের মূল্য নির্ধারিত হবে। তাঁর এ ধরণের দৃষ্টিভঙ্গি সবল মানবকেন্দ্রিকতাবাকে উৎসাহিত করে।

নরটন এর মতে, সবল মানবকেন্দ্রিকতাবাদ হল যা মানুষের ইচ্ছার অনুভূতির পছন্দের অগ্রাধিকার দ্বারা পরিচালিত হয়ে সাময়িক সন্তুষ্টি বিধান করে।[৫৪] অর্থাৎ মানুষ যদি তার অনুভবের অগ্রাধিকার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পছন্দকে গুরুত্ব দেয় তাহলে তা প্রকৃতিকে শোষণমূলকভাবে ব্যবহার করতে নির্দেশ দেয়। সুতরাং দেখা যায় যে, তারা প্রকৃতিকে গুদামঘরের কাঁচামালের মতো ব্যবহার করে। মূলতঃ সবল মানবকেন্দ্রিকতাবাদীরা প্রকৃতিকে স্বেচ্ছাচারীভাবে ব্যবহারের অনুমতি দেয়। ফলে পরিবেশ সুরক্ষার বদৌলতে ধ্বংসের কারণে পরিণত হয়। তারা অ-মানব প্রাকৃতিক বিষয়সমূহ যে পরিমাণে নিজেদেরস্বার্থ সংরক্ষণে কাজে লাগে সে পরিমাণেই মূল্যবান মনে করে। এদের দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটা প্রভূত্ববাদের স্বরূপ। প্রভূত্ববাদ অনুসারে পৃথিবীর অ-মানব উপাদান মানুষের উপকার সাধনের জন্য অস্তিত্বশীল। এগুলো কেবল মানুষের স্বার্থ পরিপূর্ণের কাজে ব্যবহার করা হবে। সুতরাং মানুষ তার ইচ্ছানুসারে জগতের সকল কিছু ব্যবহার করতে পারবে।

আমরা এই অধ্যায়ের শুরুতেই কাকাডু পার্কের যে উদাহরণ দিয়েছি সেখানে যে দল পার্কটির নন্দনতাত্ত্বিক সৌন্দর্য, বাস্তুবিদ্যাগত তাৎপর্য, আধ্যাত্মিক মূল্যকে গুরুত্ব না দিয়ে কেবল অর্থনৈতিক দিকটিকে সমর্থন করে এবং অ-মানব প্রাকৃতিক সত্তাসমূহের ভালোমন্দকে নৈতিকতার মানদন্ড হিসাবে নির্ধারণ করে না তারা সবল মানবকেন্দ্রিকতাবাদী। আলোচনার সুবিধার্থে আমরা আরেকটি উদাহরণ সংযুক্ত করবো।[৫৫]

যেমন, কয়েকশত বছর ধরে গাড় বাদামীর সাথে সাদা রেখাবিশিষ্ট সুদর্শন পেঁচা প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তর পশ্চিমের একটি খুব পুরাতন বনভূমিতে বসবাস করতো। প্রায় দু'শত বছরের পুরনো এ বনাঞ্চলের গহীনের ছাউনিগুলোর নীচে ক্ষয়িষ্ণু কাঠের দ্বারা সৃষ্ট বড় বড় গাছ এবং পুরনো কান্ডের গহ্বরে এরা বাসা বেঁধে থাকত। এই বন উঁচু দেবদারু, বিষলতা এবং স্প্রুস জাতীয় বৃক্ষ দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল যা উক্ত পেঁচার আবাসস্থল হিসাবে ব্যবহৃত হতো। কিন্তু এই গাছগুলো থেকে প্রাপ্ত বড় বড় লগিং (মোটা মোটা খন্ডে কাটা কাঠ) বহু মিলিয়ন ডলারে বিক্রি করা যায়। অর্থাৎ উক্ত বনাঞ্চলটি কাঠশিল্পের একটি প্রাথমিক উৎস হিসেবে দাঁড়িয়েছে । ফলে প্রায় দেড়শো বছর ধরে ভারী লগিংয়ের ফলস্বরূপ এই প্রাচীন বনগুলি বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। কেবলমাত্র ১০% বনভূমি এখনও টিকে আছে যদিও সেগুলোও বিভিন্ন সংঘের মালিকানাধীন। ফলে দেখা যায় দিন দিন বন যেমন হ্রাস পাচ্ছে তেমনি পেঁচার সংখ্যাও কমে যাচ্ছে। জীববিজ্ঞানীরা অনুমান করছেন যে, বর্তমানে প্রায় দুই হাজার জোড়া বেঁচে আছে।[৫৬]

যা হোক, ১৯৮৬ সালে একদল পরিবেশবাদী আমেরিকান ফিশ অ্যান্ড ওয়াইল্ড লাইফ সার্ভিসকে পেঁচাটিকে 'বিপন্ন প্রজাতি' হিসেবে তালিকাভুক্ত করার জন্য আবেদন করেন।[৫৭]এ আবেদনের কারণ হলো এতে করে কাঠশিল্পকে উক্ত বনাঞ্চল সাফ করা থেকে বিরত থাকতে বলা হবে। ১৯৯০ সালে সরকার, পরিবেশবিদ এবং কাঠশিল্পের মধ্যে কয়েক বছর ধরে আলোচনার পরে এবং মামলা-মোকাদ্দমার পরে উক্ত পেঁচাকে বিপন্নপ্রায় প্রজাতি হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল। এ বিধানে বলা হয় কাঠ সংস্থাগুলিকে যে কোন রেখাবিশিষ্ট পেঁচার বাসা বা ক্রিয়াকলাপের আশেপাশে ১.৩ মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে কমপক্ষে ৪০% পুরানো বনাঞ্চল অবিচ্ছিন্ন রেখে দিতে হবে।[৫৮] কিন্তু কাঠশিল্প মালিকরা এ বিধানের তীব্র বিরোধিতা করেন। শিল্প প্রতিনিধিরা দাবি করেছেন যে, এই পদক্ষেপের ফলে উত্তর-পশ্চিমের হাজার হাজার কাঠশিল্প মালিক, মিল শ্রমিকরা বেকার হয়ে পড়বে এবং দেশ অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। অন্যদিকে একধরনের পরিবেশবিদরা যুক্তি দেখান যে, পেঁচাটি বিরল প্রজাতি এবং এটি যে প্রান্তরে বসবাস করে তা সংরক্ষণ করার ক্ষেত্রে সমাজের একটি মৌলিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

পরবর্তীতে উক্ত পেঁচার বিতর্কের সাথে সাথে ডলফিন, তিমি, শামুক এবং মরুভূমির কচ্ছপ নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। প্রতিটি বিলুপ্তপ্রায় প্রাণীকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে সমাজের বাধ্যবাধকতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। দাগযুক্ত পেঁচার ক্ষেত্রে নৈতিক প্রশ্ন দাঁড়ায় বিপন্ন প্রজাতি হিসেবে তাদের সংরক্ষণকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে নাকি অর্থনৈতিক দিকটি বিবেচনা আনা উচিত।

উপরোক্ত উদাহরণে বনাঞ্চল থেকে কাঠ সংগ্রহ করার পক্ষপাতিত্ব যারা করবেন তারাই সবল মানবকেন্দ্রিকতাবাদী। কেননা কাঠমালিকরা ধরে রেখেছেন যে, দাগযুক্ত পেঁচা সংরক্ষণে যে সুবিধা রয়েছে তা থেকে মানুষের যে ক্ষতি হবে তার তুলনায় নগণ্য। এই প্রাচীন বনাঞ্চল ব্যবহার কমিয়ে দিলে আমেরিকানরা ক্ষতিগ্রস্থ হবে এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় উত্তর-পশ্চিমের সম্প্রদায়ের জন্য তা ধ্বংসাত্মক হবে। তাছাড়া এই বনগুলি উত্তর-পশ্চিমের কাঠশিল্প কারখানার কাঠের প্রাথমিক উৎস। অনেকগুলি বড় বড় কারখানা এই বনভূমির বড় বড় গাছের উপর নির্ভরশীল কেননা তাদের সরঞ্জামগুলি কেবল বড় মাপের গাছগুলোর উপর প্রয়োগ করা যায়। তাছাড়া উক্ত বনভূমি ব্যবহার করতে না দিলে অনেক মানুষ চাকরি হারাতে পারে। যার ফলে দেশীয় বিরোধ, বিবাহবিচ্ছেদ, সহিংসতা, অপরাধ, ভাঙচুর, আত্মহত্যা, মদ্যপান ও অন্যান্য সমস্যার হার বেড়ে যাবে। দেশব্যাপী কাঠের পণ্যগুলির মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাবে। তাছাড়া যেসকল দেশের কাঠের স্বল্পতা রয়েছে যেমন- জাপান, যারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাঠের উপর নির্ভরশীল তারা ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

তাছাড়া কাঠশিল্প কর্মকর্তারা বলেন যে, যদি বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে তাদের প্রয়োজনীয় কাঠ এবং কাগজের পণ্য সরবরাহ করতে হয় তবে পুরনো গাছগুলো কাটা অপরিহার্য। কেননা পুরাতন গাছগুলো তাদের পরিপক্কতায় পৌঁছে যাওয়ার ফলে তাদের বেশিরভাগ শক্তি কেবল নিজেদের রক্ষণাবেক্ষণে ব্যয় করতে হয়। ফলে তাদের আর কোন নতুন বৃদ্ধি হয় না। তাই এই স্থির অরণ্যগুলিকে কেটে সেখানে নতুন গাছ প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে সমাজের জন্য আরও পর্যাপ্ত কাঠের সু-ব্যবস্থা করা যাবে।

এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে,সবল মানবকেন্দ্রিতাবাদ অনুসারে কেবল মানুষই মূল্যবান, অ-মানব সত্তা তথা প্রাকৃতিক জগৎ এবং সত্তাসমূহ স্বতঃমূল্যে মূল্যবান নয়, এরা ব্যবহারিক মূল্যে মূল্যবান।

Eric Katzও মানবকেন্দ্রিকতাবাদের যে সংজ্ঞা দেন তা মূলত সবল মানবকেন্দ্রিকতাবাদের অনুরূপ। তাঁর মতে, মানবকেন্দ্রিকতাবাদ হল মানুষের চাহিদা, ভোগ, অথবা মানুষের মূল্যই হল পরিবেশভিত্তিক নীতিমালার নৈতিক বিবর্তনের কেন্দ্রবিন্দু এবং মানুষের চাহিদা, ভোগ এবং মূল্যই হল পরিবেশ নীতিবিদ্যার যাচাইকরণের মূল ভিত্তি। উইলিয়াম বাক্সটার (William Baxtar) তাঁর"people or penguins: The case for optimal pollution" নামক প্রবন্ধে মানবকেন্দ্রিক পদটির একটি চরম সংস্করণের প্রস্তাব করেছেন। তিনি বলেন, "আমার মানদন্ডটি মানুষকে কেন্দ্র করে, পেঙ্গুইন নয়। পেঙ্গুইন, চিনি পাইন কিংবা ভূ-তাত্ত্বিক মার্বেল এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। আমার মানদন্ড অনুযায়ী পেঙ্গুইন গুরুত্বপূর্ণ।কেননা মানুষ তাদের পাথরে হাটা দেখে

উপভোগ করে।... তাদের (পেঙ্গুইন) নিজেদের জন্য পেঙ্গুইন সংরক্ষণের কোন আগ্রহ আমার নেই।"[৫৯]

এটা স্পষ্ট যে, বাক্সটারের প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি আধিপত্যকে উৎসাহ দেয় তাই এটি সবল মানবকেন্দ্রিক মতবাদ। মানবকেন্দ্রিকতাবাদের চরম সংস্করণ তথা সবল মানবকেন্দ্রিকতাবাদ ধ্বংসাত্মক হতে পারে। এ ধরণের মনোভাব যদি ব্যাপকভাবে ধারণ করা হয় তবে এটি সুস্পষ্ট যে পৃথিবীর পরিবেশ এবং মানবজাতি উভয় বিপদের সম্মুখীন হবে। সৌভাগ্যক্রমে বাক্সটারের দৃষ্টিভঙ্গি মানবকেন্দ্রিকতাবাদের চূড়ান্ত আদর্শ নয়। মানবকেন্দ্রিকতাবাদের আরও বিশ্বাসযোগ্য, দুর্বল/উদার সংস্করণ রয়েছে।

২.৪.২ দুর্বল মানবকেন্দ্রিকতাবাদঃ

গতানুগতিক মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি মানুষকে কেবল স্বতঃমূল্যে মূল্যবান করার কারণে বিতর্কিত হয়। তাই বিকল্প অনুসন্ধানের জন্য পরিবেশ নীতিবিদদের গবেষণার অন্যতম প্রধান বিষয় হয়ে উঠে প্রকৃতির অ-মানব অংশগুলিকেও স্বতঃমূল্যে মূল্যবান করা যুক্তিযুক্ত কিনা তা অনুসন্ধান করা। কিছু পরিবেশ নীতিবিদ যেমন নরটন , লাইট, কার্টজএবং হারগ্রভ এর মতে আমাদের অ-মানবকেন্দ্রিক পরিবেশ নীতিবিদ্যার প্রয়োজন নেই। তাঁরা দাবি করেন যে, নীতি নির্ধারণের মতো ব্যবহারিক উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে মানবকেন্দ্রিক নৈতিক তত্ত্বগুলি অ- মানবকেন্দ্রিকের চেয়ে বেশি কার্যকর হতে পারে। তাছাড়া পরিবেশ সমস্যার পুনরাবৃত্তির জন্য সবল মানবকেন্দ্রিকতাবাদের কর্তৃত্ব উৎপাটিত হচ্ছে। ক্রমবর্ধমান পরিবেশ সমস্যার সাথে এ মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি লড়াই করতে অক্ষম হওয়ার কারণে মানবকেন্দ্রিকতাবাদীরা পরিবেশগত সমস্যাগুলি আরও ভালভাবে পরিচালনা করার জন্য একটি নতুন, পরিমিত সংস্করণ চালু করেছিলেন। এই নতুন সংস্করণটিই হল দুর্বল মানবকেন্দ্রিকতাবাদ যাকে আলোকিত (Enlightened)অথবা বিচক্ষণতাবাদী মানবকেন্দ্রিকতাবাদ (Prudential Anthropocentrism) নামেও অভিহিত করা যায়।

দুর্বল মানবকেন্দ্রিকতাবাদকে সবল মানবকেন্দ্রিকতাবাদ ও অমানবকেন্দ্রিকতাবাদের মধ্যবর্তী অবস্থা হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। দুর্বল মানবকেন্দ্রিকতাবাদ অনুসারে মানুষ নৈতিক বিবেচনার কেন্দ্রস্থল। কিন্তু এ মতবাদ এটা মনে করে না যে, সকল প্রজাতি এবং বাস্তুতন্ত্রের সুরক্ষার চেয়ে মানুষের শোষণমূলক ইচ্ছাগুলি প্রাধান্য পাবে। মানুষের মূল্য অন্যান্য সত্তার চেয়ে মূল্যবান তার মানে এই নয় যে, যেকোন পরিস্থিতিতেই মানুষের স্বার্থকে দেখতে হবে। এ মতবাদ মানুষের পাশাপাশি প্রাকৃতিক অ-মানব অংশগুলিকেও মূল্য দেয়। তবে অ-মানবের চেয়ে মানুষের উচ্চতর নৈতিক

অবস্থান রয়েছে এ বিষয়টিকে দুর্বল মানবকেন্দ্রিক মতবাদ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে। তাছাড়া কিছু দুর্বল মানবকেন্দ্রিক মতবাদ অ-মানব প্রাকৃতিক সত্তাকে স্বতঃমূল্যে মূল্যবান বলে মনে করে না। তারা বিশ্বাস করে যে, এটি এমন একটি নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি যা মানুষের স্বার্থকে রক্ষার জন্য প্রকৃতি ও অ-মানব প্রাণীকে সুরক্ষিত করার চেষ্টা করে। ফলে প্রকৃতি সংরক্ষণের সাথে সাথে তাদের স্বার্থও বজায় থাকবে। দুর্বল মানবকেন্দ্রিকতার ভিত্তি হল মূলত প্রকৃতি শোষণের ক্ষেত্রে মানুষের বিরুদ্ধে যে আপত্তি তা নির্মূল করার জন্য প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক সৃষ্টি করে বাসযোগ্য পরিবেশ তৈরী করা, মতান্তরে মানুষের স্বার্থকেই প্রাধান্য দেয়া।[৬০]

দুর্বল মানবকেন্দ্রিকতাবাদীরা দাবি করেন যে, মানবকেন্দ্রিক যুক্তিগুলো প্রকৃতির সুরক্ষার জন্য যথেষ্ট ভাল, যেহেতু মানুষের স্বার্থগুলো অ-মানব প্রাকৃতিক সত্তার স্বার্থের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত। তাই তাদের মতে, মানবকেন্দ্রিক মতবাদ পরিবেশ সংরক্ষণ ও সুরক্ষার জন্য উপযোগী ক্ষেত্র। আমরা পূর্বেপেঁচার যে উদাহরণ দিয়েছি সে ক্ষেত্রে দুর্বল মানবকেন্দ্রিকতাবাদীদের দৃষ্টিকোণ থেকে রেখাবিশিষ্টপেঁচা এবং এর আবাসস্থল সংরক্ষণের যে লাভ তা যেকোন ব্যয়কে ছাড়িয়ে যাবে। কেননা–

প্রথমত, দাগযুক্ত পেঁচা সংরক্ষণ করা মানে পুরা বাস্তুতন্ত্রকে সংরক্ষণ করা যার উপর গাছপালা, অন্যান্য প্রাণী এবং মানুষ নির্ভর করে। এই দাগযুক্ত পেঁচাকে সূচক প্রজাতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয় কেননা তাদের আবাসস্থল দিয়ে বাস্তুতন্ত্রের স্বাস্থ্যকে পরিমাপ করা যায়। এই প্রজাতির ক্রমবর্ধমান বিলুপ্তির ফলে অন্যান্য প্রজাতিও বিলুপ্তির পথে। যেমন, হরিণ এবং উড়ন্ত কাঠবিড়ালী জাতীয় প্রজাতিগুলোও বিলুপ্তির দিকে যাচ্ছে যারা এ বনভূমিতেই বাস করে। ফলে মানবজীবন টিকিয়ে রাখার জন্য যে প্রাকৃতিক উৎপাদনশীল শক্তির প্রয়োজন তার ব্যত্যয় হচ্ছে। প্রাচীন বন এবং তাদের মধ্যে বেড়ে উঠা যে প্রজাতিগুলো তারা আত্মঃনির্ভরশীল সম্পর্কের একটি জটিল ওয়েব গঠন করে যা মাটি ক্ষয়, বন্যা ও ভূমিধস রোধ, কৃষিক্ষেত্র ও শহরগুলির জন্য পরিস্কার পানি সরবরাহ করে, স্যালমন মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করে, ভূমিকে উৎপাদনশীল করে এবং গ্রীনহাউস প্রভাবকে প্রশমিত করে। বনভূমির এই লাভজনক দিকটিকে কোনভাবেই প্রতিস্থাপন করা যায় না।

দ্বিতীয়ত, সমাজকে এ প্রজাতিটির নান্দনিক মূল্যের কারণে সংরক্ষণ করতে হবে । কোন ধরনের সমাজ এই প্রাকৃতিক বন তৈরী করতে পারবে? বহু শতাব্দী ধরে তৈরী হওয়া এসকল প্রাকৃতিক বস্তুগুলো প্রজন্মের পর প্রজন্মের নান্দনিক সৌন্দর্য্য উপভোগের সুযোগ করে দিচ্ছে।

পরিশেষে পেঁচা এবং তাদের আবাসস্থলের বিশাল বৈজ্ঞানিক মূল্য রয়েছে। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের গবেষণার জন্য এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এখন পর্যন্ত এ বনগুলি নিয়ে খুব কমই গবেষণা করা হয়েছে। যদি এদের নিয়ে গবেষণার পূর্বে তারা বিলুপ্ত হয়ে যায় তাহলে তাদের থেকে আমরা যে সুবিধাগুলো নিতে পারতাম তা থেকে আগেই বঞ্চিত হয়ে যাব। যেমন, পেনিসিলিন আবিষ্কারের পূর্বেই যদি এর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যেত তাহলে বর্তমানে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হতো।

দুর্বল মানবকেন্দ্রিকতাবাদীরা মনে করেন এটা ঠিক যে, পেঁচার আবাসস্থলকে রক্ষা করতে গেলে চাকুরীর ক্ষতি হবে। কিন্তু তারা যুক্তি দেন যে, এ চাকরিগুলি যাই করা হোকনা কেন একসময় বিলুপ্ত হয়ে যাবে। বর্তমানে যে হারে বনভূমি ধ্বংস করা হচ্ছে তা যদি আগামী ত্রিশ বছর অব্যাহত থাকে তবে তার কোন অস্তিত্বই থাকবে না। ফলে শিল্পমালিকরা তাদের কারখানাগুলো বন্ধ করে দেবে।

দুর্বল মানবকেন্দ্রিকতাবাদীরা আরো দাবি করে বলেন যে, সংরক্ষণের পরিমাপগুলোনান্দনিক, বৈজ্ঞানিক এবং পরিবেশগত সুবিধাদির কথা চিন্তা করে হওয়া উচিত। তাঁরা যুক্তি দেন যে, কয়েক হাজার একর পুরোনো বনকে ইতোমধ্যে জাতীয় উদ্যান এবং প্রান্তর অঞ্চল হিসাবে আলাদা করা হয়েছে। এছাড়াও যেসকল জায়গায় কাঠের জন্য গাছ লাগানো হচ্ছে সেখানে ক্রমাগতভাবে পুনরায় বনজ করা হচ্ছে। পুরাতন বনভূমি এবং নতুন বন সবগুলোই নান্দনিক অভিজ্ঞতা, বিনোদন এবং বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের জন্য পর্যাপ্ত সুবিধা সরবরাহ করে। তদুপরি নান্দনিক অভিজ্ঞতার জন্য আমাদের যে আকাঙ্ক্ষা বা জ্ঞান অর্জনের জন্য আমরা যে মূল্যবোধ রেখেছি সেগুলোকে চাকুরী কিংবা আবাসনের মতো প্রয়োজনগুলি পূরণের জন্য অনুমতি দেয়া উচিত নয়।

ব্রায়ান নরটন এবং ই.সি.হারগ্রভহলেন দুর্বল মানবকেন্দ্রিকতাবাদের দুজন উল্লেখযোগ্য প্রবক্তা। তাদের মধ্যে কিছু বিষয়ে মতদ্বৈততা থাকলেও মানবকেন্দ্রিকতাবাদের একটি বিশ্বাসযোগ্য ও কার্যকর সংস্করণ হিসাবে দুর্বল মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে উভয়েই দৃঢ়তার সাথে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন।

এছাড়াও টিম হেওয়ার্ড (Tim Hayward)ও দুর্বল মানবকেন্দ্রিকতার কথা বলেন। নিচে আমরা নরটন, হারগ্রভ এবং টিম হেওয়ার্ড এর দুর্বল মানবকেন্দ্রিকতার দৃষ্টিভঙ্গিগুলো আলোচনা করব।

২.৪.২.১ নরটন এর দুর্বল মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিঃ

নরটন মনে করেন যে, দুর্বল মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবেশ সুরক্ষার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি রয়েছে। তিনি এমন মানবকেন্দ্রিক মূল্যের কথা বলেন যা সবল মানবকেন্দ্রিক (অর্থনৈতিক ও ব্যবহারিক মূল্যকে অনুমোদন করে) নয়। তিনি দৃঢ়ভাবে বলেন যে, যদি আমাদের সংস্কৃতি প্রজাতির মানবভিত্তিক মূল্যের গভীরতা, প্রসারতা এবং সামর্থ্য উপলব্ধি করতে পারে তাহলে আমরা সংরক্ষণের জন্য আরও কিছু করতে পারবো।[৬১]

এ ধরণের আলোকিত মানবকেন্দ্রিকতাবাদ[৬২] পরিবেশকে মানুষের প্রয়োজনেই রক্ষা করে। তাই এটি সবল মানবকেন্দ্রিকতাবাদের ন্যায় অর্থনৈতিকভাবে প্রাকৃতিক সত্তাসমূহকে শোষণ করে না।

নরটন মনে করেন যে, বাস্তুতন্ত্রের সুস্বাস্থ্য এবং স্থায়িত্বের জন্য অ-মানবকেন্দ্রিকতাবাদের চেয়ে দুর্বল মানবকেন্দ্রিকতাবাদ বেশি সুরক্ষা দেবে। তিনি দাবি করেন, দুর্বল মানবকেন্দ্রিকতাবাদ এমন একটি পরিমিত নীতিবিদ্যা যেখানে প্রকৃতির পৃথক স্বতঃমূল্যের প্রয়োজন নেই। তাঁর মতে,

"The assumption that environmental ethics must be non-anthropocentric in order to be adequate is mistaken." [৬৩]

অর্থাৎ তিনি মনে করেন যে, পরিবেশ নীতিবিদ্যায় অ- মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির চেয়ে দুর্বল মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি বেশি যুক্তিযুক্ত কেননা প্রকৃতি এর দ্বারা বেশি উপকৃত হয়। তিনি দুর্বল মানবকেন্দ্রিকতাবাদ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মানুষের দুই ধরণের পছন্দের অগ্রাধিকারের কথা বলেন[৬৪]:

ক. অনুভবের পছন্দের অগ্রাধিকার (Felt Preference);ও

খ. বিবেচিত পছন্দের অগ্রাধিকার (Considered Preference)।

নরটনের মতে , অনুভবের পছন্দের অগ্রাধিকার হল ব্যক্তি মানুষের এমন কোন আকাঙ্ক্ষা বা চাহিদা যা সাময়িকভাবে কোন ব্যক্তির কিছু নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে পরিতৃপ্ত করে।[৬৫]

তাছাড়া তিনি আরও মনে করেন যে, মানুষের স্বল্পমেয়াদী ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য অ-মানব প্রাকৃতিক সত্তার শোষণ, ভোগ, ধ্বংস, আধিপত্য ইত্যাদিকে অনুভবের পছন্দের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সংগঠিত করা হয়। ফলে দেখা যায় এ ধরণের পছন্দগুলো সবল মানবকেন্দ্রিকতাবাদকে সমর্থন জোগায়।

নরটনের মতে, "A merely felt preferences is any desire or need that can be satisfied by a specific direct experience of an individual.[৬৬]

অর্থাৎ একটি নিছক অনুভূত পছন্দ কেবল ব্যক্তি মানুষের আকাঙক্ষা বা চাহিদার নির্দিষ্ট কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে সন্তুষ্ট করতে পারে।

এ ধরণের পছন্দগুলো সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন , বাজার মূল্যায়ন এবং অর্থনৈতিক পরিমাপের ক্ষেত্রে পাওয়া যায় যেখানে মানুষ কোন প্রকার মূল্যবোধ বা বিশ্বাসের কথা চিন্তা না করে পছন্দ করে। সমাজের মধ্যে যে মূলবোধগুলোকে মূল্যায়ন করা হয় অনুভূত পছন্দ সেটাকেই প্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু এটি সন্তুষ্টির হার এবং আকাঙক্ষার পরিপূর্ণতাকে বিবেচনা না করেই হয়ে থাকে। যদি আমরা পূর্বে বর্ণিত দাগওয়ালা পেঁচা সংক্রান্ত উদাহরণের ক্ষেত্রে অনুভূত পছন্দকে প্রয়োগ করি তাহলে তারা পেঁচাকে সংরক্ষণ না করে কাঠ সংগ্রহ করাকে সমর্থন করবে। তাই মাঝে মাঝে আমাদেরকে অনুভূত পছন্দকে অগ্রাহ্য করতে হয় কেননা তারা আমাদের বিশ্ববীক্ষা (Worldview) এবং মূল্য পদ্ধতিসমূহকে প্রতিনিধিত্ব করে না। এক্ষেত্রে নরটন বলেন যে, বর্তমানে খুব বড় সমস্যা হল সাম্প্রতিককালে বেশিরভাগ মানুষেরই বাস্তুতন্ত্র এবং প্রাকৃতিক আবাসস্থলের ব্যাপারে অনুভূত পছন্দের অগ্রাধিকার লক্ষ্য করা যায় না।[৬৭]

অনুভূত পছন্দ বাজার পদ্ধতি ও অর্থনৈতিক মূল্যের মধ্যেও পাওয়া যায়। কিন্তু এই অনুভূত পছন্দকে যখন অ-ব্যবহৃত মুল্যের (non-use values) হিসেবে দাগওয়ালা পেঁচার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় তখন সমস্যা দেখা যায়। কারণ সমস্ত অ-মানব সত্তাকে মানুষের সন্তুষ্টিপূরণের জন্য ব্যবহারিক ও অর্থনৈতিক মূল্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়। অনুভূত পছন্দ অ-মানব সত্তাগুলিকে কেবল শোষণমূলক ব্যবহারের মাধ্যমে মূল্যায়িত করে। এখানে দাগওয়ালা পেঁচা ও তাদের আবাসস্থল অনুভূত পছন্দ অনুসারে মূল্যবান নয়। উক্ত বনাঞ্চলের কাঠের মূল্য এবং প্রাপ্ত সুবিধাদি অনুভূত পছন্দের অগ্রাধিকার দ্বারা মূল্যবান। পরিবেশ নীতিবিদ্যায় এ ধরণের দৃষ্টিভঙ্গিকে মূলতঃ সবল মানবকেন্দ্রিকতাবাদ বলা হয়। আমাদের পরিবেশ সুরক্ষার ক্ষেত্রে সবল মানবকেন্দ্রিকতাবাদের মধ্যে যে সকল অনুভূত পছন্দকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় তাকে এড়িয়ে চলা উচিত। অবশ্য নরটন এ সমস্যাটি কাটিয়ে উঠার জন্য বিবেচিত পছন্দের অগ্রাধিকারের কথা বলেন।

বিবেচিত পছন্দের অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে মানুষের আকাঙ্ক্ষা, চাহিদা বা স্বার্থকে খুব যত্ন সহকারে বিবেচনা করা হয়। এ ধরণের পছন্দগুলো বিশ্ববীক্ষাদ্বারা যৌক্তিকভাবে বা ন্যায়সঙ্গতভাবে সঠিক কিনা

তা লক্ষ্য করেই গৃহীত হয়। নরটনের মতে, "বিবেচিত পছন্দের অগ্রাধিকার হলো একজন ব্যক্তিমানুষ তার আকাঙ্ক্ষা বা প্রয়োজনকে বিশ্ববীক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে যুক্তিযুক্তভাবে তার ইচ্ছা বা প্রয়োজনীয়তাকে বিবেচনা করবে। এটা এমন ধরণের বিশ্ববীক্ষা যা সম্পূর্ণরূপে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এবং অধিবিদ্যক পরিবেশ কাঠামোকে অন্তর্ভূক্ত করে এবং পাশাপাশি নান্দনিক ও নৈতিক আদর্শকে সমর্থন করে।[৬৮]

বিবেচিত পছন্দের অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির ইচ্ছা এবং প্রয়োজনগুলিকে মূল্যবান শর্তের প্রেক্ষিতে পূরণ করে। এটি হচ্ছে এমন এক ধরণের পছন্দ যা জটিল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিশ্লেষণ এবং আত্ম-সমালোচনার শেষে গ্রহণ করা হয়।[৬৯]

অনুভূত পছন্দগুলোকে বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখা হয় যে এগুলো যৌক্তিক, নৈতিক এবং বাস্তবায়নযোগ্য কি-না। মূলত বিবেচিত পছন্দ হল অনুমানমূলক, তবে যদি আমাদের অভিজ্ঞতাগতভাবে মূল্যায়ন করার কোন পদ্ধতি থেকে থাকে তবে আমাদের বর্তমান অনুভূত পছন্দের বিরুদ্ধে তা পরামর্শ করার অনুমতি দেয়। নরটনের মতে, যখন আমদের স্বার্থগুলো কেবল অনুভবের পছন্দের অগ্রাধিকার দ্বারা গঠিত হয় তখন তা বিতর্কিত বা সমালোচিত হয়। কিন্তু বিবেচিত পছন্দের মাধ্যমে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তা বিশ্ববীক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধায় যুক্তিযুক্ত হয় এবং তা গ্রহণযোগ্যও হয়।

যদি আমরা পেঁচার ক্ষেত্রে বিবেচিত পছন্দকে প্রয়োগ করি তবে এটা অনুভূত পছন্দের ক্ষেত্রে যা অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে তার সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করবে। বিবেচিত পছন্দ বনাঞ্চলের কাঠ সংগ্রহের পরিবর্তে বনাঞ্চল রক্ষাপুর্বক বিলুপ্তপ্রায় পেঁচাটিকে রক্ষা করবে। তবে এক্ষেত্রে বিবেচিত পছন্দের অগ্রাধিকার মূলত নৈতিক এবং নান্দনিক আদর্শকে ধারণপূর্বক অনুভূত পছন্দকে যৌক্তিকভাবে গ্রহণ করে সিদ্ধান্ত নিবে। নরটন পেঁচাকে অবদানমূলক মূল্যে মূল্যায়িত করে বলেন যে, এই পেঁচা এবং তাদের আবাসস্থল সর্বোপরি পুরো বাস্তুতন্ত্র থেকে আমরা নান্দনিক এবং সাংস্কৃতিক সুবিধা লাভ করে থাকি। এজন্য তা দুর্বল মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির আওতাভুক্ত। অন্যদিকে সবল মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি বিলুপ্তপ্রায় পেঁচা এবং আবাসস্থলের পরিবর্তে উক্ত বনাঞ্চল থেকে প্রাপ্ত কাঠের ব্যবহারিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্বের ভিত্তিতে মূল্য নির্ধারণ করে।

নরটনের দুর্বল মানবকেন্দ্রিকতাবাদ অনুসারে, যদি হুমকিস্বরূপ বাস্তুসংস্থান এবং প্রজাতি আবেগিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিকভাবে মূল্যবান হয় তবে তাদেরকে আমাদের রক্ষা করা উচিত। যদি আমরা

হাঙ্গরকে আবেগিকভাবে এবং মনস্তাত্ত্বিকভাবে মূল্য না দিই তবে কি তাদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব পালন করা হবে? নরটন-এর মতে অবদানমূলক মূল্য হল প্রতিটি প্রজাতি বাস্তুতন্ত্রের অংশ হিসাবে অবদান রাখে এবং এটি প্রজাতিগুলোকে সামগ্রিকভাবে মূল্যায়ন করে এবং এ সকল প্রজাতি একে অপরের উপর নির্ভরশীল থাকে।[৭০]

সুতরাং অবদানমূলক মূল্য অনুসারে মানুষের নিকট প্রজাতির একটি নির্দিষ্ট মূল্য রয়েছে। এমনকি তাদের মূল্য যদি স্পষ্টভাবে নাও প্রতীয়মান হয় তারপরেও এদের মূল্য আছে। প্রত্যেকটি প্রজাতির বাস্তুতন্ত্রে নির্দিষ্ট অবদান রয়েছে এবং এই অবদানের কারণেই আমাদের নিকট তাদের মূল্য আছে। নরটন জোর দাবি করেন যে, বাস্তুতন্ত্রের সকল প্রজাতিকে রক্ষা করা অবাস্তব এবং নৈতিকভাবেও আপত্তিকর। যদিও প্রত্যেকটি প্রজাতির বাস্তুসংস্থানে অবদানের জন্য মূল্য আছে তবুও আমরা সকল প্রজাতিকে এখনও রক্ষা করতে পারি না। তাই আমাদেরকে মূল্যের উপর নির্ভর করে স্তরবিন্যাস করা উচিত। আমাদেরকে দেখতে হবে বাস্তুতন্ত্রের ক্ষেত্রে কোন প্রজাতির গুণাগুণ অন্যান্য প্রজাতির চেয়ে বেশি। এটি উপলব্ধি করার একটি উপায় হল পরিবেশগত মানদন্ড ব্যবহার করে অর্থাৎ কোন প্রজাতি অন্যগুলোর চেয়ে বাস্তুবিদ্যক দিক থেকে বেশি মূল্যবান এবং এটি আমরা বিবেচিত পছন্দের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে গ্রহণ করব। যে প্রজাতি বাস্তুতান্ত্রিক স্বাস্থ্যকে ভাল রাখতে বেশি অবদান রাখছে সে প্রজাতিকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। এক্ষেত্রে কিছু প্রজাতিকে বর্জন করে যেগুলো মানুষ এবং পরিবেশগত দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে তাদের প্রতি মনোনিবেশ করতে হবে।[৭১]

নরটন মনে করেন যে, স্বতঃমূল্যের উপর ভিত্তি করে কোন প্রজাতিকে রক্ষার চেয়ে তাদের অবদানমূলক মূল্যের ভিত্তিতে মূল্য দেওয়া হলে তা আরও বেশি বৈজ্ঞানিক এবং পরিবেশগত সিদ্ধান্ত হবে। অবদানমূলক মূল্য অনুসারে সকল প্রজাতিই বাস্তুতন্ত্রের বৈচিত্র্য এবং সমৃদ্ধিতে অবদান রাখে তবে কিছু কিছু প্রজাতি অন্যান্য প্রজাতির চেয়ে বেশি অবদান রাখে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমরা কিভাবে প্রজাতিগুলোর মূল্যকে পৃথক করব ? আমরা কিভাবে মূল্যের স্তরবিন্যাস করব যদি সকল প্রজাতিরই মূল্য থাকে ? এ সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার একটি উপায় হচ্ছে প্রজাতির উপর আরও বেশি নৈতিক বাধ্যবাধকতা স্থাপন করা যা তাদের বাস্তুতন্ত্রের কার্যক্ষমতার উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে। অবদানমূলক মূল্য বাস্তুতন্ত্রের উপর যে প্রজাতি ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে তার উপর ভিত্তি করে মূল্য নির্ধারণ করে তাদের প্রতি আমাদের নৈতিক দায়িত্বের কথা বলে। এখানে যেসকল প্রজাতি বাস্তুতন্ত্রের স্বাস্থ্য রক্ষায় বেশি অবদান রাখে তাদের প্রতি নৈতিকভাবে বাধ্যবাধক হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। প্রজাতিগুলোর কোন অন্তর্নিহিত মূল্যের (Inherent Value) জন্য নয় বরং

বাস্তুতন্ত্রের কার্যক্ষমতার মাধ্যমে মানবজাতির জন্য উপকার করার কারণে তাদেরকে মূল্য দেওয়া হবে। তবে এক্ষেত্রে প্রশ্ন করা যায় কোন প্রজাতি বাস্তুতন্ত্রের জন্য কতটা অবদান রাখে তা সম্পর্কে আমাদের পরিপূর্ণ জ্ঞান আছে কি ? এক্ষেত্রে বলা যায় যে, আমরা যা বর্তমানে অনুমান করি এবং স্বীকার করি সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে সে সম্পর্কে জানা সম্ভব হয়।

অবদানমূলক মূল্যে কোন প্রজাতিকে আমরা যে মূল্য দিয়ে থাকি তা একেবারে নির্দিষ্ট নয়।[৭২] বাস্তুতন্ত্র সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের বিকাশের সাথে সাথে প্রজাতির মূল্যও পরিবর্তিত হতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, অতীতে বাস্তুতন্ত্রের সুরক্ষার ক্ষেত্রে হাঙ্গরের ভূমিকা সম্পর্কে কেউ অবগত ছিল না। কিন্তু পরবর্তীতে বৈজ্ঞানিক ও পরিবেশগত জ্ঞানের বিকাশের সাথে সাথে আমরা জানতে পারি যে, হাঙ্গরের বিলুপ্তি হলে সমুদ্রের বাস্তুতন্ত্রের উপর নাটকীয় প্রভাব পড়বে। এক্ষেত্রে দেখা যায় যে, নরটনের অবদানমূলক মূল্যের দৃষ্টিভঙ্গি অন্যান্য পরিবেশগত অবস্থানের তুলনায় নমনীয় অবস্থানে আছে। কারণ এটি প্রজাতিসমূহকে তাদের অর্থনৈতিক বা নান্দনিক মূল্যের চেয়ে বাস্তুসংস্থানে তাদের মিথস্ক্রিয়া এবং অবদানকে গুরুত্ব দেয়। হাঙ্গরের প্রতি আমাদের নৈতিক বাধ্যবাধকতা কখনই উপেক্ষিত নয় কেননা অবদানমূলক মূল্য অনুসারে সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রের মৌলিক ও সুদূরপ্রসারী অবদানের ক্ষেত্রে হাঙ্গরের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই বলা যায় হাঙ্গর একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতি এবং তাদের বিলুপ্তির ফলে অন্যান্য প্রজাতি এবং বাস্তুতন্ত্রের উপর একটি বিধ্বংসী প্রভাব পড়বে। অন্যদিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, হাঙ্গরেরা যেসকল প্রজাতিকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে সেগুলোর শিকারের পরিণত হয় শৈবালভোগীগুলো। হাঙ্গরের অস্তিত্ব না থাকলে এসব শৈবালভোগীরা দিন দিন কমে যাবে।তারপরও হাঙ্গরের অবদানমূলক মূল্যকে অগ্রাহ্য করে মানুষ তাকে অর্থনৈতিক ও ব্যবহারিক মূল্যে ব্যবহার করে। যেমন, হাঙ্গর ফিস, স্যুপ তৈরির জন্য হাঙ্গরকে শিকার করা হয়। কিন্তু আমাদেরকে ভাবতে হবে যে, তাদের অর্থনৈতিক মূল্যের চেয়ে সমুদ্রে বাস্তুতন্ত্রের ক্ষেত্রে যে অবদানমূলক মূল্য তারা সরবরাহ করে তা আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয়ই প্রজন্মের জন্য খুবই মূল্যবান।

মূলতঃ নরটন পরিবেশগত স্থায়িত্বের জন্য অনুভবের পছন্দের অগ্রাধিকার দিয়ে যে কাজগুলো সম্পাদন করা হয় তাকে অসমর্থন করেন। প্রকৃতপক্ষে একজন প্রয়োগবাদী হিসেবে নরটন মানব এবং অ-মানব প্রাকৃতিক সত্তাসমূহের মধ্যে একটি দীর্ঘমেয়াদী সমন্বয়পূর্ণ সম্পর্কের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তিনি সবল মানবকেন্দ্রিকতাবাদকে প্রত্যাখ্যান করেন কারণ তা কেবল ব্যক্তি মানুষের

অনুভবের পছন্দের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে মূল্যতত্ত্ব প্রয়োগ করে। তিনি মনে করেন সবল মানবকেন্দ্রিকতাবাদ প্রকৃতির উপর শোষণমূলক মনোভাব, ভোগমূলক চিন্তা, আধিপত্যবাদের কারণে পরিবেশ সুরক্ষার ক্ষেত্রে বাধাস্বরূপ।[৭৩] তাই তিনি এমন একটি মতবাদের উল্লেখ করেন যা প্রকৃতি শোষণ না করে সুরক্ষা দেবে। এক্ষেত্রে তিনি তাঁর দুর্বল মানবকেন্দ্রিকতাবাদের দুটি নৈতিক সংস্থান (ethical resource) এর কথা বলেন যা পরিবেশবাদীদের নিকট খুবই তাৎপর্য বহন করে। এগুলো হলো[৭৪] :

প্রথমতঃ দুর্বল মানবকেন্দ্রিকতাবাদের মাধ্যমে পরিবেশবাদীরা এমন একটি বিশ্ববীক্ষার প্রস্তাব করতে পারে যা মানব প্রজাতি এবং অন্যান্য জীবন্ত প্রজাতির মধ্যকার দৃঢ় সম্পর্ককে গুরুত্ব দেবে। পরিবেশবাদীরাও মানুষের আচরণের সাথে প্রকৃতির বন্ধন সৃষ্টি করতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ দুর্বল মানবকেন্দ্রিকতাবাদ অনুভবের পছন্দের অগ্রাধিকার ও বিবেচিত পছন্দের অগ্রাধিকার উভয়কে মূল্য দেয় এবং অনুভবের পছন্দের জায়গায় বিবেচিত পছন্দকে প্রতিস্থাপন করতে সক্ষম হয় যা আরো বেশি যৌক্তিক, সঙ্গতিপূর্ণ এবং ন্যায়সঙ্গত।

নরটন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে প্রকৃতির সুরক্ষার জন্য দুর্বল মানবকেন্দ্রিকতাবাদ অনুমোদন করা উচিত। তাঁর মতে, দুর্বল মানবকেন্দ্রিকতাবাদ মানবকেন্দ্রিকতাবাদকেই সমর্থন করে এবং এটি সবল মানবকেন্দ্রিকতাবাদের চেয়ে অ-মানবকেন্দ্রিকতাবাদের সাথে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ। কেননা দুর্বল মানবকেন্দ্রিকতাবাদ প্রকৃতির সাথে সমন্বয় করে বেঁচে থাকার তাগিদ দেয়। প্রকৃতির ওপর কোনোরূপ শোষণ, অবাধ ধ্বংস, আধিপত্য– যা কিছু বাস্তুতন্ত্রকে বিপর্যস্ত করে তা দুর্বল মানবকেন্দ্রিকতাবাদ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে না।

নরটন দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে, দুর্বল মানবকেন্দ্রিকতাবাদ এর যে মূল্য পদ্ধতি তা বাস্তুসংস্থানে প্রয়োগ করে এর স্বাস্থ্য এবং স্থায়ীত্ব রক্ষার মাধ্যমে প্রকৃতির সাথে মানুষের এক ধরনের ঐক্য তৈরী করা যায়। প্রয়োগবাদী দার্শনিক হিসাবে তিনি মানুষের স্বার্থ সংরক্ষণের পাশাপাশি প্রকৃতির সাথে একটি অর্থপূর্ণ সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন।

২.৪.২.২ ইউজিন সি. হারগ্রভ এর দুর্বল মানবকেন্দ্রিকতাবাদঃ

ইউজিন সি. হারগ্রভ দুর্বল মানবকেন্দ্রিকতাবাদের আরো একজন উল্লেখযোগ্য প্রবক্তা। হারগ্রভ তাঁর দুর্বল মানবকেন্দ্রিকতাবাদ আলোচনা করতে গিয়ে নরটনের দুর্বল মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা

করেন। কেননা নরটন মনে করেন ব্যবহারিক মূল্য যেভাবে মানুষের উপকারের জন্য ব্যবহৃত হয় ঠিক তেমনি অ-মানব সত্তার স্বতঃমূল্য তখনই স্বীকার করা হবে যখন তা কেবল মানুষের কাজে আসবে। উদাহরণস্বরূপ, কেউ একজন অ-মানব সত্তাকে নান্দনিক স্বতঃমূল্যে মূল্যায়িত করবে কারণ এটি তার আনন্দের অনুভূতিকে জাগিয়ে তোলে।[৭৫] হারগ্রভ নরটনের এ দৃষ্টিভঙ্গিকে সমালোচনা করেন। কারণ তিনি দাবি করেন যে, সকল অ-ব্যবহারিক মূল্য হল মূলত ব্যবহারিক মূল্যের অন্য একটি রূপ। তিনি মনে করেন এ ধরণের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উপলব্ধি করা যায় যে, অ-মানব প্রাকৃতিক সত্তাকে স্বতঃমূল্যে মূল্যায়িত করা হয় কেবল নিজেদের ব্যক্তিগত আনন্দ এবং সন্তুষ্টির জন্য।

নরটন দাবি করেন যে, যখন আমরা প্রকৃতিকে স্বতঃমূল্যে মূল্যবান মনে করি তখন আমরা কোন না কোনভাবে ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই একে দেখি। যদি আমরা নান্দনিক, আধ্যাত্মিক বা অ-ব্যবহারিক মূল্যে প্রকৃতিকে মূল্যবান মনে করি তবে সেটা মূলত আমরা আমাদের ব্যবহারিক (instrumental) দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই করে থাকি। লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে হারগ্রভ তাঁর দুর্বল মানবকেন্দ্রিকতাবাদ আলোচনা করতে গিয়ে মানবকেন্দ্রিক স্বতঃমূল্যের কথা বলেন। তাঁর দুর্বল মানবকেন্দ্রিক স্বতঃমূল্য অনুসারে, মানুষ কোন কিছুকে যখন স্বতঃমূল্যে মূল্যবান মনে করবে তখন তা মানুষের ব্যবহারিক মূল্য ছাড়াও স্বতঃমূল্যে মূল্যায়িত হবে। অর্থাৎ মানুষের ব্যবহার ছাড়াও এ ধরণের মূল্য অস্তিত্বশীল। উদাহরণস্বরূপ, হারগ্রভ দাবি করেন যে, কোন একটি আলংকারিক ছুরিরও স্বতঃমূল্য থাকতে পারে। কিন্তু উক্ত আলংকারিক ছুরিটি বাস্তবে আমরা ব্যবহার করি না। এ প্রেক্ষিতে হারগ্রভ 'ব্যবহার' ও 'মূল্যের' মধ্যে পার্থক্য করেন। যেমন, ছুরিটি ব্যবহার করা ছাড়াও মূল্যবান হতে পারে।

অর্থাৎ হারগ্রভ দাবি করেছেন যে, কোন কিছুর উপর আমরা স্বতঃমূল্য আরোপ করি যদি তা আমাদেরকে ব্যবহারিক বা অর্থনৈতিক মূল্য ছাড়াও স্নেহ, প্রশংসা বা গ্রহণযোগ্যতা দেয়। এ ধরনের স্বতঃমূল্য বিভিন্ন অ-মানব, সজীব এবং অ-জীব এর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সম্ভব। এক্ষেত্রে একধরণের নৈতিক বিবেচনা (Moral onus) আছে যে, কোন জিনিসের ধ্বংস বা অপব্যবহার করা যাবে না। বরং এ সকল জিনিসকে যেকোন ধরনের ধ্বংস বা অপব্যবহার থেকে রক্ষা করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। হারগ্রভের দুর্বল মানবকেন্দ্রিক স্বতঃমূল্য বুঝতে হলে তিনি স্বতঃমূল্য বলতে কি বুঝিয়েছেন তা জানা আবশ্যক। পল টেইলর যে ধরনের মূল্যকে স্বতঃমূল্য বলেছেন হারগ্রভ সে ধরণের মূল্যকেই স্বতঃমূল্য হিসেবে গ্রহণ করেন। টেইলরের মতে, কোন সত্তার স্বতঃমূল্য আছে এর মানে হলো উক্ত সত্তা কোন নির্দিষ্ট উপায়ে কোন মানব মূল্যায়নকারীর দ্বারা মূল্যায়িত হয়েছে। এই সত্তা একজন

ব্যক্তি, প্রাণী, উদ্ভিদ, জড়বস্তু, স্থান, এমনকি কোনো সামাজিক রীতি হতে পারে। এ ধরণের কোন সত্তা যখন স্বতঃমূল্যে মূল্যবান বলে মনে করা হবে তখন কিছু মানুষ সেই সত্তাকে সযত্নে লালন করবে। এর সৌন্দর্য ও আনন্দকে ধারণ করবে, ভালবাসবে, মূল্য দেবে, কিংবা সেই সত্তাটির নিজের মধ্যে যা আছে তার জন্যই একে প্রশংসা করবে। অর্থাৎ এভাবে এর অস্তিত্বের উপর স্বতঃমূল্য আরোপ করবে। এ সত্তার যদি কোন ব্যবহারিক মূল্য বা বাণিজ্যিক মূল্য থাকে তবে সে মূল্য হবে স্বতঃমূল্য থেকে ভিন্ন। যখন কোন কিছু কারও দ্বারা স্বতঃমূল্যে মূল্যায়িত হয় তখন সে ব্যক্তি একে লালন ও সংরক্ষণ করে থাকে। কেননা সেই বস্তুটি আলাদাভাবে কেবল সেই বস্তুই হয়। এভাবে কোনো একটি সমাজের জনগোষ্ঠী একটি সামাজিক অনুষ্ঠানের উপর (যেমন, রাজার অভিষেক) বা ঐতিহাসিকভাবে মূল্যবান কোন বিষয়ের উপর (যেমন, স্বাধীনতার ঘোষণা) , তাৎপর্যপূর্ণ স্থানসমূহের উপর (যেমন, গেটিসবার্গের রণক্ষেত্র), ধ্বংসপ্রাপ্ত কোন প্রাচীন সংস্কৃতির উপর (যেমন, হরপ্পা বা মহেনজোদারোতে গড়ে ওঠা সংস্কৃতি) প্রাকৃতিক বিষয়ের উপর (যেমন, দি গ্রান্ড ক্যানিয়ন) এবং কোন শিল্পকর্মের উপর (যেমন, লিওনার্দ্যে দ্য ভিঞ্চির মোনালিসা) স্বতঃমূল্য আরোপ করতে পারে। স্বতঃমূল্য জীবন্ত বস্তুর উপরও আরোপ করা যেতে পারে, যদি তা মানব মূল্যায়নকারীর কাছে মূল্যবান হয় অর্থাৎ মানব মূল্যায়নকারীর জন্য এর স্বতঃমূল্য থাকে। যেমন একটি পোষা কুকুর বা বিড়াল, অথবা দুর্লভ প্রজাতির বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ অথবা একটি বনাঞ্চলের উপর এর নিজের গুণেই স্বতঃমূল্য আরোপ করে একে সংরক্ষণযোগ্য হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। এক কথায়, যা কিছুতেই মানুষ ভালোবাসে বা যত্ন নেয়, মানুষের কাছে তারই এ ধরণের মূল্য আছে। নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, কোনো কিছুকে স্বতঃমূল্যে মূল্যবান মনে করা হলে একটি নেতিবাচক ও একটি ইতিবাচক কর্তব্যকে স্বীকার করা হয়। এ জিনিসটিকে ধ্বংস না করা, ক্ষতি না করা, অনিষ্ট না করা, এর প্রতি বর্বরোচিত আচরণ না করা বা এর অপব্যবহার না করা- এগুলো হল নেতিবাচক কর্তব্য। আর ইতিবাচক কর্তব্য হলো এটিকে ধ্বংসের হাত থেকে, অনিষ্ঠের হাত থেকে, বর্বরোচিত আচরণ থেকে, অথবা অন্যের দ্বারা এর অপব্যবহার থেকে রক্ষা করা।[৭৬]

মূলতঃ হারগ্রভ মনে করেন যে, পল টেইলরের স্বতঃমূল্যের ধারণাটি দুর্বল মানবকেন্দ্রিক স্বতঃমূল্য বলতে যা বুঝায় হুবহু তাই। এ ধরণের স্বতঃমূল্য আমাদের স্নেহ, প্রশংসা, শ্রদ্ধা ইত্যাদির উপর নির্ভর করে।[৭৭] যা হোক, স্বতঃমূল্যের এ ধরণের সংজ্ঞা অবশ্যই কিছু আবেগ অনুভূতির উপর নির্ভর করে যা মূলত বিষয়ীগত মানব মূল্যায়নকারীর নিকট থেকে উৎসারিত হয়। যদি আমরা কোনকিছুকে শ্রদ্ধা করি, প্রশংসা করি, স্নেহ করি (যেমন, আলংকারিক ছুরি) সেটা আমাদেরকে কিছু ইতিবাচক, আবেগমূলক ও মানসিক প্রশান্তি দিয়ে থাকে। আমরা আলংকারিক ছুরিকে মূল্যায়ন করি কেননা

হয়তো এর কোন সংবেদনশীল মূল্য কিংবা এর সাংস্কৃতিক আধ্যাত্মিক অথবা নান্দনিক মূল্য রয়েছে। একটি ছুরি ব্যবহারিকভাবে মূল্যবান তখনই হয় যখন তা দিয়ে কোন কিছুকে কাটা হয়। কিন্তু একটি আলংকারিক ছুরি দিয়ে আমরা কিছু না কেটেই যদি এর সৌন্দর্য দেখে (নান্দনিক মূল্য) অথবা এটাকে আমাদের কোন পূর্বপুরুষের চিহ্নস্বরূপ (আবেগমূলক মূল্য) ভেবে, এর কোন ধর্মীয় গুরুত্বের (আধ্যাত্মিক মূল্য) জন্য এটিকে মূল্যায়ন করি কেননা এটি আমাদেরকে আরাম, তৃপ্তি বা আনন্দ উপভোগের সুযোগ দেয় (মনস্তাত্ত্বিক মূল্য)।

হারগ্রভ মানুষ ছাড়াওপ্রজাতি এবং বাস্তুতন্ত্রকে নৈতিক বিবেচনায় আনার পক্ষপাতী কেননা এগুলো মানবজাতির বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান। কেবল আমাদের বেঁচে থাকার জন্য আমরা তাদের উপর নির্ভরশীল এজন্যই নয় বরং আমরা কে, কোথা থেকে এসেছি এবং আমাদের বিভিন্ন মূল্যের বিকাশ ও সৃষ্টিতে তারা যে সহায়তা করছে সেদিক দিয়ে চিন্তা করেই আমরা তাদেরকে বিবেচনা করব। বর্তমান প্রজন্ম যদি প্রজাতি বা বাস্তুতন্ত্রের কোন ক্ষতি সাধন করে তা কেবল ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্যই হুমকিস্বরূপ নয় বরং বর্তমান প্রজন্মই তাদের জীবন সমৃদ্ধ করতে পারে এমন বিষয়গুলো যেমন-আধ্যাত্মিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং নান্দনিক সুবিধাগুলো থেকে নিজেদের বঞ্চিত করে। মূলত হারগ্রভ কোন সত্তার ব্যবহারিক মূল্য বলতে বুঝিয়েছেন ছুরিটি দিয়ে কোনকিছু কেটে আমাদের কাজে ব্যবহারের মাধ্যমে উপকার ভোগ করা। তাঁর মতে বাস্তুতন্ত্র থেকে প্রাপ্ত বস্তুসমূহকে ব্যবহারিক মূল্যে মূল্যায়িত করে ইচ্ছেমত ব্যবহার করলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বঞ্চিত হয়। কেউ কেউ হারগ্রভের দুর্বল মানবকেন্দ্রিক স্বতঃমূল্যের ধারণাকে ব্যবহারিক মূল্যেরই আরেকটি রূপ বলে মনে করেন। তারা মনে করে যে, যদি আমরা অবিরামভাবে স্বতঃমূল্য ধারণাটি কোন আবেগময়, নান্দনিক, ধর্মীয়, অথবা মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে দেখি তাহলে উক্ত বস্তুটির (আলংকারিক ছুরি) জন্য তা মঙ্গলজনক কিংবা তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য সহায়ক হবে। কিন্তু যদি তা না করি তাহলে সেটার অস্তিত্ব থাকবে না কেননা তখন সেটি কেবল একটি ছুরি, যা কাউকে উপকৃত করছে না কিংবা কারো প্রতি কোন বাধ্যবাধকতাও তৈরী করছে না। তাহলে কিভাবে একে আমরা পরিবেশগত প্রসঙ্গের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারি? তাহলে বাস্তুতন্ত্র কি হারগ্রভের ছুরির মূল্যায়নের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ?

হারগ্রভ এ প্রসঙ্গে এলিয়েন প্রজাতির উদাহরণ (এলিয়েন সংক্রান্ত চলচিত্র পেন্টালজি) দিয়ে তাঁর অবস্থান পরিষ্কার করেন। এ চলচ্চিত্রে দেখা যায় যে, এলিয়েনদেরকে জীববৈচিত্র্যের অনন্য উদাহরণস্বরূপ প্রতিনিধিত্ব করার জন্য আশ্রয় দেয়া হলো। যদিও তারা মানুষের জীবনের জন্য

বিপজ্জনক। একটি আদর্শ অ-মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে এ ধরণের প্রজাতিকে রক্ষা করা উচিত কেননা তাদের স্বতঃমূল্য রয়েছে। এগুলোর এমন মূল্য রয়েছে যা মূল্যায়নকারীর উপর নির্ভর করে না। মূল্যায়নকারীর প্রয়োজনে লাগুক আর নাই লাগুক এদের স্বতঃমূল্য আছে।

হারগ্রভ অ-মানবকেন্দ্রিক স্বতঃমূল্যের ত্রুটিগুলো প্রদর্শনের জন্য উক্ত উপমাটি ব্যবহার করেন এবং বলেন যে এ ধরনের প্রজাতির স্বতঃমূল্য স্বীকারের মাধ্যমে তাদের সুরক্ষার চেষ্টা করলে তা আমাদের মানবজাতির অস্তিত্বের জন্যই হুমকিস্বরূপ হবে। তাই হারগ্রভ দাবি করেন যে, অ-মানবকেন্দ্রিক স্বতঃমূল্য যে সমস্যাগুলোকে অতিক্রম করতে পারে নি দুর্বল মানবকেন্দ্রিকতাবাদ যে সমস্যগুলোকে অতিক্রম করতে পেরেছে।

হারগ্রভের স্বতঃমূল্যকে বিশ্লেষণ করলে আমরা অনুমান করতে পারি যে, যদি এলিয়েন প্রজাতিগুলোকে আমরা স্নেহ করি, শ্রদ্ধা করি তাহলে তারা আমাদের জন্য খুব বেশি ক্ষতিকর হবে না এবং সেক্ষেত্রে তাদেরকে রক্ষা করা আমাদের নৈতিক বাধ্যবাধকতার মধ্যে পড়ে। কিন্তু উক্ত এলিয়েন যদি আমাদের জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়ায় তবে তাদেরকে রক্ষা করার বাধ্যবাধকতা থাকবে না।

হারগ্রভ মনে করেন যে, আমরা কোন প্রজাতি কিংবা বাস্তুতন্ত্রকে স্নেহ করি, ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি কেননা তা উক্ত প্রজাতির সুরক্ষার জন্য আমাদের নৈতিক বাধ্যবাধকতা। তবে কেউ কেউ দাবি করেন যে প্রজাতির প্রতি আমাদের কোন নৈতিক বাধ্যবাধকতা থাকতে পারে না। কেননা তারা আমাদেরকে ভয় দেখায় কিংবা ঘৃণা করে। উদাহরণস্বরূপ, হাঙ্গর মানুষকে ভয় দেখায়, ঘৃণা করে এবং বেশিরভাগ মানুষ সাপকে ভয় পায়, পছন্দ করে না কিংবা সম্মান করে না। কেবল এগুলোর জন্য তাদের প্রতি আমাদের কোন নৈতিক বাধ্যবাধকতা থাকবে না তা সত্যিই অযৌক্তিক। লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, অধিকাংশ মানুষই হাঙ্গরের বাস্তুসংস্থানের প্রতি ইতিবাচক প্রভাবগুলোকে অবলোকন করে না।[৭৮]যদিও অনেকের মধ্যে এ হাঙ্গরগুলোর প্রতি উদাসীনতা রয়েছে তবুও এটা বলতে হবে যে, বাস্তুতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখার জন্য হাঙ্গরের ভূমিকা রয়েছে। এ হাঙ্গরগুলো সমুদ্রের মধ্যে যে বাস্তুতন্ত্র রয়েছে তাকে সুসামঞ্জস্য করে রাখে। তাই তাদেরকে রক্ষা করতে হবে। গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, নরটনের দুর্বল মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি হারগ্রভের এ অবস্থানকে কাটিয়ে উঠতে পারে নি। নরটন কিভাবে এ ধরণের প্রজাতিগুলোর মূল্য দিবে যেগুলোর মধ্যে কোন নান্দনিক কিংবা সাংস্কৃতিক মূল্য নেই? মূলতঃ হারগ্রভ এর মানবকেন্দ্রিক স্বতঃমূল্য এবং নরটনের বিবেচিত ব্যবহারিক মূল্য (Considered instrumental Value) এর মধ্যকার পার্থক্য হলো হারগ্রভ দাবি করেন যে,

আমাদের কাছে অ-মানব প্রাকৃতিক সত্তার মূল্য আছে। যেখানে নরটন বলেন যে এ ধরণের মূল্য দেওয়াটাই হল কোন কিছু থেকে ব্যবহারিক বা সুবিধা পাওয়ার সমার্থক।

২.৪.২.৩ টিম হেওয়ার্ড এর দুর্বল মানবকেন্দ্রিকতাবাদঃ

টিম হেওয়ার্ড (Tim Hayward ১৯৫৫-) এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশগত রাজনৈতিক তত্ত্বের একজন অধ্যাপক। তিনি মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষিতে পরিবেশ নীতিমালাগুলোকে সমর্থন করেন। তিনি তাঁর বিখ্যাত Ecological Thought নামক গ্রন্থে এবং Anthropocentrism: A Misunderstood Problemপ্রবন্ধে এই মানবকেন্দ্রিকতাবাদের কথা বলেন। তিনি বলেন যে, নীতিবিদ্যায় মানবকেন্দ্রিক ধারণাটিকে সাধারণত আত্মস্বার্থকেন্দ্রিকতাবাদের সাথে তুলনা করা হয়।[৭৯] কেননা ব্যক্তির ক্ষেত্রে এটিকে আত্মকেন্দ্রিকতার কারণে সমালোচনা করা হয় আর সমষ্টিগত দিক থেকে মানবকেন্দ্রিক বলা হয়। কিন্তু হেওয়ার্ড মনে করেন যে, মানবকেন্দ্রিকতাবাদ মানুষ-কেন্দ্রিক হওয়ার কারণেই সমালোচিত হতে পারে না। বরং আমরা দেখি যে মানুষের পক্ষে মানবকেন্দ্রিকতাবাদকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। কেননা মানুষ হিসাবে আমরা যখনই কোন কিছুকে মূল্য দিই সবক্ষেত্রেই তা আমরা মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকেই দিয়ে থাকি। তিনি আরও বলেন , এমনকি আমরা যখন একটি বাদুর, একটি গাছ কিংবা একটি পাহাড়কে অবলোকন করি তখনও তা মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখার চেষ্টা করি। তাই তিনি মনে করেন এ ধরণের মানবকেন্দ্রিকতাবাদ অপরিহার্য এবং অনাপত্তিযোগ্য।[৮০] অর্থাৎ পৃথিবীর যেকোন প্রজাতি তার নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকেই সবকিছুকে পর্যবেক্ষণ করে। তাই মানুষের জন্য তার নিজের দিক থেকে চিন্তা না করাটা অসম্ভব। হেওয়ার্ড এর মতে, আত্মপ্রেম (Self-Love) মানে এই নয় যে কেবল নিজেকেই ভালবাসা বরং অন্যকে ভালবাসার পূর্বশর্ত হিসাবে এটাকে বিবেচনা করা যেতে পারে। তাই মানুষ যদি তার নিজের প্রতি, সহমানুষদের প্রতি সৌম্যরূপে আচরণ করতে পারে তবে সে অন্য প্রজাতির প্রতিও শালীনভাবে আচরণ করতে সক্ষম হবে, এদিক থেকে মানবকেন্দ্রিকতাবাদ মোটেও সমস্যার বিষয় নয়।

হেওয়ার্ড লক্ষ্য করেন যে, পরিবেশগত নীতিবিদ্যায় এবং পরিবেশগত রাজনীতিতে মানবকেন্দ্রিকতাবাদের শিরোনামে যে আপত্তি জানানো হয় তা হল এ মতবাদে অন্যান্য প্রজাতির স্বার্থকে বাদ দিয়ে মানুষের স্বার্থকে নিয়ে চিন্তা করা হয়। তাছাড়া তিনি লক্ষ্য করেন যে, মানবকেন্দ্রিকতাবাদের বিরুদ্ধে প্রজাতিবাদ ও অন্ধ-মানবস্বাজাত্যবাদের (Human Chauvinism)

অভিযোগ উত্থাপন করা হয়। কিন্তু এ দুটি মতবাদকে বস্তুত মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে নৈতিকভাবে অযথার্থ ও পরিত্যাজ্য বলে তিনি মনে করেন। প্রজাতিবাদকে লিঙ্গবাদ (Sexism) এবং বর্ণবাদ (Racism) এর সাথে তুলনা করা যায়। কেননা এটি প্রজাতির ভিত্তিতে নির্বিচারে বৈষম্য সৃষ্টি করে।[৮১] মূলতঃ যে মতবাদ মানব প্রজাতির শ্রেষ্ঠত্বের ধারণার ভিত্তিতে মানুষকর্তৃক অ-মানব প্রাকৃতিক সত্তার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করে, অ-মানব প্রাণীকে শোষণ করার অনুমোদন দেয় সে মতবাদকে প্রজাতিবাদ বলা হয়।[৮২]

অনেকে মানবকেন্দ্রিকতাবাদকে আবশ্যিকভাবে প্রজাতিবাদী বলে মনে করেন। তাদের অভিযোগ, এ মতবাদ একমাত্র মানুষকেই নৈতিক মূল্যে মূল্যবান মনে করে এবং এর ভিত্তিতে স্বেচ্ছাচারীভাবে মানুষের স্বার্থকে অন্যান্য প্রজাতির স্বার্থের তুলনায় বেশি প্রাধান্য দেয়। এ মতবাদ মানুষকে স্বতঃমূল্যে মূল্যবান মনে করে পক্ষান্তরে অ-মানব প্রাকৃতিক সত্তার স্বতঃমূল্যকে অস্বীকার করে এবং এদেরকে কেবল ব্যবহারিক মূল্যে মূল্যায়িত করে। ফলে এ ধরণের আচরণ অবশ্যই প্রজাতিবাদী। হেওয়ার্ড বলেন যে, একজন ডাক্তার, রোগীর সুস্থতার জন্য তার শরীরের দিকে খেয়াল রাখে। এটি খুবই স্বাভাবিক এবং প্রয়োজনীয় বিষয়। তবে আরও বেশি প্রয়োজনীয় বিষয় হলো ডাক্তারকে মনে রাখতে হবে যে রোগীও একজন ব্যক্তি, তিনি যথেষ্ট সম্মানের অধিকারী। একইভাবে আমরা যখন অ-মানব প্রাকৃতিক সত্তার সাথে আচরণ করব তখনও তাদের প্রতি শ্রদ্ধা, স্নেহ দিয়েই আচরণ করবো। যদি বিষয়টিকে অস্বীকার করা হয় তবে তা প্রজাতিবাদী।

আবার অন্ধ-মানবস্বাজাত্যবাদ প্রজাতিগত কারণে মানুষকে উৎকৃষ্ট এবং অ-মানব প্রাণীকে মানুষের চেয়ে নিকৃষ্ট শ্রেণীর জীব হিসাবে বিবেচনা করে। দুই ধরণের অন্ধ-মানবস্বাজাত্যবাদ পরিলক্ষিত হয়– সবল অন্ধ মানবস্বাজাত্যবাদ ও দুর্বল অন্ধ-মানবস্বাজাত্যবাদ।[৮৩]

সবল অন্ধ- মানবস্বাজাত্যবাদ অনুসারে নৈতিকতা ও মূল্য কেবল মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অ-মানব প্রকৃতিকে কেবল মানুষের স্বার্থ সংরক্ষণের উপায় হিসাবে ব্যবহার করা হবে। অপরদিকে দুর্বল অন্ধ-মানবস্বাজাত্যবাদ অনুসারে মানুষের পাশাপাশি অ-মানব প্রকৃতিরও নৈতিক মূল্য রয়েছে। তবে অ-মানব সত্তার স্থান মানুষের চেয়ে নিম্নতর। গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, অন্ধ-মানবস্বাজাত্যবাদের সবল দিকটি অ-মানব প্রাণীকে কেবল ব্যবহারিক মূল্যে মূল্যায়িত করে। অন্যদিকে, দুর্বল দিকটি অ-মানবকে নৈতিক বিবেচনার অন্তর্ভূক্ত করলেও প্রজাতিগত কারণে মানুষকে উচ্চতর নৈতিকমূল্যে মূল্যবান মনে করে এবং অগ্রাধিকার দেয়।

বস্তুতঃ টিম হেওয়ার্ড মনে করেন যে, মানবকেন্দ্রিকতাবাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ (প্রজাতিবাদ ও অন্ধ-মানবস্বাজাত্যবাদ) গ্রহণযোগ্য নয়। তাই তিনি তাঁর বিখ্যাত Ecological Thought গ্রন্থে অন্য একধরনের দুর্বল মানবকেন্দ্রিকতাবাদের কথা বলেন। তিনি এটিকে আলোকিত আত্ম-স্বার্থ-এর মাধ্যমে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করেন এবং বিশ্বাস করেন যে পরিবেশ নীতিবিদ্যা এ ধরণের আলোকিত আত্মস্বার্থের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। তিনি যুক্তি দেন যে, মানুষের আত্মোন্নয়ন মানে এই নয় যে, মানুষ দ্বারা প্রকৃতির উপর আধিপত্য, শোষণ, অবাধ ধ্বংস সাধন করা হবে বরং মানুষ এবং প্রকৃতি দুটিরই স্বার্থকে দেখতে হবে। আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে, মানুষ এবং অ-মানব সত্তা উভয়ের স্বার্থকে বিবেচনা করাই হলো মানুষের সবচেয়ে উত্তম স্বার্থ। যদি মানুষকে ভালভাবে বেঁচে থাকতে হয় তবে তাদেরকে অবশ্যই প্রকৃতির সাথে সোহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক রাখতে হবে। প্রকৃতির স্বাস্থ্য ভাল থাকলে মানুষ ভাল থাকবে। তাই প্রকারন্তরে মানুষের স্বার্থকে সমুন্নত রাখার জন্যই প্রকৃতিকে রক্ষা করে এর স্বাস্থ্য ও স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করতে হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে সত্য যে, বর্তমানে বেশিরভাগ মানুষই এ বিষয়েটিকে উপলব্ধি করতে পারছে না।

হেওয়ার্ড মানবতাবাদের (Humanism) বিরুদ্ধে উত্থাপিত সমালোচনার বিরোধিতা করেন। সাধারণত ধারণা করা হয় মানবতাবাদীরা মানুষের উন্নয়নকে গুরুত্ব দেয় যা চূড়ান্তভাবে আত্মকেন্দ্রিকবাদে পর্যবসিত হয়। কিন্তু হেওয়ার্ড বলেন যে, আত্মকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি কোন সমস্যা নয়। এক্ষেত্রে তিনি আত্ম-প্রেম (Self-Love) এবং স্বার্থপরতার (Selfishness) মধ্যকার পার্থক্য তুলে ধরেন। তিনি যুক্তি দেন যে, আত্মপ্রেম এবং স্বার্থপরতা অভিন্ন নয়। তিনি মনে করেন যে, যদি কেউ নিজেকে ভালবাসে তাহলে সে অবশ্যই অন্যের স্বার্থকেও অনুধাবন করতে পারে। তাঁর মতে, আলোকিত আত্ম-স্বার্থ অন্যের ভালকে জানার উৎসাহ যোগায় এবং মনে করে যে, যদি কেউ তার ভাল উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে পারে তাহলে সে অন্যদের ভালকেও উপলব্ধি করতে পারবে।[৮৪] এর কারণ হলো পারস্পরিক সহযোগিতা ছাড়া সর্বোচ্চ স্বার্থকে সংরক্ষণ করা সম্ভব নয়।

হেওয়ার্ড বলেন যে, মানুষের শোষণমূলক এবং ভোগবাদী মনোভাব প্রকৃতি এবং মানুষের উভয়ের জন্যই ক্ষতিকর। বাজার অর্থনীতিতে মানুষ নিজেদেরকে পণ্য হিসেবে বিবেচনা করে। হেওয়ার্ড বিশ্বাস করেন যে আলোকিত আত্মস্বার্থ মানব প্রকৃতির পণ্যকরণ (Commodification) অতিক্রম না করলে সম্ভব না।

হেওয়ার্ড এর আলোকিত আত্মস্বার্থ দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে অ-মানব প্রাকৃতিক সত্তা নৈতিক বিবেচনা বা নৈতিক আচরণের আওতাধীন। নীতিবিদ্যার আত্মস্বার্থবাদের সাথে হেওয়ার্ড এর আলোকিত আত্মস্বার্থবাদের ভিন্নতা রয়েছে। আত্মস্বার্থবাদ অন্যের ভাল-মন্দ বিচার বিবেচনা না করেই নিজের স্বার্থকে সবসময় প্রাধান্য দেয়। কিন্তু আলোকিত আত্ম-স্বার্থবাদ দৃষ্টিভঙ্গি অন্যের স্বার্থকে বিবেচনা করাকে যুক্তিযুক্ত ও ন্যায়সঙ্গত মনে করে। একইভাবে অন্ধ-মানবস্বাজাত্যবাদীরা কেবল মানুষকে স্বতঃমূল্যের অধিকারী এবং নৈতিক বিবেচনাধীন মনে করেন। তাদের কাছে অ-মানব প্রকৃতি কেবল ব্যবহারিক মূল্যে মূল্যায়িত। কিন্তু আলোকিত আত্মস্বার্থ দৃষ্টিভঙ্গি পরিবেশ নীতিবিদ্যার এ বিষয়গুলিকে প্রত্যাখ্যান করে এবং ব্যক্তিমানুষকে অন্যের মঙ্গল কামনায় উৎসাহ দিয়ে থাকে। কেননা তারা মনে করে অন্যের ভালো করা ছাড়া কখনও নিজের ভাল করা সম্ভব নয়।

মূলতঃ হেওয়ার্ড অন্ধ-মানবস্বাজাত্যবাদকে মানবকেন্দ্রিকতাবাদের চরম সংস্করণ বলে মনে করেন। তিনি মনে করেন যে, নিজেকে অন্য কোন প্রজাতি থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবাটা এক ধরণের ভুল ধারণা। তাঁর বিশ্বাস যে, প্রকৃতির সবকিছু নিয়েই আমাদের স্বার্থ গঠিত তাই মানুষের পাশাপাশি প্রকৃতিকেও নৈতিক বিবেচনায় আনতে হবে। মূলত হেওয়ার্ডের আলোকিত আত্মস্বার্থবাদের এটি একটি মৌলিক নীতি। হেওয়ার্ড দাবি করেন যে, আমাদের জ্ঞান পরিপূর্ণ নয় তাই আমাদের পরিবেশগত উপলব্ধিকে আরও সুদৃঢ় করার জন্য প্রকৃতির সকল সত্তার মধ্যে আন্তঃনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি করতে হবে। তিনি বলেন যে, আলোকিত আত্মস্বার্থের বিষয়টি মানবকেন্দ্রিকবাদীরা বিশেষ করে দুর্বল মানবকেন্দ্রিকতাবাদীরা উপলব্ধি করতে পারবে । কিন্তু সবল মানবকেন্দ্রিকতাবাদীরা এর থেকে ভিন্ন কেননা তারা অ-মানব প্রাকৃতিক সত্তাকে নৈতিক বিবেচনার অংশ মনে করে না। হেওয়ার্ড মূলত অ-মানব প্রাকৃতিক সত্তাসমূহের মধ্যে নৈতিক বিবেচনার বিস্তার ঘটিয়ে নৈতিক বিশ্বাসকে প্রসারিত করতে চেয়েছেন। একজন মানবকেন্দ্রিকতাবাদী হিসেবে তিনি মানুষের শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার করেন। তবে দুর্বল মানবকেন্দ্রিকতাবাদী হিসেবে তিনি অনুভব করেন যে, অ-মানব প্রাকৃতিক সত্তাকেও নৈতিক বিবেচনার আওতাধীন করা উচিত। কারণ মানুষের বেঁচে থাকা এবং কল্যাণের জন্য অ-মানব প্রাকৃতিক সত্তার সুস্বাস্থ্য ও স্থায়িত্ব থাকা অপরিহার্য। এ প্রেক্ষিতে হেওয়ার্ড দেখান যে, যদি মানুষ তাদের নিজেদের সর্বোচ্চ স্বার্থের কথা চিন্তা করে তাহলে তারা অ-মানব প্রকৃতিক সত্তার স্বার্থকেও বিবেচনা করবে। কেননা অ-মানব প্রাকৃতিক সত্তাসমূহ ভাল না থাকলেও মানুষও ভাল থাকবে না। মানুষের সুদূরপ্রসারী ভালোর জন্য প্রকৃতির সুদূরপ্রসারী ভালোকে প্রাধান্য দিতে হবে।

পরিশেষে টিম হেওয়ার্ড তাঁর আলোকিত আত্ম-স্বার্থ দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনায় আত্মপ্রেম, স্বার্থপরতা, আত্মস্বার্থবাদ, প্রজাতিবাদ এবং অন্ধ-মানবস্বজাত্যবাদ ইত্যাদি বিষয়গুলোর আলোচনা করেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে, আলোকিত আত্মস্বার্থবাদ একজন মানুষকে অন্য আরেকজন মানুষের সাথে কিংবা অ-মানব প্রাকৃতিক সত্তাসমূহের সাথে এমন ভাল আচরণ করার জন্য অনুপ্রাণিত করে যাতে করে উভয়েই লাভবান হয়।

নরটন, হারগ্রভ এবং হেওয়ার্ড এর দুর্বল মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করে আমরা উপলব্ধি করতে পারলাম যে, এ মতবাদ প্রকৃতির সুরক্ষার জন্য পর্যাপ্ত যুক্তি সরবরাহ করতে পারে। যদিও লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, হারগ্রভের স্বতঃমূল্য এবং নরটনের বিবেচিত ব্যবহারিক মূল্যের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। হারগ্রভ যেখানে বলেন যে, অ-মানব সত্তার আমাদের কাছে মূল্য আছে। যেখানে নরটন দাবি করেন যে এ ধরণের মূল্য দেওয়াটাই হল কোন কিছুর থেকে ব্যবহারিক বা সুবিধা পাওয়ার সমার্থক। আবার হারগ্রভ ও হেওয়ার্ড অ-মানব প্রাকৃতিক সত্তার সমূহকে নৈতিক বিবেচনাধীন দাবি করলেও নরটন তা মনে করেন না। বস্তুতঃ নরটন, হারগ্রভ এবং হেওয়ার্ড এর মধ্যে কিছু বিষয়ে মতদ্বৈততা থাকলেও মানবকেন্দ্রিকতাবাদের একটি বিশ্বাসযোগ্য ও কার্যকর সংস্করণ হিসাবে তিনজনই দুর্বল মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিবেশ রক্ষার হাতিয়ার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন।

২.৫ সবল ও দুর্বল মানবকেন্দ্রিকতাবাদের মধ্যকার পার্থক্যঃ

সবল ও দুর্বল মানবকেন্দ্রিকতাবাদের মধ্যে কিছু মৌলিক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এগুলো হল:

১. সবল মানবকেন্দ্রিকতাবাদ অনুসারে কেবল মানুষ নৈতিক বিবেচনাধীন। অন্যদিকে দুর্বল মানবকেন্দ্রিকতাবাদ মানুষ ছাড়াও অ-মানব সত্তার মধ্যে নৈতিক বিবেচনাকে প্রসারিত করে।

২. সবল মানবকেন্দ্রিকতাবাদ মানুষের প্রয়োজনে শোষণ, কর্তৃত্ব, ভোগ ইত্যাদিকে অনুমোদন করে। যদি তা অ-মানব সত্তার জন্য ধ্বংসাত্মকও হয় তাতেও তারা গ্রাহ্য করবে না। কিন্তু দুর্বল মানবকেন্দ্রিকতাবাদ এগুলোর বিরোধিতা করে। তাদের মতে ভোগ, কতৃত্ব ইত্যাদি অনুমোদিত তবে অ-মানব সত্তাকে নৈতিক বিবেচানায় আনতে হবে।

৩. সবল ও দূর্বল মানবকেন্দ্রিকতাবাদের মধ্যকার বিরোধের মধ্যে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এবং টেকসই ইস্যু অন্যতম । সবল মানবকেন্দ্রিকতাবাদ দাবি করে যে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি মানুষের

কোন দায়বদ্ধতা নেই এবং মানুষের একমাত্র দায়িত্ব হল বর্তমান প্রজন্মের জন্য সুদূরপ্রসারী টেকসই পরিবেশগত সুযোগ সুবিধা সরবরাহ করা। অন্যদিকে দুর্বল মানবকেন্দ্রিকতাবাদীরা যুক্তি দেখান যে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি আমাদের দায়িত্ব আছে। বর্তমান প্রজন্ম যে সম্পদ ব্যবহার করছে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যও ঠিক তাই সংরক্ষণ করতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তবে এটা নিশ্চিত করাটাই যথেষ্ট যে আমরা তাদের জন্য কিছু রেখেছি।

৪. সবল মানবকেন্দ্রিকতাবাদ অনুসারে মানুষের কেবল স্বতঃমূল্য রয়েছে এবং অ-মানব প্রাকৃতিক সত্তা কেবল ব্যবহারিক মূল্যে মূল্যবান। কিন্তু দুর্বল মানবকেন্দ্রিকতাবাদ অনুসারে কেবল মানুষই স্বতঃমূল্যের অধিকারী নয় অ-মানব প্রাকৃতিক সত্তা সমূহেরও স্বতমূল্যও ব্যবহারিক মূল্য থাকতে পারে।

৫. সবল মানবকেন্দ্রিকতাবাদ অ-মানব প্রাকৃতিক সত্তাসমূহকে রক্ষা করাকে সমর্থন করে যেখানে দুর্বল মানবকেন্দ্রিকতাবাদ রক্ষার পাশাপাশি অ-মানব প্রাকৃতিক সত্তার সংরক্ষণকেও সমর্থন করে। রক্ষণবাদীরা প্রাকৃতিক পরিবেশকে শোষণ ও ধ্বংস থেকে রক্ষা করে কেবল এর থেকে বৃহত্তর সুবিধা পাওয়ার জন্য। তারা প্রাকৃতিক সম্পদকে মানুষের স্বার্থকে কার্যকর করার উপায় মনে করে। এজন্য তারা অ-মানব প্রাকৃতিক সত্তাসমূহকে ব্যবহারিকভাবে মূল্যবান মনে করে। অন্যদিকে সংরক্ষণবাদীরা প্রকৃতি শোষণ এবং ধ্বংস থেকে রক্ষা করে কেবল মানুষের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয় বরং অ-মানব প্রাকৃতিক সত্তার নিজেদের জন্যও। তারা মনে করেন যে, অমানব প্রাকৃতিক সত্তাসমূহেরও স্বতঃমূল্য রয়েছে।

৬. নরটন অনুভূত পছন্দের অগ্রাধিকার ও বিবেচিত পছন্দের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সবল মানবকেন্দ্রিকতাবাদ ও দুর্বল মানবকেন্দ্রিকতাবাদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করেন। তাঁর মতে, একটি মূল্যতত্ত্ব সবলভাবে মানবকেন্দ্রিক যদি তা মানুষের অনুভূত পছন্দের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে মূল্যকে সমর্থন করে। অন্যদিকে একটি মূল্যতত্ত্ব দুর্বলভাবে মানবকেন্দ্রিক যদি মানুষের কিছু অনুভূত পছন্দ নিয়ে গঠিত বিবেচিত পছন্দের অগ্রাধিকার দ্বারা সকল মূল্যকে সমর্থন করে।[৮৫]

অনেকে মনে করেন যে, সবল মানবকেন্দ্রিকতাবাাদ ও দুবল মানবকেন্দ্রিকতাবাদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ে। আবার অনেকে দুর্বল মানবকেন্দ্রিকতাবাদ ও অ- মানবকেন্দ্রিকতাবাদকে গুলিয়ে ফেলেন। কেউ কেউ দুর্বল মানবকেন্দ্রিকতাবাদের চরম সংস্করণকে অমানবকেন্দ্রিকতাবাদের

মতোই মনে হয় বলে মনে করেন। কেননা উভয়ের মধ্যে অ-মানব প্রাকৃতিক সত্তাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

এখন আমরা মানবকেন্দ্রিকতাবাদের ত্রুটি এবং মানবকেন্দ্রিকতাবাদকে কাটিয়ে উঠার প্রচেষ্টা হিসাবে বিভিন্ন প্রকার অ-মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিসহ মানবকেন্দ্রিকতার ত্রুটি খন্ডন আলোচনা করে মানবকেন্দ্রিক (সবল ও দুর্বল) দৃষ্টিভঙ্গির সাথে অ- মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য নিরূপন করার চেষ্টা করবো।

২.৬ মানবকেন্দ্রিকতাবাদের সমস্যাঃ

অনেক পরিবেশ চিন্তাবিদ বিশ্বাস করেন যে, প্রকৃতি থেকে মানুষ নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করার কারণে পরিবেশ সংকট দেখা দিচ্ছে। তাদের দাবি মানবকেন্দ্রিকতাবাদ মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে দ্বিবিভাজন (Dichotomy) করার কারণে এ সংকটের সৃষ্টি হচ্ছে। মানবকেন্দ্রিকতাবাদের চরম সংস্করণ অর্থাৎ সবল মানবকেন্দ্রিকতাবাদ অনুসারে মূল্যবোধের সংঘর্ষের পরিস্থিতিতে মানুষের স্বার্থ যতই তুচ্ছ হোক না কেন সে অ-মানব প্রাকৃতিক সত্তার চেয়ে বেশি অগ্রাধিকার পাবে। তাই পরিবেশের ক্ষেত্রে মানবকেন্দ্রিকতাবাদ বিশেষ করে সবল মানবকেন্দ্রিকতাবাদ হুমকি স্বরূপ। তাই অ-মানবকেন্দ্রিকতাবাদীরা এর বেশকিছু সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করে। এগুলো হল:

১. মানবকেন্দ্রিকতাবাদ অনুসারে সমস্ত পরিবেশগত বিষয়গুলো মানুষের স্বার্থের বিবেচনায় রাখা উচিত এবং সমস্ত পরিবেশ নীতিগুলি কীভাবে মানুষকে প্রভাবিত করে তার ভিত্তিতেই মূল্যায়ন করা উচিত। উদ্ভিদ ও প্রাণীসহ অ-মানব প্রকৃতি কেবল মানুষের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিদ্যমান। অর্থাৎ ব্যাপকভাবে বলতে গেলে মানবকেন্দ্রিকতাবাদ হল দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে নৈতিক নীতিমালাগুলি কেবল মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এবং মানুষের চাহিদা ও স্বার্থই হল সর্বোচ্চ এমনকি ব্যতিক্রম, মূল্যবান এবং গুরুত্বপূর্ন।[৮৬] অর্থাৎ কেবল মানুষেরই স্বতঃমূল্য আছে। অ-মানব প্রকৃতির স্বতঃমূল্য নেই, আছে ব্যবহারিক মূল্য।

২. মানবকেন্দ্রিকতাবাদের চরম সংস্করণটি ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ডকে উৎসাহ দেয়।

৩. চরম মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকৃতির উপর মানুষের আধিপত্য, শোষণ এবং ভোগের অনুমতি দেয়। এবং মনে করে যে, এটি কেবল বাস্তব প্রয়োজনই নয় বরং সভ্যতার জন্যও আবশ্যক।

৪. মানবকেন্দ্রিকতাবাদের দুর্বল ও বিশ্বাসযোগ্য সংস্করণটি মানুষের স্বার্থকে অ-মানব স্বার্থের চেয়ে অগ্রাধিকার দেয়। অনেক পরিবেশবিদরা উদ্বেগ প্রকাশ করেন যে, এ ধরনের মানবকেন্দ্রিকতাবাদ স্বার্থবিরোধের সময় সবসময় মানব স্বার্থের পক্ষপাতিত্ব করবে ; অমানবের নয়।

৫. অ-মানবকেন্দ্রিকতাবাদীরা মানবকেন্দ্রিকতাবাদীদেরকে নির্বিচারী মনে করে। কেননা তারা স্বেচ্ছাচারীভাবে এবং বিচারহীনভাবে মানুষের স্বার্থকে গুরুত্ব দেয়। মানুষের বিশেষ মর্যাদাকে দৃঢ় ভিত্তি ছাড়াই দাবি করে। তারা মনে করে যে, একমাত্র মানুষই অনন্য বৈশিষ্ট্যের (লক্ষ্য, আকাঙ্ক্ষা, সচেতনতা, প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা ইত্যাদি) অধিকারী ; যা অ-মানবের মধ্যে নেই।

৬. অ-মানবকেন্দ্রিকতাবাদীরা মানবকেন্দ্রিকতাবাদীদের আধিপত্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করে না। তারা মানুষের স্বার্থকে একচেটিয়াভাবে বিশ্বের সকল মূল্যের গুরুত্বপূর্ণ উৎস বলে মনে করে না। তারা মনে করে যে, মানব সাম্রাজ্যবাদ অযৌক্তিক এবং মানুষ প্রকৃতির অন্যান্য অংশের মতই এবং অ-মানব প্রকৃতির সাথে তেমনই আচরণ করা উচিত যা মানুষের সাথে করা হয়।

৭. অনেকে মনে করেন যে, দার্শনিকভাবে মানবকেন্দ্রিকতাবাদের গভীরতা খুবই কম। এটি মানুষ এবং প্রকৃতির মধ্যে বিচ্ছেদে উৎসাহিত করে।

৮. মানবকেন্দ্রিকতাবাদ মূল্যের দিক থেকেও পূর্ণ নয়। এটা বিশ্বাস করে যে, শুধু মানুষের মূল্য রয়েছে। অ-মানব প্রাণী ও প্রকৃতির কোন মূল্য নেই। কারণ কেবল মানুষেরই লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য আছে, স্বার্থ আছে। কিন্তু বাস্তবে জীবন ও প্রকৃতির কেবল মূল্য নয় স্বার্থও রয়েছে। তারাও বাস্তুসংস্থান বিধি মেনে জীবনযাপন করে থাকে। তাই বলা যায়, জীব ও প্রকৃতি মানুষের হাতিয়ার হিসাবে কেবল মূল্যবান নয় বরং এদের স্বতঃমূল্য রয়েছে।

৯. মানবকেন্দ্রিকতাবাদ নৈতিকভাবে অসম্পূর্ণ। তাদের ধারণা কেবল মানুষ নৈতিক সুবিধা ও অধিকার ভোগ করতে পারবে। তাদের বিশ্বাস যে, মানুষের অনন্য বৈশিষ্ট্যগুলো যেমন, আত্মচেতনা, আত্মনিয়ন্ত্রণ, প্রজ্ঞা এবং ভাষার দ্বারা যোগাযোগের ক্ষমতা ইত্যাদি তাদের নৈতিকভাবে আচরণ করার ভিত্তি। এক্ষেত্রে সমালোচকরা বলেন যে, কিছু মানুষ যেমন, শিশু, প্রতিবন্ধী, আলঝেইমার রোগীর মধ্যে উপরোক্ত সক্ষমতাগুলো থাকে না। তাছাড়া বুদ্ধি,

আত্মচেতনা মানুষ ও কিছু প্রাণীর মধ্যেও রয়েছে। সুতরাং এ ধরণের নৈতিক মূল্য জীবন ও প্রকৃতির মধ্যে আরও পরিব্যপ্ত করা উচিত।

১০. ব্যবহারিকভাবে মানবকেন্দ্রিকতাবাদ মানবজাতিকে একটি কঠিন পরিস্থিতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে বলে অনেক পরিবেশ দার্শনিক মনে করেন। তাদের ধারণা মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি মানুষকে উপযোগবাদী, স্বার্থপর, ভোগবাদী, ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদী ইত্যাদি হওয়ার জন্য প্রতিনিধিত্ব করে। অর্থনৈতিক উন্নয়নে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিই একমাত্র লক্ষ্য থাকে, এর ফলে পরিবেশের উপর বিশ্বব্যাপী দুষণ ও সম্পদগুলোর ঘাটতি বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর এ ক্ষেত্রে সবাই মানবকেন্দ্রিকতাবাদকে দায়ী করছেন।

১১. কোন কোন দার্শনিক বিশ্বাস করেন যে মানুষ ও অ-মানবের মধ্যে নৈতিক সম্পর্কের জন্য মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নৈতিক আত্মস্বার্থবাদ মতবাদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। নৈতিক আত্মস্বার্থবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে একটি পৃথক মানুষ ও অন্য মানুষগুলির সাথে সম্পর্ক এক ধরণের নৈতিক সম্পর্ক।[৮৭] এটি অন্যের স্বার্থের চেয়ে নিজের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়ার বা অন্যের স্বার্থকে যতক্ষন নিজের স্বার্থের সাথে সম্পর্কিত ততক্ষন বিবেচনা করার পরামর্শ দেয়। সুতরাং যখন নৈতিক আত্মস্বার্থবাদ একটি ব্যক্তির স্বার্থকে প্রাথমিক লক্ষ্য হিসাবে নির্ধারণ করে মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি সেখানে মানুষের লক্ষ্য হিসাবে মানুষের স্বার্থকে নির্ধারণ করে। এভাবে মানুষকে মানুষের সাথে এবং অ-মানবকে মানুষের সাথে প্রতিস্থাপন করে আমরা মানবকেন্দ্রিক ও নৈতিক আত্মস্বার্থবাদের মধ্যে সাদৃশ্য তৈরী করতে পারি। তাই নৈতিক আত্মস্বার্থবাদ ও মানবকেন্দ্রিক সমস্যাগুলি একই। যে ব্যক্তি নৈতিক আত্মস্বার্থবাদের মতবাদ অনুসরণ করে তার বিরুদ্ধে স্বার্থপরতার অভিযোগ আনা হয়। একই ভাবে, মানবকেন্দ্রিকতাবাদ হল এক ধরনের স্বার্থপরতা।

১২. যদি কোন কাজের ব্যবহারিক ফল বিবেচনা না করে, সঠিক কারণের জন্য কিছু করা হয় তবে তা গুরুত্বপূর্ণ ফল বয়ে আনবে। একজনকে কেবল সঠিক কাজটিই করা উচিত নয়, ক্যালিকটের ভাষায় "কাজ করার সঠিক কারণ" থাকতে হবে।[৮৮] এ বিষয়টিতে কান্টের দৃষ্টিভঙ্গি প্রযোজ্য। তাঁর মতে, নৈতিকতা হল সদিচ্ছা। কোন ভাল ফলাফল অর্জন করতে না পারলেও তা নৈতিকতা সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে। উদাহরণস্বরূপ: আমরা কোনটি পছন্দ করব ? একজন বন্ধু আপনার সুসময়ে খুবই সাহায্য করছে এ ভেবে যে আগামী দিনে তাকে কেবল বন্ধুত্বের নামে আর্থিক সহায়তা দিবেন। বিকল্পভাবে, আপনার বস আপনারসহ

তার কর্মীদের কফি বিরতি সরবরাহ করেন এ কারণে যে এটি আপনার অধিকার। কারণ যদি আপনি অনেক ক্লান্ত হয়ে পড়েন তবে দক্ষতার সাথে কাজ করতে পারবেন না। ফলাফলস্বরূপ, মানুষের কাছে অ-মানবের কেবল যন্ত্রতুল্য মূল্যের জন্য মূল্যবান মনে করা সঠিক অনুপ্রেরণা হতে পারেন না। সুতরাং মানবকেন্দ্রিকতাবাদ (দূর্বল নয়,সবল মানবকেন্দ্রিকতাবাদ) সঠিক কারণ সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়।

১৩. আমরা কোন কিছু সঠিক কারণের জন্য করতে হবে তা আন্তঃমানব নৈতিকতার (Interhuman Ethics) দৃষ্টিকোণ থেকে পরীক্ষা করে দেখতে পারি। এটি জিজ্ঞাসা করতে পারি (প্রকৃতপক্ষে, এটি বহু শতাব্দী ধরে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল) কেন শেতাঙ্গদের সাথে কৃষ্ণাঙ্গদের সমান অধিকার থাকা উচিত? কেন আমরা তাদের সমানভাবে বিবেচনা করব? কিসের ভিত্তিতে বা কেন আমরা নারী ও পুরুষকে সমান বিবেচনা করি? আমরা কেন নারীর অধিকার, তাদের কাজের অধিকার, সমান বেতন ইত্যাদির জন্য লড়াই করব? কোন মহিলার ঘরে বসে থাকার পরিবর্তে কেন কাজ করা দরকার এবং তাদের সন্তানের যত্ন নিতে হবে? কিংবা যদি তাদের বাবা তাদের চাহিদা পূরণ করে মেয়েদের কি শিক্ষার জন্য স্কুলে যাওয়ার দরকার আছে ? ফলস্বরূপ প্রশ্ন করা কেন আমাাদের অ- মানবকেন্দ্রিক নীতিবিদ্যার জন্য প্রচেষ্টা করা উচিত? বা যতক্ষন না মানুষ অ-মানব ও পরিবেশের সংরক্ষণের জন্য অ-মানবদের স্বতঃমূল্যকে ন্যায্যতা দিচ্ছে সেসকল চেষ্টা করা উচিত। নীতিগতভাবে মানবকেন্দ্রিকতাবাদ অ-মানব এর সাথে যা করছে উপরে প্রশ্নগুলির সাথে এ প্রশ্নের মিল রয়েছে। সমাজে স্বামী বা পিতারা নারীদের সাথে তাই করছে। দুটিই সমস্যামূলক।

১৪. মানবকেন্দ্রিকতাবাদের ‘অনুমিত’ মূল্যায়ন নিম্নের উদাহরণের সাথে মিল আছে। যেমন দুটি মহিলা একই বাড়িতে থাকেন, একজন হলেন বাড়ির মালিক, অন্যজন বাচ্চাদের আয়া। মানবকেন্দ্রিকতাবাদ অ-মানবকে প্রতিশ্রুতি দেয় এ দুটি মহিলার অবস্থানের মতো। উভয়ই একই বাড়িতে অবস্থান করতে পারে। একই টেবিলে খাবার খেতে পারে, একই খাটে বসে থাকতে পারে। একই ক্রিয়াকলাপগুলোতে অংশগ্রহণ করতে পারে। কিন্তু যখনই তাদের মধ্যে কোন স্বার্থের দ্বন্দ্ব তৈরী হয় তখন বাড়িওয়ালার অবস্থানই উচ্চতর। বাড়ির মালিক এবং আয়ার মধ্যে তুলনা করলে যিনি কোন দ্বিধা ছাড়াই যেকোন বিষয়ে ছাড় দিবেন তিনি হলেন আয়া। ফলস্বরূপ, অ-মানব ও প্রকৃতির ক্ষেত্রে মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি তাদের প্রাপ্য মূল্য প্রদান করতে পারে না। সুতরাং প্রকৃতির প্রতি মানবকেন্দ্রিক মনোভাব থেকে পৃথক কিছু

প্রয়োজন। ক্যালিকটের বক্তব্য অনুসারে কিছু পরিণত নীতিবিদ যেমন টম রেগান মানবকেন্দ্রিক মতবাদকে পরিবেশগত নীতিবিদ্যা হিসেবে অস্বীকার করেন। রেগান বরং এটিকে একটি 'ব্যবস্থাপনা নীতি', প্রকৃত পরিবেশগত নৈতিকতার বিপরীতে একটি পরিবেশ নীতি হিসাবে ব্যবহার করেন।[৮৯]

১৫. এ মতবাদ কেবল মানুষেরই স্বতঃমূল্যের কথা বলে। কিন্তু সমতার নীতি তখনই অর্থপূর্ণ হবে যদি আমরা মনে করি যে প্রতিটি প্রজাতি নিজ অস্তিত্বের মর্যাদা দান করার জন্য অন্য প্রজাতিকে নিঃশেষে করবে না অথবা স্বসত্তার অস্তিত্বের জন্য অন্য প্রজাতির কোন ক্ষতি সাধন করে নিজ স্বার্থকে রক্ষা করবে না।

অ-মানবকেন্দ্রিকতাবাদীরা মানবকেন্দ্রিকতাবাদীদেরকে প্রশ্নবিদ্ধ করে এভাবে যে, অমানবের চেয়ে মানুষের স্বার্থ কোন ভিত্তিতে উন্নত ? আমরা যদি ধর্মীয় যুক্তিগুলি যেমন, মানুষ হল ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি তাই তার উচ্চমূল্য, এ ধরনের ধারণাকে বাদ দিই তাহলে মানবকেন্দ্রিকতাবাদে মানুষেরই কেবল স্বতঃমূল্য আছে তা যুক্তি দিয়ে উপস্থাপন করতে সমস্যায় পড়বে বলে অ- মানবকেন্দ্রিকতাদীরা মনে করে। তাদের মতে, আত্মচেতনা, বুদ্ধি, আত্ম-নিয়ন্ত্রণ, যোগাযোগের ক্ষমতা ইত্যাদি মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের গ্রহণযোগ্য কারণ হতে পারে না। বরং এই কারণগুলি কিছু কিছু মানুষকে নৈতিক ক্ষেত্র থেকে দূরে রাখে। যেমন, মানসিকভাবে অসুস্থ ব্যক্তি, নবজাতক, কোমায় থাকা ব্যক্তি ইত্যাদি। ইমান্যুয়েল কান্ট নৈতিকতার উপর ভিত্তি করে প্রকৃতির অন্যান্য সমস্যাগুলির তুলনায় মানুষের উচ্চতর নৈতিক মর্যাদাকে ন্যায্যতা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। পিটার সিঙ্গার, কান্টের এ যুক্তিকে ত্রুটিপূর্ণ বলে মনে করেন।[৯০] তিনি বলেন, যদি নৈতিক যুক্তি এবং স্বশাসন (Autonomy) এর মতো উচ্চতর পরিশীলিত ক্ষমতা মানুষকে আত্মচেতনাযোগ্য কিংবা নিজেই নিজের লক্ষ্য নির্ধারক হিসেবে নির্দেশ করে, তবে তা সকল ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা সকল মানুষই যুক্তিবাদী নয়। পিটার সিঙ্গার এ প্রসঙ্গে আরও বলেন যে, কিছুলোক এতটা গভীরভাবে মানসিক প্রতিবন্ধী হতে পারে যে তারা যুক্তিবাদী মানুষ হিসাবে যোগ্যতা অর্জন করবে না। সিঙ্গার এর দাবি, মানুষ হিসেবে জন্মের কারনেই স্বতঃমূল্যে মূল্যায়িত করা যায় না। অর্থাৎ মানুষ হিসেবে স্বপ্রমাণিত মানদন্ড আছে মনে করে স্বতঃমূল্য ধারণ করা উচিত নয়।

রিচার্ড সিলওয়ান (Richard Sylvan) এবং ভাল প্লামউড (Val Plumwood)[৯১] তাদের "Human Chauvinism and Environmental Ethics" নামক নিবন্ধে বলেন যে, পরিবেশ

নীতিবিদ্যায় অ-মানব প্রাকৃতিক সত্তাকে অবশ্যই তাদের নিজস্ব অধিকার দ্বারাই নৈতিক বস্তু হিসাবে বিবেচনা করা দরকার। তাঁরা দাবি করেন যে, 'মানুষই কেবল নৈতিক বিবেচনাধীন' পশ্চিমা নীতিবিদ্যার এ ধরণের মানসিকতা স্বাজাত্যবাদী।[৯২] এক্ষেত্রে রাউটলি 'শেষ মানুষ যুক্তি' (Last man Argument) উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, ধরি, এমন একসময় আসল বিশ্বের কেবল একটি মানুষই অবশিষ্ট আছে এবং সে জানে খুব শীঘ্রই মারা যাবে। মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে মারা যাওয়ার পূর্বে উক্ত ব্যক্তি যদি সমস্ত অ-মানব প্রাকৃতিক সত্তাসমূহকে ধ্বংস করে দেয় তবে তা ভুল হবে না কেননা মানুষ ছাড়া পৃথিবীর কোন মূল্য নেই। কিন্তু অ-মানবকেন্দ্রিকতাবাদীরা মনে করে যে, যখন কোন কিছুর উপর স্বতঃমূল্য আরোপ করা হয় তখন সেটাকে ধ্বংস করা থেকে বিরত থাকতে হয় কেননা তার অস্তিত্ব আমাদের উদ্দেশ্য সাধনে কাজে লাগতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, একটি গাছের উপর যদি স্বতঃমূল্য আরোপ করা হয় তখন সেটাকে ধ্বংস করা থেকে বিরত থাকতে হয় কেননা তার অস্তিত্ব আমাদের উদ্দেশ্য সাধনে কাজে লাগতে পারে। একটি গাছের উপর যদি স্বতঃমূল্য আরোপ কথা হয় তাহলে এটা ভাবা যাবে না যে, আমার মৃত্যুর পর গাছটি মূল্য হারাবে বা ধ্বংস হয়ে যাবে।

রিচার্ড সিলওয়ান এবং ভাল প্লামউড যুক্তি দেন যে, পরিবেশগত নীতিবিদ্যার ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধান (Stewardship) অবস্থান এবং সহযোগীতামূলক অবস্থান (Cooperative Position) এর ভিত্তিতে যে মতবাদগুলো গড়ে উঠেছে সেগুলোও অপর্যাপ্ত কেননা এগুলো মূলত মানবকেন্দ্রিক মতবাদেরই পক্ষপাতিত্ব করে। তত্ত্বাবধানবাদী দিকটি মানুষকে প্রকৃতির যেন আরও বেশি উৎপাদনশীল হয় এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের সম্পদ যেন হ্রাস না পায় সেজন্য উৎসাহ দেয়। অন্যদিকে সহযোগিতামূলক অবস্থানটি প্রকৃতির বিকাশ তথা নিখুঁত প্রকৃতির কথা বলে যা মূলত মানুষের প্রয়োজন এবং স্বার্থ পূরণের জন্য ব্যবহার করা হবে। তাই তারা মনে করেন যে, এ ধরণের অবস্থাও মানবকেন্দ্রিক পক্ষপাতমুক্ত নয় এবং এগুলোও শোষণমূলক।

কখনও কখনও অন্ধ-মানবস্বাজাত্যবাদ ও মানবকেন্দ্রিকতাবাদকে অভিন্ন অর্থে বিবেচনা করা হয়।[৯৩] মানবকেন্দ্রিকতাবাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ হল পাশ্চাত্য নীতিবিদ্যার মধ্যে এক ধরনের অন্ধ-মানবস্বাজাত্যবাদী ধারণা রয়েছে। লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, বেশিরভাগ পাশ্চাত্য নৈতিক মতবাদগুলো মানুষের স্বার্থসংরক্ষণকে প্রাধান্য দেয়। পক্ষান্তরে এসব মতবাদগুলো অ-মানব প্রাকৃতিক সত্তাসমূহকে নৈতিক বিবেচনার যোগ্য বলে মনে করে না। তাই কিছ কিছু দার্শনিক অভিযোগ করেন

যে, পাশ্চাত্য নীতিবিদ্যার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অন্ধ-মানবস্বজাত্যবাদের যে অভিযোগ তা মানবকেন্দ্রিকতার বিরুদ্ধেও প্রযোজ্য।[৯৪]

যাই হোক, অনেক পরিবেশবিদের উদ্দেশ্য হল কেবল অ-মানব প্রাণীর জীবন রক্ষার উপায় কিংবা পরিবেশগত সম্পদের উপযুক্ততা খুঁজে বের করা নয় বরং অ-মানব সত্তার অস্তিত্বকে নৈতিক ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত করা। মানবকেন্দ্রিক মতবাদ নৈতিক ক্ষেত্রের মধ্যে কেবল মানুষকে অন্তর্ভূক্ত করে এবং অ-মানব সত্তাকে উপায় হিসাবে মূল্যবান মনে করে। সুতরাং স্বার্থের বিরোধের ক্ষেত্রে অ-মানব সত্তার স্বার্থকে কম গুরুত্ব দেয়া হয়। যদি দুটি পক্ষের মধ্যে কোন পক্ষের স্বার্থগুলিকে সর্বদা অন্যের স্বার্থের তুলনায় উচ্চতর ভাবা হয় তবে সে সম্পর্ক ন্যায্য সম্পর্ক হতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, যখন কোন ব্যক্তির স্বার্থে গাছ কেটে ফেলার কথা আসে তখন মানবকেন্দ্রিকতাবাদীরা কোন প্রকার প্রশ্ন না করেই মানুষের স্বার্থকে সর্বদা বেশি অগ্রাধিকার দিবে। তবে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে মানবকেন্দ্রিকতাবাদের দুটি রূপ আছে সবল ও দুর্বল দিক। কেবল সবল মানবকেন্দ্রিকতাবাদীদের সমস্যা হল অ-মানব প্রাকৃতিক সত্তাসমূহকে নিছক যন্ত্রস্বরূপ মূল্যায়ন করা। কিন্তু পরিবেশ সুরক্ষার জন্য দুর্বল মানবকেন্দ্রিকতাবাদীরা এ ধরণের কাজে থেকে বিরত থাকে। আমরা এ বিষয়ে উপসংহারে আলোচনা করবো।

২.৭ অ- মানবকেন্দ্রিকতাবাদঃ

মানবকেন্দ্রিকতাবাদের বিপরীত মতবাদ হলো অ- মানবকেন্দ্রিকতাবাদ। এ মতবাদ অনুসারে, কেবল মানুষ নয়, মানুষসহ অন্যান্য অ-মানব প্রাকৃতিক সত্তাসমূহও নৈতিক বিবেচনাধীন। রিচার্ড সিলওয়ান এবং ভাল প্লামউড তাঁদের Human Chauvinism and Environmental Ethics" নামক নিবন্ধে বলেন যে, পরিবেশ নীতিবিদ্যায় অ-মানব প্রাকৃতিক সত্তাকে অবশ্যই তাদের নিজস্ব অধিকার দ্বারাই নৈতিক বস্তু হিসাবে বিবেচনা করা আবশ্যক। তাঁরা দাবি করেন যে, মানুষই কেবল নৈতিক বিবেচনাধীন এবং কেবল তারাই স্বতঃমূল্যে মূল্যবান নয় বরং অ-মানব প্রাকৃতিক সত্তাসমূহও নৈতিক বিবেচনার অন্তর্ভূক্ত এবং তাদেরও স্বতঃমূল্য রয়েছে। এ ধরণের দৃষ্টিভঙ্গি হল অ-মানবকেন্দ্রিক। প্রাণকেন্দ্রিক নীতিবিদ্যা ও বাস্তুকেন্দ্রিক নীতিবিদ্যা হলো অ-মানবকেন্দ্রিক নীতিবিদ্যার যথার্থ উদাহরণ। প্রাণকেন্দ্রিক নীতিবিদ্যায় যাদের প্রাণ আছে তাদের সবাই নৈতিক বিবেচনাধীন বলে গণ্য করে।

নিম্নে আমরা মানবকেন্দ্রিকতাবাদকে কাটিয়ে উঠার প্রচেষ্টা হিসেবে যেসকল অ-মানবকেন্দ্রিক মতবাদগুলো গড়ে উঠেছে সেগুলো আলোচনাপূর্বক তাদর ত্রুটি খন্ডনের মাধ্যমে প্রমাণ করার চেষ্টা করবো যে মানবকেন্দ্রিকতাবাদ পরিবেশের জন্য সহায়ক । পরিবেশ দার্শনিকরা বর্তমানে এমন নৈতিক কারণগুলি প্রকাশ করার চেষ্টা করে যা প্রকৃতিকে কেবল যন্ত্রতুল্য মূল্যবান মনে করে না। তারা প্রকৃতির অমানব সত্তার স্বতঃমূল্যও দাবি করে।

নিম্নে মানবকেন্দ্রিকতাবাদকে কাটিয়ে ওঠার জন্য প্রচলিত মতবাদসমূহ আলোচনা ও সেগুলো খন্ডনের চেষ্টা হলো:

২.৭.১ সংবেদনবাদ :

সংবেদনবাদ অনুসারে, কেবল সংবেদনশীল প্রাণীরা নৈতিকভাবে বিবেচিত হতে পারে। এ মতবাদটিকে অ-মানবের প্রতি মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং অ-মানবকেন্দ্রিকতাবাদের মৌলিক রূপকে অতিক্রম করার প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। যদিও পরিবেশগত সমস্যগুলি উপলব্ধি করা এবং পরিবেশগত সমস্যার প্রতিকারের পক্ষে এটি যথেষ্ট গ্রহণযোগ্য মতবাদ নয় তবুও এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে। কারণ এ মতবাদ অ-মানবদের কাছে মানবকেন্দ্রিক মতবাদের চ্যালেঞ্জ করেছে। সংবেদনবাদের নৈতিক মানদন্ড হিসেবে সংবেদনশীল প্রাণীদেরকে তাদের আনন্দ, ব্যথার সক্ষমতার জন্য মানুষের পাশাপাশি অবস্থান আছে বলে মনে করে। সংবেদনবাদ এর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দিক হল প্রাণী কল্যাণ, প্রাণীমুক্তি এবং পশুর অধিকার রক্ষা করা। পিটার সিঙ্গার, টম রিগান এবং জয়েল ফেইনবার্গ প্রমুখকে সংবেদনবাদ-এর কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব হিসাবে গণ্য করা যায়।[৯৫] যদিও তাদের মতবাদগুলোর মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। (যখন সিঙ্গার উপযোগবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে রেগান তখন কান্টিয়ান নীতিবিদ্যার আলোকে বর্ণনা করেন।)

২.৭.১.১ পিটার সিঙ্গারের উপযোগবাদ:

অষ্ট্রেলিয়ার মোনাস বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর হিউম্যান বায়োএথিক্স-এর ডেপুটি ডিরেক্টর এবং দর্শনের অধ্যাপক পিটার সিঙ্গার তাঁর Animal Liberation ও practical Ethics নামক গ্রন্থদ্বয়ে প্রাণীর নৈতিক অবস্থানের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর Animal Liberation বইটিকে 'প্রাণীমুক্তি আন্দোলনের বাইবেল'ও বলা হয়।[৯৬] ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কল্যাণের কথা চিন্তা না করে কেবল বর্তমান সমাজের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য প্রাকৃতিক পরিবেশ বিনষ্ট করা এবং বাস্তুসংস্থানের ভারসাম্য বিঘ্নিত করা উচিত নয়। তিনি মনে করেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সংবেদনশীল

মানবেতর প্রাণীদের যুক্ত করলে পরিবেশ সংরক্ষণের গুরুত্ব আরো বেশি স্পষ্ট হবে। সিঙ্গারের মতে, সুখ বা আনন্দ স্বকীয় বা স্বতঃমূল্যবান হলে মানুষের সুখের পরিমানের সঙ্গে ঐসব মানবেতর প্রাণীদের সুখ বা আনন্দকেও যুক্ত করে বিষয়টির নৈতিক মূল্য নির্ধারণ করতে হবে। তাঁর মতে "ডুবে যাওয়া বা খাদ্যহীন অবস্থা কোনটিই মৃত্যুর সহজ পথ নয় এবং এ ধরণের মৃত্যুতে যে পরিমাণ কষ্ট বা যন্ত্রণা থাকে তাকে মানবসত্তার অভিজ্ঞতায় প্রাপ্ত কষ্ট বা যন্ত্রণার সাথে সমান গুরুত্ব দিতে হবে, কোন অবস্থাতেই কম গুরুত্ব দেয়া উচিত হবে না।[৯৭] সিঙ্গারের মতে, এমন অনেক সত্তা আছে যারা অনুভবক্ষম বা সচেতন এবং আনন্দ ও বেদনার অভিজ্ঞতা লাভে সক্ষম। কিন্তু তারা বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন এবং আত্মসচেতন নয় বলে তারা ব্যক্তি নয়।[৯৮] অনেক অ-মানব প্রাণী, নবজাতক শিশু, মানসিক প্রতিবন্ধীগণও এ শ্রেণীর অন্তর্গত।

পিটার সিঙ্গার প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে, যদি কোন সত্তা সচেতন হয় কিন্তু আত্মসচেতন না হয় তাহলে জীবনের মূল্য আছে কি-না এবং যদি থাকে তাহলে সেই সত্তাটির জীবনের মূল্যের সাথে ব্যক্তি জীবনের মূল্য কিভাবে তুলনা করা যায় ? তাঁর মতে, আনন্দ বা বেদনার অভিজ্ঞতালাভে সক্ষম একটি সত্তার জীবনের মূল্য দেয়ার সবচেয়ে স্পষ্ট যুক্তিটি হলো সত্তাটি আনন্দের অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে।[৯৯] মূলতঃ তিনি মনে করেন আনন্দপূর্ণ জীবনকে হত্যা করা উচিত নয়। তাঁর যুক্তিটি হলো, যদি আমরা আমাদের নিজস্ব আনন্দ বিশেষ করে যৌন উপভোগের আনন্দ, খাদ্যগ্রহণের আনন্দের মূল্যায়ন করি তাহলে নৈতিক আচরণের সর্বজনীন দিকটি এ সব আনন্দে আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতায় সদর্থক মূল্যায়নকে একই ধরণের অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে এমন সকলের ক্ষেত্রে আমাদেরকে সম্প্রসারিত করতে উদ্বুদ্ধ করে। যদি সত্তাটি মৃত হয় তাহলে আনন্দ উপভোগ করতে পারে না। আবার যদি তাকে হত্যা হয় তাহলে অন্যায় হবে কারণ সত্তাটি ভবিষ্যতে আনন্দ অভিজ্ঞতা লাভ করবে। মূলতঃ তিনি বলতে চেয়েছেন যেসব সত্তা আনন্দপূর্ণ জীবনযাপন করে তাদের হত্যা করার অর্থই হলো আনন্দের অভিজ্ঞতা লাভ থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা। কাজেই এ ধরণের হত্যা করা অন্যায় হবে।

সিঙ্গার তাঁর practical Ethics গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে বলেন, "সমতার মৌলিক নীতিটি হলো সমতা নীতি বা স্বার্থের সমবিবেচনার নীতি এবং এ নীতিটির উপর সকল মানুষের সমতা নির্ভরশীল।[১০০] তিনি মনে করেন সমতা নীতি সকল মানুষের সমতার জন্য একটি সন্তোষজনক ভিত্তি প্রদান করলেও ভিত্তিটি শুধু মানুষের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। এ নীতিটিকে আমাদের নিজ প্রজাতির বাইরে অন্য প্রজাতি বিশেষ করে অ-মানব প্রাণীর সাথে সম্পর্ক স্থাপনেরও একটি

নির্ভরযোগ্য নৈতিক ভিত্তি হিসেবে তুলে ধরতে পারি।[১০১] পিটার সিঙ্গারের সাথে একমত হয়ে আধুনিক উপযোগবাদের প্রতিষ্ঠাতা জেরেমি বেন্থাম মানবেতর প্রাণীর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে, "The argument for extending the principle of equality beyond our own species is simple, so simple that it amounts to no more than a clear understanding of the principle of equal consideration of interests."[১০২]

বেন্থামের যুক্তির সাথে মিল রেখে সিঙ্গার তাঁর বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বলেন, যদি একটি সত্তা কষ্টভোগ করে তাহলে সে কষ্টভোগকে বিবেচনায় না আনার কোন নৈতিক ন্যায্যতা থাকে না। সত্তাটির স্বভাব প্রকৃতি যাই থাকুক না কেন সমতা নীতি অনুসারে অন্য যেকোন সত্তায় কষ্টভোগের মতোই এ সত্তার ভোগকে সমভাবে বিবেচনায় আনতে হবে। বুদ্ধি বা যৌক্তিকতার মতো কিছু বৈশিষ্ট্যের সীমারেখা চিহ্নিতকরণের অর্থই হবে সীমারেখাটিকে স্বেচ্ছাচারীভাবে চিহ্নিত করা।[১০৩]

পিটার সিঙ্গার বলেন, জাতিবাদীরা সমতা নীতিকে লঙ্ঘন করেন। যখন নিজেদের সদস্যের স্বার্থের সঙ্গে অন্য জাতির সদস্যদের স্বার্থের সংঘাত হয় তখন জাতিবাদীরা নিজেদের সদস্যের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব দেয়। এক্ষেত্রে মানব প্রজাতিবাদীরা মেনে নেয় না যে, মানুষের ব্যথা যেমন কষ্টদায়ক তেমনি শুকর, ইঁদুর এ ধরণের অ-মানব প্রাণীর ব্যথাও বেদনাদায়ক।[১০৪] মূলতঃ সিঙ্গার এমন কিছু মানদন্ড প্রবর্তন করেন যা একটি ব্যক্তির জীবনকে অন্যের জীবনের চেয়ে মূলবান করে তোলে। এ মানদন্ডগুলি হল উচ্চতর মাত্রার আত্মসচেতনতা এবং অন্যের সাথে অর্থপূর্ণ সম্পর্কের জন্য বৃহত্তর ক্ষমতা।

২.৭.১.২ রিগানের এর অধিকারভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গিঃ

টম রেগান পিটার সিঙ্গারের সমসাময়িক একজন পরিবেশ নীতিদার্শনিক। তিনি তাঁর "The case of Animal Rights Theory' নামক গ্রন্থে প্রাণী অধিকারের বিষয়টি আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, পশুরও অধিকার আছে এবং তাই তারা নৈতিক কর্তা হিসেবে সমবিবেচনা পাওয়ার যোগ্য। যে সব সত্তার স্বতঃমূল্য আছে তাদের অধিকার আছে। স্বত:মূল্য বলতে এরূপ মূল্য থাকার কথা বোঝানো হয়েছে যা অন্যের নিকট ভাল তা চিন্তা ব্যতিরেকেই মূল্যবান। তিনি আরও বলেন যার চিন্তা করার শক্তি ও চেতনা আছে তার জীবনের মূল্য আছে। চেতনাসম্পন্ন সত্তা হলো যে অন্যের সাহায্য ছাড়া চলাফেরা করতে পারে, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভাবতে পারে এবং জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে চিন্তা করতে পারে। একমাত্র তারাই জীবনধারণক্ষম প্রাণী এবং এ ধরণের প্রাণীর অধিকার রয়েছে।

রেগান প্রাণীদের এ অধিকারকে নৈতিক অধিকার বলেছেন। এটা কোন কোনো আইনগত অধিকার নয়। আইনগত অধিকার আইন দ্বারা সমর্থিত এবং এর দেশভেদে ভিন্নতা রয়েছে। কিন্তু নৈতিক অধিকার সকল জীবনধারী প্রাণীর জন্য সমান নয় বরং প্রাণীর অধিকার বলতে তাদের ব্যবহার করার সময় তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ও সদয় আচরণ করা উচিত। তিনি মনে করেন, প্রাণীদের মূল্য মানুষের মূল্যের সমান। মানুষের যেমন স্বতঃমূল্য আছে প্রাণীদেরও আছে। স্বতঃমূল্য সৎকাজ দ্বারা অর্জন করা যায় না আবার অসৎ কাজের ফলে স্বতঃমূল্য হারায় না। মাদার তেরেসা ও হিটলারের স্বতঃমূল্যের কোনো পার্থক্য নেই। উভয়ের স্বতঃমূল্য সমান। পশুর মূল্য মানুষের মূল্যের সমান নৈতিক বিবেচনা পাওয়ার দাবিদার। কিন্তু কোনো স্বার্থের দ্বন্দ্ব দেখা দিলে পশুরা তার সমাধান দিতে অক্ষম। কারণ মানুষ বুদ্ধিমান প্রাণী। তাই মানুষ ও পশুর মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। রেগান একটি উদাহরণের সাহায্যে তা দেখানোর চেষ্টা করেন। ধরি, একটি নৌকায় পাঁচটি প্রাণী নিয়ে সমুদ্রপথে যাত্রা শুরু করল। পাঁচজনের চারজন সুস্থ ও প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ এবং একটি কুকুর। সকলের সমান ওজন এবং সবাই সমান জায়গা দখল করে আছে। হঠাৎ দেখা যায় যে, একজনকে নৌকা থেকে ফেলে না দিলে নৌকার আরোহীদের সকলকে ডুবে মারা যেতে হবে। এমতাবস্থায় কাকে ফেলে দেয়া উচিত? রেগানের মতে কুকুরকে। কারণ চারজনের একজন মানুষকে ফেলে দেওয়া মানুষের বিরাট ক্ষতি করা। একটি কুকুর মারা গেলে যে ক্ষতি হবে একজন মানুষ মারা গেলে তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতি হবে। কুকুরের মৃত্যুও এক ধরণের ক্ষতি। কিন্তু সে ক্ষতির পরিমাণ মানুষের মৃত্যুর তুলনায় খুব নগণ্য ও তুচ্ছ।

এক্ষেত্রে দেখা যায় উপযোগবাদ সমতাভিত্তিক মতবাদ হলেও সকল প্রাণীর সমান মূল্য স্বীকার করে না। এ কারণে উপযোগবাদ দ্বন্দ্ব নিরসনে সমাধান দিতে পারে না। রেগানের নৌকার আরোহীদের ব্যাপারে উপযোগবাদীরা বলবেন যে, নৌকার আরোহীগণ ছাড়াও তাদের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। আর ক্লাসিক্যাল উপযোগবাদীরা বলবে একমাত্র কম সুখীকে নৌকা থেকে ফেলে দেয়া উচিত। কুকুর যেহেতু অল্পতে সুখী তাই মানুষকে বাঁচতে দেয়া প্রয়োজন। একটি কুকুরের পরিবর্তে একজন মানুষকে বাঁচতে দেয়া হলে সামগ্রিক সুখের পরিমান বেশী হবে। পিটার সিঙ্গার এক্ষেত্রে বলেন যে, একজন আত্মসচেতন মানুষ সর্বজনীন সুখ অর্জনে পছন্দ করবেন। তাই নৌকায় আরোহী কোন মানুষকে হত্যা করা হলে মানুষের প্রত্যাশা পূরণ হবে না। তাই এক্ষেত্রে তিনি রেগানের সিদ্ধান্তকে ন্যায্য বলে ধরে নেন।

রেগানের নৌকার উদাহরণকে সমালোচনা করে Angus Taylor বলেন, এমনকি এক্ষেত্রে যদি চারটি মানুষ ও দশ লক্ষ কুকুর থাকে সেখানেও কুকুরগুলোকেই ফেলে দেয়া উচিত কারণ মানুষের মৃত্যুর চেয়ে তাদের মৃত্যুতে কম ক্ষতি হবে। তাই এখানে দেখা যায় যে, রেগানের সকল প্রাণের সমান সহজাত মূল্য থাকতে হবে সে তত্ত্ব বিরোধী। একইভাবে Dale Jamieson সমালোচনা করে বলেন, এ ক্ষেত্রে স্বতঃমূল্য নীতিটি সরে যাচ্ছে, যেমন জর্জ অরওয়েল (George Orwell) এর Animal Farm বইয়ে বলা হয়েছে, "সকল প্রাণী সমান কিন্তু কিছু প্রাণী অন্যের চেয়ে বেশি সমান।"[১০৫] ফলস্বরূপ প্রাণী অধিকার আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য হিসেবে এটি মানবাধিকার আন্দোলনের বিপরীত বা বিকল্প নয় বরং তারা একই তাত্ত্বিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে। মানুষ, যারা প্রাণী অধিকারের জন্য লড়াই করে তারা মানবাধিকার জন্য যেমন নারী, কৃষ্ণাঙ্গ, সংখ্যালঘুদের অধিকার ইত্যাদি নিয়েও লড়াই করে।[১০৬] তাছাড়া প্রাণীর প্রতি পরোক্ষ দায়িত্ব দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করে রেগান দাবি করেন যে, প্রাণীর প্রতি আমাদের কিছু প্রত্যক্ষ দায়িত্ব রয়েছে যেমন আমাদের মানুষের প্রতি কিছু দায়িত্ব থাকে।[১০৭] তিনি প্রাণী অধিকারের ক্ষেত্রে দুটি দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলেন।

প্রথমত, রেগান "The Cruelty-Kindness View" এর কথা বলেন। তাঁর মতে মানুষের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব প্রাণীর প্রতি সদয় আচরণ করা এবং নিষ্ঠুর আচরণ না করা। তাঁর মতে, কোন ধরনের কাজ সঠিক কাজ এমন কোন নিশ্চয়তা নাই।[১০৮]

দ্বিতীয়ত, তিনি বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্যে প্রাণীদেরকে নিয়ে গবেষণাগারে পরীক্ষা করার সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, কিছু মানুষ মনে করে আমাদের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব হল প্রাণীর প্রতি নিষ্ঠুর না হওয়া। আসলে তারা শর্ত সাপেক্ষে এ যুক্তি রক্ষা করে। গবেষকরা প্রাণীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সময় উক্ত প্রাণীর মূল্য, অধিকারকে লঙ্ঘিত করে। তবে কারো কারো মতে, যারা শর্তসাপেক্ষে পশুর প্রতি প্রত্যক্ষ দায়িত্বের কথা বলে গবেষণার প্রাণীগুলিকে তুচ্ছ, অপ্রয়োজনীয়ভাবে ব্যবহার করে তা বাতিল করা উচিত। আর যদি প্রাণীদের নিয়ে এমন কোন গবেষণায় ব্যবহার করা হয়, যা মনে হয় মানুষের জন্য দুর্দান্ত উপকার নিয়ে আসে তবে প্রাণীদের উপর এ জাতীয় গবেষণা সহনীয় হওয়া উচিত। অন্যদিকে রেগান যেকোন কারনেই হোক প্রাণীগুলিকে পরীক্ষাগারে ব্যবহার করাকে কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন, মানুষের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা যে কারনে অগ্রহণযোগ্য প্রাণীর উপরও পরীক্ষা করাও অনুরুপ। ফলে তিনি বলেন যে, "বিজ্ঞানে প্রাণী ব্যবহার করার ক্ষেত্রে আমরা সবচেয়ে ভাল যা করতে পারি তা হলো তাদের ব্যবহার না করা। অধিকারের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে এটাই আমাদের কর্তব্য।"[১০৯] এখানে মূল নৈতিক ভুলটি এটা নয় যে, প্রাণীগুলিকে বন্দিদশায় চাপের মধ্যে

বা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রাখা হয় বা তাদের যন্ত্রণা, প্রয়োজনীয়তা এবং পছন্দগুলি উপেক্ষা করা হয় বা ছাড় দেওয়া হয় না।[১১০] বরং মূল ভুলটি হল, প্রাণীগুলোর স্বতন্ত্র মূল্য আছে বলে গণ্য করা হয়নি। ফলে আমরা বলতে পারি, বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রাণী ব্যবহার করার ক্ষেত্রে শ্রদ্ধার নীতি লঙ্ঘন করা হয়। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, রেগান এর বিরোধীতা করেন। যেখানে সিঙ্গার গবেষণায় প্রাণীর ব্যবহারকে সমর্থন করেন এ ভেবে যে, যদি গবেষণায় প্রাণী এবং এমনকি মানুষের ব্যবহার সম্ভাব্য ফলাফল, সুবিধা যথেষ্ট পরিমাণে ভাল হয় তাহলে করা যায়।

২.৭.১.৩ সংবেদনকেন্দ্রিকতাবাদের সমস্যা

সংবেদনকেন্দ্রিকতাবাদের মূল সমালোচনা হলো এ মতবাদ নৈতিক বিবেচনার ক্ষেত্রে সংকীর্ণ। যেহেতু এ মতবাদ কেবল সংবেদনশীল প্রাণীদের মূল্য দেয়, তাই এটি নৈতিকভাবে কিছু মানুষ ও প্রাণীকে মূল্য দেয় না। যেমন, এমন ব্যক্তি যে কোমায় আছে কিংবা গাছপালা এবং প্রকৃতির অন্যান্য সত্তা যারা অনুভব করে না। আবার যেহেতু প্রাণী অধিকার বা প্রাণী মুক্তি আন্দোলনগুলি মূলত ব্যক্তিবাদী তাই সংবেদনকেন্দ্রিকতাবাদীরা প্রজাতি, জীববৈচিত্র্য, বাস্তুতন্ত্র ইত্যাদি রক্ষার ন্যায্যতা সরবারাহ করতে অক্ষম।

ক্যালিকট নৈতিক সুখবাদ তত্ত্বগুলির সমালোচনা করে বলেন, নৈতিক সুখবাদ হিসাবে ক্লাসিক্যাল উপযোগবাদটি কেবল অ-মানবকেন্দ্রিক।[১১১] কারণ এটি কিছু মানবসত্তার উপর নৈতিক বিবেচনার সীমাকে প্রসারিত করে মাত্র। অন্যদিকে এটি কেবল সেই ব্যক্তিদের জন্য নৈতিক বিবেচনাকে সীমিত করে যা আনন্দ এবং বেদনা অনুভব করতে সক্ষম। সুতরাং এটি পরিবেশগত নৈতিকতা দাবির ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ত। যেখানে অ-মানবকেন্দ্রিকতাবাদকে অ-মানব সত্তার অ-ব্যবহারিক মূল্যে মূল্যায়ন করে সেখানে ক্লাসিক্যাল উপযোগবাদ কেবল আনন্দ-বেদনা অনুভব করতে সক্ষম ব্যক্তিদের মধ্যে নৈতিক বিবেচনাকে সীমাবদ্ধ করে।[১১২] ক্যালিকট আরো বলেন যে, "Like both the utilitarian and deontological Variations of normal ethics, it assigns intrinsic value to discrete individuals."[১১৩] অতএব, প্রকৃতির সামগ্রিক মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার পক্ষে যারা অপ্রতুল, তারা পরিবেশ নীতিবিদ্যার বিকল্প হতে পারে না। এক্ষেত্রে ক্যালিকট প্রাণীমুক্তি আন্দোলনের বিরুদ্ধে ভূমি নীতিবিদ্যাকে সমর্থন করেন।

তিনি আরও যুক্তি দেখান যে, বিশেষত প্রাণী মুক্তি আন্দোলনে প্রজাতির ব্যাথা এবং আনন্দের অনুভূতির নীতির উপর নির্ভর করে তা নৈতিকভাবে সামগ্রিক সত্তা যেমন: বায়োকোনোসেস, বায়োমস

এবং বায়োস্ফিয়ার কেউই নৈতিকভাবে সমর্থন করে না। সাধারণভাবে প্রাণী অধিকার রক্ষাকারীরা প্রাণীগুলোকে মানুষের স্তরে উন্নীত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায় প্রাণী অধিকারগুলো মূলতঃ মানুষের পরিপ্রেক্ষিতেই তৈরী করা হয়।

২.৭.২ বাস্তুকেন্দ্রিকতাবাদ

এ মতবাদ দাবি করে যে, সমস্ত জীবিত প্রাণীর নৈতিক স্বতঃমূল্য আছে। তাই একে 'জীবন-কেন্দ্রিক' অবস্থানও বলা হয়। যেহেতু সকল জীবন্ত প্রাণীর জীবনের লক্ষ্য রয়েছে তাই সকলেরই নিজস্ব বিষয় রয়েছে। Paul W. Taylor এবং Albert Schweitzer এ মতবাদের বিশিষ্ট সমার্থক।

বাস্তুকেন্দ্রিকতাবাদ ও পরিবেশকেন্দ্রিকতাবাদ (Ecocentrism) উভয়ই জীবনকেন্দ্রিক মতবাদ। তাই কয়েকজন নীতি দার্শনিক যেমন Sahotra Sarkar, Holmes Rolston III তাঁদের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখাননি এবং উভয়কে কেউ কেউ Biocentrism আবার কেউ কেউ Ecocentrism বলেছেন। তবে কেউ কেউ পার্থক্য করেন। যেমন: P.S. Wenz মনে করেন যেখানে বাস্তুকেন্দ্রিকতাবাদ ব্যক্তির মূল্যকে বৈশিষ্ট্যযুক্ত করে সেখানে ইকোসেন্ট্রিজম সমষ্টিগত বা সংশ্লেষিত সত্তা যেমন প্রজাতি, সম্প্রদায়, বাস্তুসংস্থান ইত্যাদি মূল্যকে বৈশিষ্ট্যযুক্ত করে।[১১৪] জীবিত প্রাণীরা সকলে একইভাবে বা বিভিন্ন দিক দিয়ে আত্মসচেতন, বুদ্ধি, সংবেদনশীলতা, স্মৃতি, মনস্তাত্ত্বিক পরিচয় এবং আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদির অধিকারী হয়।[১১৫]

২.৭.২.১ আলবার্ট শোয়েটজার:

আলবার্ট শোয়েটজার এর "Civilization and Ethics" নামক গ্রন্থে তিনি 'জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা' নামক উদ্বৃতির সাহায্যে ইকোসেন্ট্রিজমের ব্যাখ্যা দেন। এ গ্রন্থের একটি অনুচ্ছেদে তিনি তাঁর নৈতিক অবস্থান সম্পর্কে যুক্তি প্রদানের চেষ্টা করেন। তিনি বলেন, জগতকে চৈতন্যময়রূপে গণ্য করা এবং উপলব্ধি করার ক্ষমতাই হলো প্রকৃত দর্শনের বৈশিষ্ট্য।"[১১৬] তাঁর মতে, জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা নীতি থেকেই নৈতিকতা গঠিত হয়। তিনি তাঁর Civilization and Ethics গ্রন্থে বলেন, "আমি যেমন আমার নিজের 'জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা' অনুশীলনের আবশ্যিকতার অভিজ্ঞতা লাভ করি, তেমনি বেঁচে থাকতে ইচ্ছুক সকল জীবনের প্রতি একই ধরণের শ্রদ্ধা অনুশীলন করার আবশ্যিকতার অভিজ্ঞতা লাভ করি। এর মধ্যে আমি ইতোমধ্যে নৈতিকতার প্রয়োজনীয় মৌলিক নীতিটি পেয়েছি। প্রাণের সংরক্ষণ এবং লালন করা হলো ভালো কাজ। আর প্রাণের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি অথবা প্রাণ ধ্বংস করা হলো মন্দ কাজ। একজন মানুষ শুধু প্রকৃতভাবে তখনই নৈতিক যখন সে সকল ধরনের জীবনকে

সাহায্য করার জন্য অনুজ্ঞাবর্তী হয়ে তার উপর অর্পিত দুর্বার চাপকে মেনে চলতে এবং তাদের মুক্ত করতে সক্ষম হয়। যখন সে নিয়মের বাইরে হলেও যে কোন জিনিসকে আঘাত করার কথা বর্জন করে।... তার কাছে জীবন মানেই হলো পবিত্র বা শ্রদ্ধেয় বা ঐশ্বরিক। সে সূর্য রশ্মিতে আলোর ঝলক সৃষ্টির জন্য বরফের টুকরা ভাঙে না, গাছ থেকে পাতা ছিন্ন করে না, ফুল ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে না এবং এমন সাবধানে চলাফেরা করে যাতে কোন কীটপতঙ্গ তার পায়ের নিচে পিষ্ট না হয়।[১১৭]

শোয়েটজার এর মতে, চৈতন্যময় জগতের প্রত্যেকটি বস্তুর প্রতি সৌজন্য ও সম্মান প্রদর্শনই হলো নীতিবিদ্যার প্রথম ও প্রধান নির্দেশ। তিনি পরিবেশগত সমস্যার ক্রমবর্ধমান প্রতিক্রিয়া হিসেবে তাঁর নীতিটি বিকাশ করেন নি, বরং তার উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে আরো একটি দৃষ্টিভঙ্গি সরবরাহ করা, যারা প্রকৃতির প্রতি মানুষের ক্রমবর্ধমান ধ্বংসাত্মক মনোভাবের বিরুদ্ধে তাদের মূল্যবোধ গুলিকে পুনর্বিবেচনা করতে চান।[১১৮] তিনি মানুষ এবং প্রকৃতির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। তাছাড়া তিনি পরিবেশের প্রতিটি সদস্যের সামগ্রিক মূল্য এবং সামগ্রিক পরিবেশের জন্য মানুষের সচেতনতা এবং শ্রদ্ধা বাড়ানোর পক্ষে মত দেন। তিনি মূল্যবান-অমূল্যবান, উচ্চ-নিম্ন, ধনী-দরিদ্র ইত্যাদির মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য ছাড়াই সমস্ত জীবনকে সম্মান করা দরকার বলে মনে করেন। Mouchang Yu and Yi Lei বলেন, শোয়েটজার এরকম পার্থক্যকে খুব বিষয়ীগত হিসাবে বিবেচনা করেন। তিনি মনে করেন যে, তারা কেবল মানুষের অনুভূতির উপর নির্ভর করে।[১১৯]

শোয়েটজার নৈতিক নিয়ম হিসেবে আমাদের কি করা উচিৎ তা নির্ধারণ করে এর ভিত্তিতে "জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা" উপস্থাপন করেননি। তিনি এটিকে পরিবেশ বা প্রকৃতির প্রতি মনোভাব হিসেবে আমরা কে তা নির্ধারণ করেন।[১২০] এই নীতিটি দিয়ে তিনি কেবল একটি ইতিবাচক বিশ্বদর্শন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন। সেই কারণেই তিনি বিরোধের ক্ষেত্রে কোন নিয়ম প্রয়োগ করার পরামর্শ দেন নি। M.Yu এবং Y.Lei সংক্ষিপ্তভাবে শোয়েটজার এর অবস্থান এভাবে ব্যাখ্যা করেন– জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা বা সকল জীবনের প্রতি ভালবাসার নৈতিকতা আমাদেরকে এ উপলব্ধি দেয় যে, আমরা জীবনে ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্থ হওয়াকে এড়াতে পারি না। যদি আমরা অনুভূতিহীন না হই, তবে আমরা যথেষ্ট মানসিক সংঘাতের মুখোমুখি হই। এ জাতীয় সংঘাত এড়াতে আমাদের পুরোপুরি সচেতন হওয়া উচিত এভাবে যে জীবন পবিত্র এবং সমস্ত জীবন অবিচ্ছেদ্য এবং সবার বাঁচার ইচ্ছা রয়েছে। তাই সকলের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা করা উচিত। এটি জীবনের প্রতি শ্রদ্ধার নৈতিকতার ভিত্তি। জীবনের মূল্য সংরক্ষণ, বিকাশ এবং বর্ধনকে নৈতিকতার ভিত্তি হিসাবে জীবনের প্রতি শ্রদ্ধাকে প্রথম প্রয়োগ হিসাবে বিবেচনা করা উচিত। শ্রদ্ধার এ ধরণের নীতি প্রকৃতির অ-মানব অংশ এবং প্রকৃতির সাথে মানুষের

সম্পর্কের বিষয়ে খ্রিষ্টান মতবাদের বিকল্প ব্যাখ্যাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যা অ্যাসিসি (Assisi) র সেন্ট ফ্রান্সিস চর্চা করতেন। L.White যেমন ব্যাখ্যা করেন, সেন্ট ফ্রান্সিস সৃষ্টির সীমাহীন নিয়মের ধারণার জন্য মানুষসহ সমস্ত প্রাণীর সাম্যের ধারণাটি প্রতিস্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন।[১২১] তিনি এভাবে ব্যাখ্যা করেন: Francis tried to depose man from his monarchy over creation and set up a democracy of all God's creatures. With him the ant is no longer simply a homily for the lazy, flames a sign of the thrust of the soul toward union with God; now they are Brother Ant and Sister Fire, praising the Creator in their own ways as Brother Man does in his.[১২২] ফলে হোয়াইট বলেন যে, "আমি ফ্রান্সিসকে বাস্তুতত্ত্ববিদদের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে প্রস্তাব দিই।"[১২৩] বস্তুত হোয়াইট বলেন, ফ্রান্সিস তাঁর লক্ষ্যে ব্যর্থ হন, যদিও তাঁর সময়ে তাকে বোঝা যাচ্ছিল না।

২.৭.২.২ পল ডব্লিউ টেইলর :

পল টেইলর বাস্তুকেন্দ্রিকতাবাদ নিয়ে শোয়েটজারের চেয়ে অনেক বেশি ব্যাখ্যা করেন। তাঁর অবস্থান বাস্তুকেন্দ্রিক সমতাবাদ হিসাবে পরিচিত, যা সমস্ত জীবের জন্য শ্রদ্ধা দাবি করে। তিনি মানবদেহকে অন্যান্য জীবের মতোই একটি সম্প্রদায়ের সদস্য হিসাবে সম্মান করেন এবং দাবি করেন যে জীবিত প্রাণীর কোনটিই অন্যের চেয়ে বিশেষ সুবিধাসম্পন্ন নয়। মানবকেন্দ্রিকতাবাদীরা খুব সহজেই এ জাতীয় সমতাবাদকে আপত্তি জানাতে পারে এভাবে যে, অ-মানব এর মানুষের মতো নৈতিক ক্ষমতা নেই এবং তারা নৈতিকভাবে মানুষের সাথে সমান নয়। সুতরাং মানবকেন্দ্রিকতাবাদীদের মতে অ-মানব সত্তাকে অধিকার প্রদান করা সমস্যাযুক্ত হবে কারণ তারা মানুষের অধিকারকে সম্মান করতে বা তাদের নৈতিক বিবেচনাকে একইভাবে প্রতিদান দিতে সক্ষম নয়। আপত্তির প্রতিক্রিয়া হিসাবে পল টেইলর 'নৈতিক এজেন্ট' এবং 'নৈতিক বিষয়' বলে এদের মধ্যে পার্থক্য করেন।

সুতরাং সমস্ত মানব এবং অ-মানব নৈতিক এজেন্ট নয়, তবে তাদের সমস্তই নৈতিক বিষয়। টেইলর বলেন যে, "নৈতিক বিষয়গুলির ভূমিকায় তারা অন্যের দ্বারা যথাযথ বা অন্যায়ভাবে আচরণ করতে পারে।"[১২৪] তিনি নৈতিক বিষয় হিসাবে সংজ্ঞা দিয়েছেন "যে কোনও ব্যক্তির সাথে সঠিকভাবে বা অন্যায়ভাবে আচরণ করা যায় যাদের নৈতিক এজেন্টদের প্রতি দায়িত্ব থাকতে পারে । এজেন্টদের ক্রিয়াকলাপ দ্বারা এরকম প্রাণীদের পক্ষে তাদের অস্তিত্বের পরিস্থিতি আরও ভাল বা খারাপ করা সম্ভব হবে।"[১২৫] নৈতিক বিষয়টিকে নৈতিক উদ্বেগের যোগ্য করে তোলে, এটি হল এর নিজস্ব একটি ভাল দিক। টেইলর মানবকেন্দ্রিকতাবাদ ও সংবেদনকেন্দ্রিকতাবাদের মধ্যে জীবের কোন পার্থক্য তৈরী

করেন না। একটি জীবের অস্তিত্বের একটি উদ্দেশ্য এবং কারণ রয়েছে, সুতরাং টেইলর দৃঢ়ভাবে দাবি করেন যে সমস্ত জীবজন্তুই 'teleological center of life'। তাঁর মতে, নৈতিক বিষয়গুলি অবশ্যই এমন সত্তা হওয়া উচিত যা ক্ষতিকর বা হিতকর হতে পারে।[১২৬] প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধা" নীতি অনুসারে, সমস্ত প্রাণীর স্বতঃমূল্য আছে। টেইলর জীবিত বিষয়ের জন্য স্বতঃমূল্য কী তা ব্যাখ্যা করেন এভাবে– To say that it possesses inherent worth is to say that its good is deserving of the concern and consideration of all moral agents, and that the realization of its good has intrinsic value, to be pursued as an end in itself and for the sake of the entity whose good it is.[১২৭]

আমরা এ উক্তিটি থেকে দেখতে পাচ্ছি, সমস্ত জীবের প্রতি শ্রদ্ধার নীতিটি ব্যক্তিদের শ্রদ্ধার কান্টিয়ান নীতির পরিবর্ধন। বাস্তুকেন্দ্রিকতাবাদ অনুসারে প্রকৃতির সমস্ত সদস্যের মধ্যে একটি আন্তঃসংযোগ রয়েছে। সুতরাং প্রতিটি সদস্য বেঁচে থাকার জন্য অন্যদের উপর নির্ভরশীল। টেইলর তাঁর প্রকৃতির জৈবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নামে দার্শনিক তত্ত্ব উপস্থাপন করেন। মানুষ যদি বাস্তুকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে পারে তবে এটি তাদেরকে প্রকৃতির প্রতি সম্মানজনক মনোভাবের ব্যাখ্যা ও ন্যায্যতার জন্য প্রয়োজনীয় পটভূমি সরবরাহ করবে।[১২৮] তিনি চারটি মৌলিক বিশ্বাস উপস্থাপন করেছেন যে বিশ্বাসগুলোর সাথে একত্রে থাকার ফলে মানুষ প্রাকৃতিক জগতের উপর সুসংগত দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে, প্রাকৃতিক বিশ্বে মানুষের যথাযথ অবস্থান উপলব্দি করতে এবং উপযুক্ত মানব প্রকৃতির সম্পর্ক স্থাপনে সহায়তা করবে। এগুলো নিম্নরূপ[১২৯]:

১. মানুষ অন্য সমস্ত জীবের মতোই পৃথিবীর জীব সম্প্রদায়ের সদস্য। বাস্তুকেন্দ্রিকতাবাদ অনুসারে, প্রকৃতির সমস্ত সদস্যের মধ্যে একটি আন্তঃসংযোগ আছে ; প্রকৃতির সমস্ত কিছুই অন্য সমস্ত কিছুর সাথে সংযুক্ত।

২. সমস্ত প্রজাতি আন্তঃনির্ভরশীলতার এমন একটি অংশ যে পরিবেশের অন্যান্য শারীরিক অবস্থার পাশাপাশি পরিবেশের প্রতিটি জীবের বেঁচে থাকা অন্যের উপর নির্ভর করে।

৩. সমস্ত জীবন্ত জিনিস হল teleological center of life অর্থাৎ তাদের প্রত্যেকের নিজস্ব উপায়ে নিজস্ব বস্তু রয়েছে।

৪. মানুষ অন্যান্য প্রাণীর সাথে সহজাতভাবে উচ্চতর নয়, অন্যান্য জীবন্ত বস্তুর তুলনায় এদের বৃহত্তর সহজাত মূল্য নেই।

বাস্তুকেন্দ্রিকতাবাদীরা বিশেষ করে টেইলর মানবকেন্দ্রিকতাবাদে মানুষের উচ্চতর মূল্যকে দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। তাদের মতে, অ-মানবদের কিছু স্বতন্ত্র ক্ষমতা আছে যা মানবজাতির নেই। যেমন, উড়ে যাওয়ার ক্ষমতা, পানির নিচে শ্বাস নেওয়ার ক্ষমতা, ত্বকের বর্ণ পরিবর্তন করা ইত্যাদি। সুতরাং কেন মানুষের ক্ষমতাকে অন্যের ক্ষমতার চেয়ে মূল্যবান মনে করা হয় ? টেইলর এর মতে- "The claim that humans by their very nature are superior to other species is a groundless claim […] must be rejected as nothing more than an irrational bias in our own favor."[১৩০]

নৈতিক দ্বন্দ্ব দেখা দিলে মানুষের স্বার্থকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অগ্রাধিকার দেওয়ার বিষয়েও টেইলর আপত্তি জানান। তিনি নৈতিক দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে বিভিন্ন নীতি প্রবর্তন করেন। এ নীতিগুলো হলো আত্ম-প্রতিরক্ষা, আনুপাতিকতা, ন্যুনতম ভুল, ন্যায়বিচার বন্টন, পুনরুক্তি ন্যায়বিচার (restitutive Justice)।[১৩১]

তিনি চারটি সাধারণ দায়িত্ব নির্ধারণ করেন, যেগুলি সংঘাতের পরিস্থিতিতে গুরুত্বের সাথে স্থান পেয়েছে।[১৩২]

১. অযৌক্তিকতার নিয়ম (The rule of nonmaleficence):

   এটি কোনোভাবেই প্রাণীর নিজের জন্য ক্ষতি না করার পরামর্শ দেয়।

২. নিরপেক্ষতার নিয়ম (The rule of noninterference):

   এটি একক জীব, বাস্তুতন্ত্র এবং বায়োটিক সম্প্রদায়ের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করার পরামর্শ দেয়।

৩. বিশ্বস্ততার নিয়ম (The rule of Fidelity):

   বন্য প্রাণীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা বা প্রতারণা করা যাবে না।

৪. পুনঃস্থাপনের ন্যায়বিচারের নিয়ম (The rule of retitutive Justice):

   যখন কোন নৈতিক এজেন্ট কোন নৈতিক বিষয়ের সাথে অন্যায় করে তখন ন্যায়বিচারের ভারসাম্য পুনরুদ্ধারের জন্য নৈতিক বিষয়টিকে পুনরুদ্ধার করা দরকার।

তিনি বলেছেন যে, চারটি বিধি দ্বারা আবৃত হোক বা না হোক সঠিক নিয়মগুলি সর্বদা শ্রদ্ধার মনোভাব প্রকাশ করে।[১৩৩] এটি লক্ষ্য করা উচিত যে, টেইলরের বাস্তুকেন্দ্রিক সমতাবাদী একটি

ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। কারণ কেবল ব্যক্তি (individuals) জীবিত, কেবল পৃথক জীবের স্বতঃমূল্য রয়েছে ; প্রজাতি, বাস্তুসংস্থান, আবাস ইত্যাদির স্বতঃমূল্য নেই।

টেইলর এবং শোয়েটজার উভয়ই পরিবেশ নীতিবিদ্যায় ব্যাপক ভূমিকা রাখেন। তারা দৃঢ়ভাবে যুক্তি দিয়েছিলেন যে, মানুষ যেহেতু জীবনের নানা প্রয়োজনীয়তা অন্যান্য জীবের সাথে ভাগ করে। তাই মানুষ এবং অন্যান্য জীব উভয়েরই সমান নৈতিক মূল্য আছে। গতানুগতিক নীতিবিদ্যার বাহিরে গিয়ে তাঁরা এমন এমন দৃষ্টিভঙ্গি তুলেছিল যে, যার কোন মূল্যের স্তরবিন্যাস নেই এবং প্রকৃতির অ-মানব অংশগুলিকে তারা অন্তর্ভূক্ত করে।

২.৭.২.৩ বাস্তুকেন্দ্রিকতাবাদের সমস্যা:

বাস্তুকেন্দ্রিকতাবাদ একটি জীবনকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি। তাই প্রকৃতির জীবন্ত অংশগুলিকে নৈতিক উদ্বেগের বিষয় হিসাবে বিবেচনা করে। মানবকেন্দ্রিকতাবাদের বিপরীতে বাস্তুকেন্দ্রিকতাবাদ প্রকৃতির জীবন্ত এবং জীবন্ত নয় এগুলোর মধ্যে পার্থক্য করে। যেখানে মানবকেন্দ্রিকতাবাদে মানুষ এবং প্রকৃতির অন্যান্য বিষয়ের সাথে পার্থক্য করা হয়। প্রাণহীন জিনিসগুলি কেবল নৈতিকভাবে যথেষ্ট না। সে জীবিত প্রাণীর স্বার্থের জন্য উপকরণ হিসাবে মূল্যবান। কারণ ধারণা করা হয় যে নির্জীব জিনিসগুলির নিজস্ব কোন ভাল নেই। এগুলো স্বতন্ত্রভাবে মূল্যবান বলে বিবেচিত হয় না। বাস্তুকেন্দ্রিকতাবাদের বিরুদ্ধে আরেকটি আপত্তি হল এটি অত্যন্ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদী। এটি কেবল ব্যক্তিদের বিষয়ে সচেতন, প্রজাতি, বাস্তুতন্ত্র ইত্যাদি কেবল যন্ত্রের দ্বারা বিবেচিত এবং এগুলো নৈতিক ক্ষেত্র বহির্ভূত।

বাস্তুকেন্দ্রিকতাবাদ অনুসারে, মানুষকে অন্যান্য জীবন্ত জিনিসের মতোই পৃথিবীর অন্যান্য জীব সম্প্রদায়ের সদস্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়।[১৩৪] যদি তা হয়, তবে কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে, মানুষের ক্রিয়াকলাপগুলিকে কেন প্রাকৃতিক এবং প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে বিবেচনা করা হয় না। যেখানে অ-মানব প্রকৃতির ক্রিয়াকলাপে প্রাকৃতিক এবং প্রাকৃতিক ক্রিয়ার অংশ হিসাবে দেখা হয়। কেন মানুষ ও অ-মানবের ক্রিয়াকলাপকে আলাদাভাবে মূল্যায়ন করা হয় ? উদাহরণস্বরূপ: বন্যা, আগ্নেয়গিরি, বিপর্যয় বা ভূমিকম্পের ফলে কয়েক শতাধিক মানুষ মারা যেতে পারে বা ধ্বংস হতে পারে। শত শত মানুষ, গাছপালা নিখোঁজ হতে পারে। অন্যদিকে মানুষ যদি অন্য কোন মানুষ, প্রাণী বা উদ্ভিদের মৃত্যুর কারণ হয় তবে পরিস্থিতিটিকে আলাদাভাবে মূল্যায়ন করা হয় এবং অবশ্য এটিকে প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিকভাবে বিবেচনা করা হয় না।

নৈতিক এজেন্ট এবং নৈতিক বিষয়গুলির মধ্যে টেইলরের পার্থক্য সম্পর্কে যুক্তি দেওয়া হয় যে, বাস্তুকেন্দ্রিকতাবাদ এখনও মানবকেন্দ্রিক। কারণ এটি কেবল যুক্তিবাদী প্রাপ্তবয়স্ক মানুষকে নৈতিকতার কেন্দ্রে নিয়ে যায়। অন্যান্য জীবন্ত জিনিসগুলোকে কেবল নৈতিক বিষয় হিসাবে বিবেচনা করে।

পরিশেষে, টেইলরের তত্ত্বের ভিত্তিতে একটি আপত্তি দেখা যায়। উদাহরণস্বরুপ, আমি আমার বাড়ির সামনে একটি বহিঃপ্রাঙ্গন তৈরী করতে চাই। এর ফলে ঘাসের স্বতন্ত্র ব্লেড থেকে কয়েক মিলিয়ন ম্যাক্রোবায়োটিক জীব পর্যন্ত টেইলরের তত্ত্বের ভিত্তিতে নৈতিক দ্বিধা সৃষ্টি করে কিনা।[১৩৫] যদি আমাকে বহিঃপ্রাঙ্গন তৈরির অনুমতি দেয়া না হয় তবে টেইলরের দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের জন্য খুবই কঠোর। যদি তৈরী করতে দেয় তাহলে টেইলরকে অবশ্যই ব্যাখ্যা করতে হবে যে কীভাবে একটি মানুষের একটি তুচ্ছ আগ্রহ ঘাসের অসংখ্য ব্লেড এবং আরও অনেক ম্যাক্রোবায়োটিক জীবের জীবনের মূল্যকে অগ্রাহ্য করতে পারে। বহিঃপ্রাঙ্গনটি তৈরির অনুমতি দেওয়ার ক্ষেত্রে এটি টেইলরের অযৌক্তিকতার নিয়মের বিরোধিতা করবে, যা কোনও প্রাণীর নিজস্ব ভালোর জন্য অন্যের ক্ষতি না করার পরামর্শ দেয়। সেক্ষেত্রে পুনঃস্থাপনমূলক ন্যায়বিচার নীতির প্রয়োগের প্রস্তাব দেয়া যায়। তবে ইতোমধ্যে মারা যাওয়া পোকামাকড়ের পুনঃস্থাপন করা সম্ভব নয়। তারপরও বহিঃপ্রাঙ্গনটি তৈরির অনুমতি পাওয়ার ক্ষেত্রে কেউ একজন জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে, আমি যদি একাধিক ব্যক্তিকে হত্যা করার জন্য বহিঃপ্রাঙ্গনটি তৈরী করতে চাই, তবে কি এটি নির্মাণ করা বৈধ ? যদি তা না হয় তবে তার দাবির বিপরীতে টেইলরের তত্ত্ব মানুষের জীবনকে অ-মানব জীবনের চেয়ে উচ্চতর করে তোলে, যা তার তত্ত্বের মৌলিক নীতিগুলির বিরোধী। তাছাড়া আমরা যদি অ-মানব প্রাণীদের মানুষের মত একই স্বতঃমূল্য প্রদান করি তাহলে কিভাবে স্বার্থের দ্বন্দ্ব সমাধান করব?

২.৭.৩ পরিবেশকেন্দ্রিকতাবাদঃ

পরিবেশকেন্দ্রিকতাবাদ হলো একটি সামষ্টিক (Holistic) দৃষ্টিভঙ্গি। প্রকৃতির জৈব ও অজৈব উভয়ই অংশ নৈতিকতার বিষয়। প্রজাতি, বাস্তুসংস্থান, আবাসস্থল ইত্যাদি এবং প্রকৃতি নিজেই স্বতঃমূল্যে মূল্যবান। এটি বায়োটিক সম্প্রদায়কে সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করে। সুতরাং এটি প্রকৃতির অন্যান্য অংশ থেকে মানুষকে পৃথক হিসাবে কল্পনা করে না। পুরো অংশগুলি বায়োটিক সম্পদ্রায়ের দ্বারা আবৃত এবং একে অপরের অবিচ্ছেদ্য হিসাবে বিবেচিত হয়। সামষ্টিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রজাতিগুলো গুরুত্বপূর্ণ, একক হিসেবে নয়। ব্যক্তি স্বল্পস্থায়ী হলেও প্রজাতি স্থায়ী হয়। সমষ্টিবাদীরা এক অর্থে নোহিয়ান (Noahian) নীতি অনুসরণ করে। নুহ (আঃ) নির্বিচারে তাঁর জাহাজে প্রাণী রাখেনি। তিনি

প্রতিটি প্রজাতি থেকে একটি জোড়া নিয়েছিলেন অর্থাৎ প্রজাতির বিলুপ্তি রোধ করতে একটি পুরুষ ও একটি মহিলা প্রাণী নিয়েছেন। তিনি এককের প্রতি নয় প্রজাতির প্রতি যত্নশীল হয়েছেন। সুতরাং এ জাতীয় ক্ষেত্রে বিলুপ্তির ঝুঁকিতে থাকা প্রজাতির সদস্যগুলি সংরক্ষণ করার প্রত্যাশা করা যায়। এমনকি এমন প্রজাতি আছে যা বিলুপ্তপ্রায় তাকে রক্ষার জন্য বিপুলসংখ্যক মানুষের জীবন বিনষ্ট করতে হলে তাই করতে হবে। আল্ডো লিওপোল্ড , আর্নে নায়েস, বেয়ার্ড ক্যালিকট পরিবেশকেন্দ্রিকতাবাদের উল্লেখযোগ্য সমর্থক। নিম্নে এ মতবাদের সাথে সংশ্লিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করা হলো:

২.৭.৩.১ ভূমি নীতিবিদ্যা:

আল্ডো লিওপোল্ড তাঁর A sand county Almanac গ্রন্থে প্রথম "ভূমি নীতিবিদ্যা" শব্দটি ব্যবহার করেন। তিনি ভূ-নীতিবিদ্যাকে ব্যাখ্যা করেন এভাবে: এ নীতিবিদ্যা মানুষের সঙ্গে ভূমি ও ভূমির উপর বেড়ে ওঠা অ-মানব প্রাণী ও উদ্ভিদের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে। এ মতবাদ কেবল মানব সম্প্রদায়কে নয় বরং সমগ্র ভূ-সম্প্রদায়কে নৈতিক বিবেচনার আওতাভুক্ত করার কথা বলে। তাই এ নীতিবিদ্যা নৈতিকতার বিষয়বস্তুর দিক থেকে অ-মানবকেন্দ্রিক। এটি সনাতন মানবকেন্দ্রিক পরিধিকে বিস্তৃত করে সমগ্র প্রাকৃতিক পরিবেশকে নীতিবিদ্যার আওতায় নিয়ে আসে।

লিওপোল্ডের মতে, ভূমি নীতিবিদ্যা মানবগোষ্ঠীর বিজয়ীর ভূমিকাকে একজন সাধারণ সদস্য বা সম্প্রদায়ের নাগরিক হিসাবে পরিবর্তন করে। সুতরাং বায়োটিক সম্প্রদায়ের একজন সরল সদস্য হওয়ার কারণে মানুষ অ-মানবদের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি হারিয়েছে।

লিওপল্ড তাঁর ভূ-নীতিবিদ্যাকে "সাংস্কৃতিক বিবর্তনের সম্ভাব্যতা" হিসাবে দেখতে চান।[১৩৬] তাঁর ভূ-নীতিবিদ্যা সমষ্টিবাদী। কেননা এ ধরনের বিবর্তন ভবিষ্যতে ভূ-সম্প্রদায়ের পরিধিকে বিস্তৃত করবে যাতে অন্যান্য প্রাকৃতিক উপাদান এতে অন্তর্ভূক্ত হতে পারে এবং প্রকৃতির সবকিছু নৈতিক বিবেচনার বিষয় হিসাবে পরিণত হয়। তিনি বলেন, ভূ-নীতিবিদ্যা সরলভাবে সম্প্রদায়ের সীমাকে বিস্তৃত করে তার মধ্যে মাটি, পানি, উদ্ভিদ ও অ-মানব প্রাণী, অথবা সামগ্রিকভাবে বললে ভূমিকে অন্তর্ভূক্ত করে।[১৩৭]

লিওপোল্ডের মতে, ভূমির সাথে নৈতিক সম্পর্কের পাশাপাশি এর প্রতি ভালবাসা, শ্রদ্ধা, প্রশংসা এবং এর মূল্যকে উপলব্ধি করা উচিত। তিনি বলেন যে, এটা আমার কাছে অকল্পনীয় যে ভূমির প্রতি নৈতিক সম্পর্ক ভালবাসা, শ্রদ্ধা এবং ভূমির জন্য প্রশংসা এবং এর মূল্যকে সম্মান না করেই থাকতে

পারে।" মূল্য বলতে আমি অবশ্যই সাধারণ আর্থিক মূল্যমানের চাইতে ব্যাপক কিছুকে গণ্য করছি। আমি দার্শনিক (স্বতঃমূল্য) অর্থে গণ্য করছি।[১৩৮]

দৈনন্দিন জীবনে আমরা বিভিন্ন প্রকার সমস্যার সম্মুখীন হই। এর সব সমস্যা অর্থনৈতিক সমস্যা নয়। অর্থনৈতিক সমস্যা দূর করতে চাইলে অন্য সমস্যার সৃষ্টি হয়। লিওপোল্ডের মতে: নৈতিকতার বিবর্তন প্রক্রিয়ার জন্য যে প্রতিবন্ধকতাকে অপসারণ করা প্রয়োজন তা হলো, ভূমির ব্যবহারকে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা থেকে বিরত থাকা। ভূমি ব্যবহারের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রতিটি প্রশ্নকে অর্থনৈতিক উপযোগিতার দিক থেকে বিবেচনার পাশাপাশি নৈতিক ও নান্দনিক যথার্থতার দিক থেকেও বিবেচনা করা উচিত। অর্থাৎ ভূমি বিপন্নতার জন্যে তিনি কেবল অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে দায়ী করেন। অন্যদিকে এ থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য তিনি নৈতিক ও নান্দনিক মূল্যবোধকে গুরুত্ব দিয়েছেন। ভূমিকে আমরা কিভাবে দেখব ? এমন উত্তর তিনি একটি নীতির কথা বলেন। নীতিটি হলো যা জীবজগতের অখন্ডতা, স্থায়িত্ব এবং সৌন্দর্যকে অক্ষুন্ন রাখে তা-ই ন্যায়, এর পক্ষান্তরে করা হলে তা হবে অন্যায়।[১৩৯] অর্থাৎ জীবীয় সম্প্রদায়ের অখন্ডতা, স্থায়িত্ব, ও সৌন্দর্য হলো মূল্যযুক্ত। তাই জীবীয় সম্প্রদায়ের এই মূল্যগুলোকে সংরক্ষণ করতে হবে। মানুষ সবকিছু পরিবর্তনের ক্ষমতা রাখে তাই মানুষের উচিত সমগ্র পৃথিবীকে একটি ভূ- সম্প্রদায় হিসাবেই গণ্য করা।

লিওপোল্ডের ভূমি নীতিবিদ্যায় দেখা যায় যে, এতে একদিকে অমানব প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতকে নৈতিক বিবেচনার অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলে। আবার বিপরীতে অ-মানব প্রাণীহত্যা, বৃক্ষকর্তন ইত্যাদি কর্মকান্ডকেও অনুমোদন দেয়। যেমন জীবীয় সম্প্রদায়ের অখন্ডতা, স্থায়িত্ব ও সৌন্দর্য রক্ষার জন্য হরিণ এর পরিমাণ বাড়ার সমস্যাটির জন্য কিছু পৃথক সাদা লোমযুক্ত হরিণ হত্যা করার অনুমোদন দেয়া হয়।[১৪০]

ক্যালিকট আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন যে, বিবর্তনবাদী এবং বাস্তুশাস্ত্রের জীববিজ্ঞান পরিস্থিতিটি লিওপোল্ডের এ বক্তব্য দ্বারা উন্মোচিত হয়: আমরা ভূমিটিকে অপব্যবহার করি কারণ আমরা এটিকে আমাদের নিজস্ব পণ্য হিসেবে বিবেচনা করি। আমরা যদি ভূমিকে আমাদের সম্প্রদায় হিসেবে দেখি তখন আমরা এটিকে ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধার সাথে ব্যবহার করতে পারি।[১৪১]

মূলত লিওপোল্ড নীতিবিদ্যা কে সংজ্ঞায়িত করেন এভাবে: বাস্তুবিদ্যাগত দিক থেকে বিচার করলে নৈতিকতার কাজ হল অস্তিত্বের জন্য সংগ্রামের ক্ষেত্রে কর্মের স্বাধীনতার সীমা নির্দেশ করা।

অন্যদিকে দার্শনিক দিক দিয়ে নৈতিকতার কাজ হলো সামাজিক আচরণ থেকে সমাজ বিরুদ্ধ আচরণকে পৃথক করা।[১৪২]

২.৭.৩.২ গভীর বাস্তুবিদ্যা :

গভীর বাস্তুবিদ্যা নরওয়ের বাস্তুবিদ ও দার্শনিক আর্নে নায়েস দ্বারা প্রবর্তিত একটি সমসাময়িক পরিবেশগত আন্দোলন। নায়েস ছাড়াও বিল দেভাল (Bill Devall) এবং জর্জ সেশনস (George Sessions) গভীর বাস্তুবিদ্যাকে সমর্থন করেন। আর্নি নায়েস নিবিড় বাস্তবিদ্যাকে দার্শনিক মতবাদ হিসেবে আখ্যায়িত না করে দার্শনিক আন্দোলন হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। কারণ এখানে কেবল দার্শনিক মত নয় বরং রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মতের প্রতিফলনও রয়েছে। এই আন্দোলন অ-মানব প্রাকৃতিক সত্তাকে স্বতঃমূল্যে মূল্যবান মনে করে। এ মতবাদের মূল নীতিবিদ্যাগত অবস্থান অ-মানবকেন্দ্রিক।

গভীর বাস্তুবিদ্যা এক ধরনের বাস্তুবিদ্যাগত সচেতনতা। গভীর বাস্তুবিদগণ মনে করেন যে, তাদের নীতিমালা দ্বারা অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত ও দার্শনিক কাঠামোগত পরিবর্তন করে পরিবেশগত সমাধান পেতে পারে। এ মতবাদ "প্রকৃতির প্রতি পরিবেশগত দৃষ্টিভঙ্গি" ধারণার ভিত্তিতে হলেও দাবি করে যে, এর নীতিগুলি যুক্তিবিদ্যা বা বাস্তুবিজ্ঞান থেকে উদ্বৃত্ত হতে পারে না।[১৪৩]

যেসব দার্শনিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মতবাদের মধ্যে গভীর বাস্তুবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে সেসব মতবাদের সমর্থকদের ঐক্যবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে গভীর বাস্তুবিদ্যার আটটি মূলনীতির একটি প্লাটফর্ম তৈরি করা হয়। Devall এবং Sessions গভীর বাস্তুবিদ্যার আটটি মূলনীতি উপস্থাপন করেন, যা প্রকৃতপক্ষে Naess এবং Session দ্বারা গঠিত হয়।[১৪৪] এগুলো হলোঃ

১. পৃথিবীতে মানুষ ও অ-মানব জীবনের মঙ্গল ও বিকাশ লাভ করার নিজস্ব স্বতঃমূল্য রয়েছে (প্রতিশব্দ: অন্তর্নিহিত মূল্য, সহজাত মূল্য)। অমানব জীবনের মূল্য মানুষের উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে ব্যবহৃত হওয়ার উপর নির্ভরশীল নয়।

২. জীববৈচিত্র্য ও জীবসমৃদ্ধি স্বগতঃ মূল্যে (Value in Themselves) মূল্যবান এবং পৃথিবীতে মানুষ ও অ-মানব জীবনের সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে অবদান রাখে।

৩. মানুষের অত্যাবশ্যকীয় চাহিদা পূরণ ব্যতীত অন্য কোন প্রয়োজনে জীববৈচিত্র্য ও জীবসমৃদ্ধির ক্ষতিসাধন করার কোন অধিকার রাখেনা।

৪. মানুষের জীবন ও সংস্কৃতির বিকাশ মানব জনসংখ্যার বাস্তবসম্মত হ্রাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং অ-মানব জীবনের বিকাশের জন্যও এ হ্রাসের প্রয়োজন।

৫. বর্তমানে অ-মানব জগতের উপর মানুষের হস্তক্ষেপ অত্যাধিক এবং পরিস্থিতি দ্রুত খারাপের দিকে যাচ্ছে।

৬. জীবনের অবস্থার গুরুত্বপূর্ণ উন্নতির জন্য নীতিনির্ধারণী ক্ষেত্রে পরিবর্তন প্রয়োজন। এ পরিবর্তন অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত ও আদর্শগত মৌলিক কাঠামোর ক্ষেত্রে সাধিত হবে।

৭. আদর্শগত পরিবর্তনের অর্থ হল, উচ্চমানের জীবনযাত্রার চেয়ে জীবনের গুনগতমানের প্রতি গুরুত্ব দেয়া। এতে বৃহৎ এবং মহৎ এর পার্থক্যের প্রতি গভীর সচেতনতা সৃষ্টি হবে।

৮. উপরোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি যাদের সম্মতি আছে তারা এই অপরিহার্য পরিবর্তন সাধনের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করাকে কর্তব্য বলে মনে করবেন।

আর্নে নায়েস গভীর বাস্তুবিদ্যার দুটি চূড়ান্ত আদর্শ অনুমোদন করেন। এগুলো হল আত্মোপলব্দি (Self-realization) এবং জীবকেন্দ্রিক সমতা (Biocentric Egalitarianism)। এই দুটি আদর্শ অন্য কোন মৌলিক নীতি থেকে নির্দেশিত হয় না। এগুলো গভীর বাস্তবিদ্যার নৈতিক যথার্থতা প্রতিপাদনের শেষ স্তর। আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এগুলোর বৈধতা প্রমাণ করা যায় না।[১৪৫] বরং গভীর জিজ্ঞাসার মাধ্যমে এ দুইটি আদর্শে পৌঁছানো যায়। নায়েস জীবকেন্দ্রিক সমতাকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে: জীবমন্ডলের সকল জীবনধারণ আত্মবিকাশের সমান অধিকারী। প্রত্যেক জীবেরই পৃথক আকারের পূর্ণতা অর্জনের এবং বৃহত্তর সমগ্র আত্মোপলব্ধির মধ্যে ব্যক্তির আত্মার উপলব্ধির সমানাধিকার আছে। এক্ষেত্রে মৌলিক উপলব্ধি হল বাস্তুমন্ডলের প্রতিটি জীব ও সত্তা আন্তঃসম্পর্কে সম্পর্কিত সমগ্রের অংশ এবং এদের প্রত্যেকেই স্বতঃমূল্যের দিক থেকে সমান মূল্যবান।[১৪৬]

উল্লেখ্য যে লিওপোল্ড যখন তাঁর ভূ-নীতিবিদ্যায় মানুষকে জীব সম্প্রদায়ের মালিক নয় বরং সাধারণ সদস্য হিসেবে অভিহিত করে তখন তা জীবনকেন্দ্রিক সমতার ধারণা হিসেবে প্রকাশিত হয়।

দ্বিতীয় চূড়ান্ত আদর্শ হলো আত্মোপলব্ধি। আত্মোপলব্ধি হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে মানুষ নিজের অস্তিত্বকে প্রকৃতির অন্য সবকিছুর সঙ্গে আন্তঃসম্পর্কের সম্পর্কিত বলে উপলব্ধি করে। নায়েসের মতে আমরা গভীর জিজ্ঞাসার মাধ্যমে এক ধরনের আধ্যাত্মিক যাত্রার মধ্য দিয়ে বাস্তুগতভাবে সচেতন হয়ে উচ্চস্তরে পৌঁছাতে পারি।[১৪৭] গভীর বাস্তুবিদ্যার ক্ষেত্রে প্রতিটি ব্যক্তি পৃথক অস্তিত্ব নয়, প্রতিটি জীব বাস্তুতন্ত্রের সাথে সংযুক্ত থাকে। জীবকেন্দ্রিক সমতা মূলতঃ আত্মোপলব্ধির

সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। অর্থাৎ আমরা প্রকৃতির অন্যান্য অংশগুলোর যে ক্ষতি করি তা প্রকৃতপক্ষে আমাদের নিজের জন্য ক্ষতির কারণ হিসেবে দেখা হয়।

গভীর বাস্তুবিদ্যার আত্মোপলব্ধির আদর্শ আধুনিক পাশ্চাত্যের 'আত্মার ধারণা' থেকে ব্যাপক এবং বিশ্বের অনেক ধর্মের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। আধুনিক পাশ্চাত্যে আত্মা হলো এমন একটি বিচ্ছিন্ন 'অহং' যা প্রধানত সুখবাদী সন্তুষ্টি অর্জন বা সংকীর্ণ অর্থে ব্যক্তিসত্তার ইহজাগতিক বা পারলৌকিক মুক্তির চেষ্টায় রত।... এভাবে আমরা আমাদের অন্যান্য আধ্যাত্মিক ব্যক্তিসত্তাকে অনুসন্ধানে রত হই।... কিন্তু গভীর বাস্তুবিদ্যাগত অর্থে আত্মার ধারণার জন্য অধিকতর পরিপক্কতা ও বিকাশের প্রয়োজন । এই আত্মার জন্য এমন এক স্বকীয়তা প্রয়োজন যা মানব জগতের উর্ধ্বে উঠে অ-মানব জগতকেও অন্তর্ভূক্ত করে। এজন্য আমাদেরকে অবশ্যই সমকালীন সংকীর্ণ সাংস্কৃতিক পূর্ব স্বীকৃত ধারণা ও মূল্যবোধ এবং আমাদের স্থান-কালিক প্রথাসিদ্ধ প্রজ্ঞার উর্ধ্বে ওঠে সবকিছুর দিকে তাকাতে হবে। ধ্যানের স্তরে গভীর জিজ্ঞাসার মাধ্যমে এই আত্মোপলব্ধির সর্বোত্তম অর্জন সম্ভব। কেবল এ উপায়ে আমরা পরিপূর্ণ ব্যক্তিসত্তা ও অনন্যতা অর্জনের আশা করতে পারি।[১৪৮]

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, গভীর বাস্তুবিদ্যা নৈতিকতার বিষয়বস্তুর দিক থেকে অমানবকেন্দ্রিক ও বাস্তুকেন্দ্রিক । এর মূলকথা হলো অ-মানব সত্তার বা বাস্তুতন্ত্রের অ-যন্ত্রতুল্য অর্থে স্বতঃমূল্য আছে। সুতরাং বলা যায় 'মানুষ নৈতিক বিবেচনায় একমাত্র বিষয়বস্তু' এই সনাতনী নৈতিক মানবকেন্দ্রিক ধারণা যে অযথার্থ তা প্রমাণের পক্ষে ভূ-নীতিবিদ্যা ও অগভীর বাস্তুবিদ্যা যথেষ্ট। সংক্ষেপে বলা যায়, গভীর বাস্তুবিদগণ যেহেতু দৃঢ়ভাবে দাবি করেন যে, "Whole system is superior to any of its part"। ফলে তারা মানুষের দ্বারা প্রকৃতির শোষণের বিরুদ্ধে অবস্থান করে। এবং তারা বায়োটিক সম্প্রদায়ের সদস্যদের সাম্যতার প্রয়োজনীয়তা, মানব ও অ-মানবের আন্তঃনির্ভরশীলতার বিশ্বাসী। তারা দাবি করেন যে, বৈচিত্র্য ও মিথস্ক্রিয়া মানুষ এবং অন্যান্য জীব উভয়ের জন্য সুবিধাজনক। প্রকৃতির সাথে মানুষের আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণের চেয়ে সহযোগিতা এবং মিথস্ক্রিয়া ভাল। পরিশেষে G. Devall এবং G. Sessions বলেন, "আমরা স্বীকার করি য়ে, গভীর বাস্তুবিদগণ প্রকৃতির সাথে সম্প্রীতির প্রক্রিয়াটি উত্থাপন এবং উৎসাহ দেওয়ার জন্য পরামর্শ দিতে পারে তবে এমন কোনও মহৎ সমাধান নেই যা আমাদেরকে আমাদের নিজেদের থেকে রক্ষা করতে পারে।"[১৪৯]

হোমস রলস্টন প্রকৃতির অ-মানব অংশগুলির স্বতঃমূল্যকে স্বীকার করেন। তিনি তাঁর "Value in Nature and the Nature of Value" নামক আর্টিকেলে বিষয়গত

(Objective) মূল্যের সমর্থন করেন এবং দাবি করেন যে, মূল্য বিষয়ী বা মূল্যায়নকারীর উপর নির্ভরশীল নয়, মূল্যায়নকারী নিরপেক্ষভাবে কোন বস্তু এ মূল্য ধারণ করে।[১৫০] তাই এটা বলা যাবে না যে মানুষ আসার আগে পৃথিবীতে কোন মূল্য ছিল না। রলস্টন যুক্তি দেন যে, কোন মূল্যের অস্তিত্ব কোন মূল্যায়নকারীর অস্তিত্বকে অনুমান করে না। তিনি বলেন, আইনজীবী ছাড়া আইন, ইতিহাসবিদ ছাড়া ইতিহাস, জীববিজ্ঞানী ছাড়া জীববিজ্ঞান [...] গল্পকার ছাড়া গল্প হতে পারে ।"[১৫১] মূল্যের কেবল মূল্যায়নকারীর সচেতনতা প্রয়োজন যা এটির মূল্য বোঝে এবং প্রকাশ করে। মানুষের কেবল বিদ্যমান মূল্যের উপর আলোকপাত করে যা আগে থেকেই আছে। রলস্টনের মতে- "We carry the lamp that light up value, although we require fuel that nature provides."[১৫২]

রলস্টন যুক্তি দেন যে, মানুষ একমাত্র অনন্য মূল্যবান নয়। প্রাণী, প্রজাতি ইত্যাদিও মূল্য তৈরী করতে পারে অর্থাৎ তারাও মূল্যবান। আমরা যখন প্রাণীদের দিকে তাকাই তখন দেখতে পাই প্রাণী যেকোন বিপদ থেকে নিজেকে রক্ষা করে। এটি বলা যেতে পারে যে একটি প্রাণীর নিজের মধ্যে যা আছে তার জন্য নিজের জীবনকে মূল্য দেয়। তারা তাদের বাচ্চাদের দেখাশোনা করে এবং তাদের লালন পালন করে ইত্যাদি। উদাহরণস্বরূপ, একটি মা বিড়াল তার বিড়ালছানাকে মূল্য দিতে সক্ষম। ফলে রলস্টন বলেন যে, প্রাণী জীবনের স্বতঃমূল্য আছে।[১৫৩] যখন আমরা জীবের দিকে তাকাই তখন দেখতে পাই যে, সেগুলো আত্ম-রক্ষণাবেক্ষণের পদ্ধতি, নিজেদের পুনরুৎপাদন ইত্যাদি করতে পারে। তাই যদি প্রশ্ন করা হয় গাছ নিজের মূল্য দিতে সক্ষম কিনা তখন উত্তর দেয়া যেতে পারে যে, উদ্ভিদ সূর্য, জল, বৃষ্টি, পুষ্টি ইত্যাদিকে মূল্য দিতে সক্ষম হয় কারণ এটি উদ্ভিদের অস্তিত্বের জন্য প্রয়োজনীয়। যেহেতু এটি নিজের জীবনের জন্য নিজের জীবনকে রক্ষা করে, তাই রক্ষা করাই হল প্রাণীর মূল্যবান অবস্থা। প্রজাতি সম্পর্কে রলস্টন দাবি করেন যে, তারাও মূল্যবান। প্রজাতির প্রজন্ম এবং ধারাবাহিকতা হল প্রজাতির মূল্য। প্রতিটি প্রজাতির অস্তিত্বের জন্য, পরবর্তী প্রজন্মের জন্য নিজেকে ত্যাগ করে। রলস্টন বাস্তুতন্ত্রের মূল্য-দক্ষতা সম্পর্কেও কথা বলেছেন।

তিনি বলেন যে, মানুষ বাস্তুসংস্থানকে স্বতঃমূল্যের পাশাপাশি ব্যবহারিক মূল্যও দেয়। যাহোক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল বাস্তুতন্ত্র কি নিজেরাই মূল্য দিতে সক্ষম হয়?[১৫৪] রলস্টন দাবি করেন, আমরা অনুমান করে নিতে পারি যে, বাস্তুসংস্থানের মূল্য আছে। আমরা যদি বাস্তুসংস্থানকে পরীক্ষা করি তাহলে দেখি তারা নিজেদের রক্ষা করে না, তাদের কোনো আত্মপরিচয় নেই এবং আমরা যে যত্ন নিতে পারি সে সম্পর্কে তাদের কোনো আগ্রহ নেই। তাছাড়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে

বাস্তুতন্ত্রের মূল্যায়ন করলে রলস্টনের মতের বিরোধী হবে। তিনি বলেন যে বাস্তুতন্ত্রের স্বতঃমূল্য বা ব্যবহারিক মূল্য নেই তবে পদ্ধতিগত মূল্য আছে। তিনি বলেন, বাস্তুতন্ত্রের নির্বাচনী শক্তি পৃথক উদ্ভিদ এবং প্রাণী জীবন উৎপন্ন করে। সুতরাং বাস্তুতন্ত্রের ক্ষেত্রে যে জিনিসটি মূল্য তৈরি করতে সক্ষম হয় তা হল বাস্তুতন্ত্রের উৎপাদনশীলতা, যা একটি সিস্টেমের অস্তিত্বকে নিয়ে আসে।[১৫৫] অন্যকথায়, বাস্তুতন্ত্রের প্রক্রিয়াটি মূল্যবান। এটি বলা যেতে পারে যে, রলস্টন প্রকৃতির যেকোনো কিছুকেই মূল্যবান বলে মনে করেন।

J. Baird Callicott লিওপোল্ডের পরিবেশকেন্দ্রিকতাবাদকে সমর্থন করেন। তিনি দাবি করেন যে, নতুন অ-মানবকেন্দ্রিক পরিবেশ নীতিবিদ্যা কেবল ব্যক্তি নয় সমগ্রকে প্রাধান্য দেয় এবং স্বতঃমূল্যকে এভাবে বিবেচনা করে: অ-মানবকেন্দ্রিক পরিবেশ নীতিবিদ্যার জন্য একটি পর্যাপ্ত মূল্যতত্ত্ব অবশ্যই একক জীব এবং অতিসংঘটিত সত্তা যেমন, জনসংখ্যা, প্রজাতি, জীবকোষ, বায়োমস এবং বায়োস্ফিয়ার এর বংশগতির জন্য সরবরাহ করতে হবে। বন্য, গৃহপালিত প্রাণী এবং অন্যান্য প্রজাতির জন্য পৃথক স্বতন্ত্র স্বতঃমূল্য প্রদান করা উচিত। এটি অবশ্যই বিবর্তনমূলক এবং বাস্তুগত জীববিজ্ঞানের সাথে ধারণাগতভাবে একত্রিত হতে হবে। এবং এটি অবশ্যই আমাদের বর্তমান বাস্তুতন্ত্রের জন্য স্বতঃমূল্য সরবরাহ করবে তবে সমান মূল্য হবে না।[১৫৬]

প্রকৃতপক্ষে ক্যালিকট লিওপল্ডের ভূমি নীতিবিদ্যার বৈচিত্র্যকে সমর্থন করেন। যা মূলত: হিউমের মূল্যবিদ্যার উপর নির্ভর করে ডারউইনের বিবর্তনের ব্যাখ্যা করেন। পরে তিনি প্রকৃতি এবং মানুষের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা কাটিয়ে উঠার জন্য কোয়ান্টাম পদার্থ বিজ্ঞানের দারস্থ হন।[১৫৭] ক্যালিকট অ-মানবকেন্দ্রিক পরিবেশ নীতিবিদ্যা সূত্রপাত করেন যা মূলত মানবকেন্দ্রিক এবং তিনি একে truncated স্বতঃমূল্য তত্ত্বের ভিত্তিতে উপস্থাপন করেন। তিনি হিউমের বিষয়ীবাদী সংবেদনশীল মূল্যবিদ্যা (Subjectivist sentimental axiology) অনুসারে তার বিষয়ীগত তত্ত্বটির ভিত্তি তৈরী করেন। তাঁর মতে হিউমের মূল্যবিদ্যা পর্যাপ্ত পরিবেশগত নৈতিক বিকাশের জন্য যথেষ্ট, কারণ এটি যন্ত্রতুল্য মূল্য ও স্বতঃমূল্যর মধ্যে খুব অকৃত্তিম এবং স্বতন্ত্র পার্থক্য প্রদান করে।[১৫৮]

যেহেতু জে.বি.ক্যালিকট ভূমি নীতিবিদ্যার সমর্থক তাই তিনি ভূমি নীতিবিদ্যার ক্ষেত্রে পরিবেশ ফ্যাসিবাদের অভিযোগকে কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করেন। তিনি উত্তর দেন, এটাই সুস্পষ্ট যে নীতিবিদ্যার বিকাশে প্রতিটি নতুন পর্যায়ের আগমনের সাথে সাথে পুরানো পর্যায়গুলি বাতিল বা প্রতিস্থাপন করা হয় না, তবে যুক্ত করা হয়।[১৫৯] উদাহরণস্বরূপ, রাহী একটি দেশের নাগরিক আবার পাশাপাশি একটি পরিবারের সদস্য এবং একটি পৌরসভার বাসিন্দা। তিনি বলেন যে, এটা স্পষ্ট যে,

কোন দেশের নাগরিক দায়িত্বগুলো (যেমন, কর প্রদান, সামরিক শুল্ক পরিবেশন করা) পালন করার সাথে সাথে কোন পরিবারের দায়িত্বগুলো বাতিল বা প্রতিস্থাপন করে না।

২.৭.৩.৩ পরিবেশকেন্দ্রিকতাবাদের সমস্যা :

পরিবেশকেন্দ্রিকতাবাদের প্রধান আপত্তি হল বিশেষত ভূমি নীতিবিদ্যা যা টম রেগান দ্বারা উত্থাপিত পরিবেশ ফ্যাসিবাদের দ্বারা অভিযুক্ত। যেহেতু পরিবেশকেন্দ্রিকতাবাদ প্রজাতি, বায়োটিক সম্প্রদায়ের অখন্ডতা, স্থিতিশীলতা এবং সৌন্দর্য রক্ষার জন্য একক (individuals) এর বিসর্জনকে স্বীকার করে। রেগান লিওপোল্ডের দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করেন। লিওপোল্ডের সামগ্রিক মতবাদ অনুসারে ভাল-মন্দ বা ন্যায়-অন্যায় শুধু সমাজবদ্ধ মানুষের পারস্পরিক আচরণের মাঝে সীমাবদ্ধ নয়, বাস্তুতন্ত্রের প্রতি আমাদের আচরণের দিকও এখানে অন্তর্ভূক্ত। সমগ্রের মাঝে মানুষের অবস্থান, ভূমিকা ও মর্যাদাকে তার ব্যাখ্যায় জীবতাত্ত্বিক সত্তায় পরিণত করা হয়েছে বলে অনেক দার্শনিক মনে করেন। জীবতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ছাড়াও মানুষের উচ্চতর বৈশিষ্ট্যগুলো উপেক্ষিত হয়েছে বলে তারা মনে করেন। এক্ষেত্রে লিওপোল্ডের সমগ্রবাদকে কখনো পরিবেশগত ফ্যাসিবাদ কখনো সর্বনিয়ন্ত্রণবাদ (Totalitarianism) হিসাবে সমালোচনা করা হয়েছে।[১৬০] উদাহরণস্বরূপ, ধরে নিই যে আমরা এমন একটি অনিবার্য অবস্থানের মুখোমুখি হয়েছি। সেখানে আমাদেরকে হয় বিরল বনফুল বা এমন একজন মানুষ যিনি অসংখ্য জনসংখ্যার মধ্যে একজন সাধারণ মানুষ দুটির মধ্যে একজনকে রাখা যাবে। লিওপোল্ডের মতবাদ অনুসারে, সেটাকেই সংরক্ষণ করা দরকার যা বায়োটিক সম্প্রদায়ের সততা, স্থায়িত্ব এবং সৌন্দর্যে আরও অবদান রাখতে পারবে। সুতরাং যদি বিলুপ্তপ্রায় বনফুল যা বায়োটিক সম্প্রদায়ের সদস্য একজন মানুষের চেয়ে বেশি সততা, স্থায়িত্ব এবং সৌন্দর্যে অবদান রাখতে পারে তবে ঐ ব্যক্তিকে হত্যা করা নৈতিকভাবে ভুল হবে না। সুতরাং এ মতবাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে বলা যায় "গ্রহকে বাঁচাতে নিজেকে হত্যা করুন।"

আরো ব্যাপকভাবে বলা যায়, যেহেতু লিওপোল্ডের মতে, মানুষ ও প্রকৃতির একই মর্যাদা রয়েছে। অর্থাৎ মানুষ বায়োটিক সম্প্রদায়ের নিছক সাধারণ সদস্য, তাই যদি মনে হয় মানুষের জনসংখ্যা অত্যধিক পরিমাণে পৌঁছে যায় তবে ভূমি নীতিবিদ্যা নীতিগতভাবে বায়োটিক সম্প্রদায়ের অখন্ডতা, স্থিতিশীলতা এবং সৌন্দর্য রক্ষার নামে কিছু কমানোর অনুমতি দেয়। অন্য কথায়, যদি মানুষ বায়োটিক সম্প্রদায়ের কেবল সরল সদস্য হন এবং মানুষ যদি পরিবেশগত সমস্যার কারণ হয় তবে মানুষের সংখ্যা কমানোর জন্য কিছু মানুষকে হত্যা করবো না কেন যাতে পরিবেশ ধ্বংসের পরিমাণ হ্রাস পায়? টম রেগান The case for Animal Rights গ্রন্থে ভূমি নীতিবিদ্যার বিষয়টিকে

পরিবেশ 'ফ্যাসিবাদ' বলে অভিহিত করেছেন। তিনি এটাকে এভাবে ব্যাখ্যা করেন: অধিকার দৃষ্টিভঙ্গি এ অবস্থানটি মেনে নেয় না। কারণ অধিকার দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টভাবে নির্জীব বস্তুর অধিকারকে অস্বীকার করে। ... পরিবেশগত ফ্যাসিবাদ এবং অধিকারের দৃষ্টিভঙ্গি তেল এবং পানির মতো, এগুলো একে অন্যের সাথে মিশে না।[১৬১]

অন্যভাবে আপত্তি উঠে যে, মানুষের সাথে যদি গাছের সমান অধিকার থাকে তবে আমরা কি গাছ কাটার সময় তা হত্যা করছি না? এ সূত্রে যা সমালোচিত হয় তা হল "অধিকারের" ধারণা। গভীর বাস্তুবিদ বিল দেভাল বলেন, মনে হচ্ছে অধিকারের কথা বলতে গেলে অনেকে পাশ্চাত্য দর্শনের প্রাকৃতিক অধিকার তত্ত্ব এবং সর্বজনীন মানবাধিকার মতবাদকে অন্যান্য প্রাণীদের অধিকারের সাথে ব্যাখ্যা করে ফেলেন।[১৬২]

দেভাল এ ব্যাখ্যার বিষয়ে আপত্তি করেন এবং বলেন, গভীর বাস্তুবিদগণ যখন অধিকার শব্দটি ব্যবহার করেন সত্যিই তারা 'অধিকার' শব্দটির অপ্রতুলতা সম্পর্কে অবগত হন। গভীর বাস্তুবিদদের তিনি মনে করিয়ে দেন যে, নায়েস এ ধারণাগুলি (যেমন অধিকার, জীবনকেন্দ্রিক সমতা ইত্যাদি) যত্নসহকারে ব্যবহার করেন। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেছেন, নীতিগতভাবে সকলেরই জীবনের 'অধিকার' থাকে।"

পরিবেশকেন্দ্রিকতাবাদের আরও একটি অসুবিধা হল, কিছু কিছু অ-মানব সত্তার স্বার্থ ব্যাখ্যা করা অত্যন্ত চ্যালেঞ্জের বিষয়। উদাহরণস্বরূপ, পর্বতমালার জন্য ভাল কি? রিচার্ড ওয়াটসন যিনি অ-মানবকেন্দ্রিক নীতিবিদ্যার সমালোচনা করেছেন তিনি দাবি করেন যে,

তথাকথিত অ-মানবকেন্দ্রিক নীতিবিদ্যা আসলে মানবকেন্দ্রিকের হৃদয়ে থাকে:

"What would it be, after all, to think like a mountain as Aldo Leopold is said to have recommended? It would be anthropocentric because mountains do not think, but also because mountains are imagined to be thinking which human interests in their preservation or development they prefer."[১৬৩]

সামাজিক বাস্তবতা গভীর বাস্তুবিদ্যাকে প্রত্যাখ্যান করে। এটি বিশ্বাস করা হয় যে, গভীর বাস্তুবিদরা পরিবেশগত সমস্যা কর্তৃত্ববাদ এবং সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসের মধ্যে সংযোগকে উপেক্ষা করে। তাদের মতে পরিবেশ দূষণের প্রকৃত কারণ এবং পরিবেশগত সংকট মানুষের সামাজিক মিথস্ক্রিয়াতে

থাকে। পরিবেশ বাস্তুতান্ত্রিকভাবে টেকসই থাকলেও সামাজিকভাবে দুর্ব্যবহারের মুখোমুখি হয়।[১৬৪] ফলস্বরূপ বিল দেভাল পরিবেশকেন্দ্রিকতাবাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেন। তাছাড়া লিওপোল্ডের সামগ্রিক মতবাদে সবকিছুর উর্ধ্বে সমগ্রের স্বার্থকে স্থান দেওয়া হয়। নৈতিক সমগ্রবাদ অনুসারে ব্যক্তির স্বার্থের চেয়ে সমগ্রের স্বার্থকে রক্ষা করা উত্তম। সমালোচকদের মতে, লিওপোল্ডের অখন্ডতার নীতি বাস্তুতন্ত্রের খন্ডতাকে অধিক গুরুত্ব দিতে গিয়ে মানুষের স্বার্থকে উপেক্ষা করেছে। তাছাড়া লিওপোল্ডের অখন্ডতার নীতিটি প্রাকৃতিকীয় হেত্বাভাসের (Naturalistic fallacy) দোষে দুষ্ট।[১৬৫] প্রাকৃতিকীয় হেত্বাভাস অনুসারে মূল্য সম্পর্কিত অবধারণ ঘটনা থেকে অনুসৃত হতে পারে না। কিন্তু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, লিওপোল্ডের অখন্ডতার নীতিতে তিনি ঘটনামূলক বচন থেকে ঔচিত্যমূলক বচনে অনুসৃত করেন। প্রাকৃতিক হেত্বাভাস অনুসারে মূল্য বচন ও ঘটনা বচনের মধ্যে শ্রেণীগত পার্থক্য থাকায় একটি অপরটির ভিত্তি হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না।

২.৮ মানবকেন্দ্রিকতাবাদের সাথে অ-মানবকেন্দ্রিকতাবাদের পার্থক্যঃ

অ-মানবকেন্দ্রিকতাবাদ প্রকৃতির প্রতি অ-মানব অংশগুলির স্বতঃমূল্য আছে এ কথা বলার মূলত উদ্দেশ্য হল প্রকৃতির অত্যাধিক শোষণকে প্রতিরোধ করা। তারা মনে করে কেবল মানুষকে স্বগত লক্ষ্যসম্পন্ন (end in itself) ভেবে প্রকৃতিকে যন্ত্রের ন্যায় ব্যবহার করার মানসে মানবকেন্দ্রিক মতবাদ গড়ে উঠে। আবার মানবকেন্দ্রিকতাবাদ অ-মানবকেন্দ্রিকতাবাদকে পরিবেশ সুরক্ষার হাতিয়ার মনে করে না। তাই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত। নিম্নে দু'ধরণের মানবকেন্দ্রিকতাবাদের সাথে অ-মানবকেন্দ্রিকতাবাদের পার্থক্যগুলো পৃথকভাবে আলোচনার চেষ্টা করছি।

সবল মানবকেন্দ্রিকতাবাদের সাথে অ-মানবকেন্দ্রিকতাবাদের পার্থক্যঃ

১. সবল মানবকেন্দ্রিক মতবাদ বিভিন্ন সত্তার মাঝে মানুষকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে দুটি কারণে– ক. মানুষ যুক্তিবাদী; খ. নৈতিক প্রাণী। অ- মানবকেন্দ্রিক মতবাদ এমন পার্থক্যকে অস্বীকার করে এবং মনে করে যে, অ-মানব প্রাণীর মাঝে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা মানুষের নেই যেমন, কুকুরের তীব্র ঘ্রাণশক্তি, কবুতরের বাড়ি ফেরা, কচ্ছপের পানিতে বাস করা, চিতাবাঘের গতি, কিংবা গরুর জাবর কাটা। সবল মানবকেন্দ্রিকতাবাদীরা মনে করেন যে, অন্যান্য প্রাণীর এসব বৈশিষ্ট্যের চেয়ে মানুষের উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যগুলো শ্রেষ্ঠ। কিন্তু অ-মানবকেন্দ্রিকতাবাদীরা মনে করেন এমন মনোভাব যৌক্তিকভাবে সিদ্ধ নয়। তাদের দাবি

বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশদায়ক অনেক বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে কিন্তু এর দ্বারা কোনো প্রজাতিকে অপর প্রজাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দাবি করা চক্রক দোষে দুষ্ট বলে বিবেচিত হবে।[১৩৯] এখানে অ- মানবকেন্দ্রিকতাবাদীদের দাবি হল মানুষ তার দৃষ্টিকোণ থেকে নিজেকে শ্রেষ্ঠ দাবি করছে, অন্যান্য প্রজাতিও তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে নিজেদেরকে শ্রেষ্ঠ বলে দাবি করতে পারে। কেননা তাদেরও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা মানুষের নেই। অ-মানব প্রজাতির স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য যেমন, কবুতরের বাড়ি ফেরা, চিতাবাঘের গতি, ভেড়া ও গবাদিপশুর অনুধ্যানশীল ক্ষমতা ইত্যাদি মানুষের মধ্যে অনুপস্থিত।

২. সবল মানবকেন্দ্রিকতাবাদ প্রকৃতির উপর মানুষের কর্তৃত্ব, শোষণ এবং ভোগের অনুমতি দেয়। পক্ষান্তরে অ- মানবকেন্দ্রিকতাবাদ অ-মানব প্রাকৃতিক সত্তার কোনরূপ ক্ষতি করতে উৎসাহ দেয় না।

৩. সবল মানবকেন্দ্রিকতাবাদ মানুষের স্বার্থকে যেকোন পরিস্থিতিতে অগ্রাধিকার দেয়। অ-মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের স্বার্থকে একচেটিয়াভাবে বিশ্বের সকল মূল্যের গুরুত্বপূর্ণ উৎস বলে মনে করে না।

অ-মানবকেন্দ্রিক মানবকেন্দ্রিকতাবাদ ও দুর্বল মানবকেন্দ্রিকতাবাদের মধ্যেও কিছু মৌলিক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এগুলো হলঃ

১. অ- মানবকেন্দ্রিকতাবাদ অনুসারে, অ-মানব প্রাকৃতিক সত্তাসমূহের অবশ্যই স্বতঃমূল্য আছে। দুর্বল মানবকেন্দ্রিকতাবাদ অনুসারে পরিবেশ নীতিবিদ্যার প্রতিষ্ঠার জন্য অ-মানব প্রাকৃতিক সত্তাসমূহের স্বতঃমূল্য অত্যাবশ্যক কোন শর্ত নয়। অ-মানব প্রাকৃতিক সত্তার ব্যবহারিক মূল্য ও স্বতঃমূল্য উভয়ই থাকতে পারে।

২. কিছু ক্ষেত্রে দুর্বল মানবকেন্দ্রিকতাবাদ অ-মানব প্রাকৃতিক সত্তার শোষণ, ভোগকে সমর্থন করে। অন্যদিকে অ-মানবকেন্দ্রিকতাবাদ অ-মানব প্রাকৃতিক সত্তার উপর কোনরূপ শোষণ, আধিপত্য কিংবা ভোগকে সমর্থন করে না।

এ অধ্যায়ের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পাশ্চাত্য দার্শনিক ঐতিহ্য মানবকেন্দ্রিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করে। এক্ষেত্রে সনাতনী পাশ্চাত্য নীতিবিদ্যা পাশ্চাত্যদের আচরণকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করছে। সনাতনী নীতিবিদ্যা যেহেতু মানবকেন্দ্রিকতাবাদকে উৎসাহিত করে সেহেতু মানুষ অ-

মানব প্রাকৃতিক সত্তাসমূহকে কেবল ব্যবহারের বস্তু হিসাবে মূল্যায়ন করে। তবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, মানবকেন্দ্রিকতাবাদের দুটি রূপ রয়েছে, সবল ও দুর্বল মানবকেন্দ্রিকতাবাদ। এক্ষেত্রে সনাতনী নীতিবিদ্যা কেবল সবল মানবকেন্দ্রিকতাবাদীদের প্রভাবিত করে দুর্বল মানবকেন্দ্রিকতাবাদীদের নয়। ফলে দেখা যায় যে, সবল মানবকেন্দ্রিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি সুস্পষ্টভাবে পরিবেশ ও মানবজাতি উভয়ের জন্য হুমকিস্বরূপ। পক্ষান্তরে দুর্বল মানকেন্দ্রিকতাবাদ হল একটি বিশ্বাসযোগ্য মতবাদ যা পরিবেশকে সুরক্ষা করে। এ বিষয়ে আমরা শেষ অধ্যায়ে আলোচনা করব।

তথ্যনির্দেশ

১. Eugene C. Hargrove, *Foundation of Environmental Ethics*, prentice Hall, London, 1989, p.3.

২. দেখুন, Tom Regan, "Does Environmental Ethics Rest on a Mistake?" *The Monist*, Illionois, 1992.

৩. Donald Hughes, *Ecology in Ancient civilization*, University of Mexico Press, Albu-querque, 1975, P.181.

৪. R.G. Botzler & S.J. Armstrong, *Environmental Ethics*, 2nd edition, McGrew Hill Co.Inc, Boston, USA, 1998, P.309.

৫. S.E. Boslaugh, *'Anthropocentrism, Encyclopedia Britannica.*

৬. Ibid.

৭. Peter Singer(ed.) *A companion to Ethics*, Blackwell, UK, 1993. PP.284-285.

৮. William Lillie, *An Introduction to Ethics*, 3rd edition, Mathuen & co.Ltd. New York, 1955, PP.1-2.

৯. কালীপ্রসন্ন দাস, *পরিবেশ দর্শন: মানবকেন্দ্রিকতাবাদ ও পরিপোষক উন্নয়ন*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৪, পৃ.৮৭.

১০. R.E. Purser.C.Park, and A. Montouri, *Limits to Anthropocentrism: Toward an Ecocentric Organization Paradigm?*, Academy of Management Review, Vol.20, No 4,1995,p.1054.

১১. Henryk Skolimowski, "The Dogma of Anti-Anthropocentrism and Ecophilosophy," *Environmental Ethics*, 6,1984, pp.283-88, edited by Eugene C. Hargrove, Weak Anthropocentric Intrinsic Value", *The Monist*, vol. 75, No.2, April,1992, p.184 আরও দেখুন Tim Hayward, "Anthropocentrism: A Misunderstood Problem", *Environmental Values*, 6, 1997, pp.49-63.

১২. Eugene C. Hargrove, *"Weak Anthropocentric Intrinsic Value," The Monist*, op.cit.p.201

১৩. Fredrick Ferre, *"Personalistic Organization: Paradox or paradigm?"* in *Philosophy and the Natural Environment*, 1992, Edited by Robin Attfield and Andrew Belsew, Cambridge University Press, Cambridge

১৪. আমিনুল ইসলাম, *পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস: থেলিস থেকে হিউম*, মাওলা ব্রাদার্স,২০০৯ পৃ.৪৬

১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮

১৬. কালীপ্রসন্ন দাস, *পরিবেশ দর্শন: মানবকেন্দ্রিকতাবাদ ও পরিপোষক উন্নয়ন*, পূর্বোক্ত, পৃ.৪৬

১৭. পূর্বোক্ত, পৃ.৪৮

১৮. আমিনুল ইসলাম, *পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস: থেলিস থেকে হিউম*, পূর্বোক্ত, পৃ.৭৪

১৯. পূর্বোক্ত, পৃ.৭৬

২০. F.coplestone, *A History of Philosophy*, Image Books, New York, Vol.1, Part 1,1962,pp.96-101

২১. Ibid, P.102

২২. E. Zeller, *Outlines of the History of Greek Phiolosophy*, Routledge & Kegan Paul Ltd. London, 1963, P.134.

২৩. কালীপ্রসন্ন দাস, *পরিবেশ দর্শন: মানবকেন্দ্রিকতাবাদ ও পরিপোষক উন্নয়ন*, পূর্বোক্ত, পৃ.৪৯

২৪. আমিনুল ইসলাম, *পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস: থেলিস থেকে হিউম*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৭

২৫. বার্ট্রান্ড রাসেল, *পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস*, ড. প্রদীপ রায়(অনূদিত),অবসর,২০১১,পৃ. ১৩৭

২৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৪

২৭. Eugene C. Hargrove, *Foundations of Environmental Ethics*, Prentice Hall, New Jersey, 1989, p.24.

২৮. আমিনুল ইসলাম, *পাশ্চাত্য দর্শনের, ইতিহাস থেলিস থেকে হিউম*, প্রথম খন্ড, মাওলা ব্রাদার্স ২০০৯,পৃ. ১৪৭

২৯. পূর্বোক্ত

৩০. E. Zeller, *Outlines of the History of Greek Phiolosophy*, Routledge & Kegan Paul Ltd. London, 1963, P.134.

৩১. Peter Singer, Animal Liberation, Avon Books, New York, 1975, p. 196

৩২. সরদার ফজলুল করিম, *এ্যারিস্টটল এর পলিটিক্স*, মাওলা ব্রাদার্স,২০০৬,পৃ. ৪৮

৩৩. দেখুন, Peter Singer, *Practical Ethics*, Second Edition, Cambridge University press, 1999, p.267

৩৪. F.Thilly, *A History of Philosophy*, Central Book Depot, Alahabad, 1978, p.233

৩৫. ST. Thomas Aquinas, *Summa Contra Gentles*, Tr. By English Dominican Fathers, Benbigr Brother, Chicago, 1928, Third Book, Part 2, Chap. exii, selection reprented in, Tom Regan and peter Singer (ed.) *Animal Right and Human Obligations*, 2nd Edition, Printics Hal, New Jersey, 1989, pp. 6-7

৩৬. বাইবেল আদিপুস্তক, ৯:৩

৩৭. Peter Singer, *Animal Leberation*, Avon Books, New York, 1975, p.196

৩৮. ST.Thomas Aquinas, *Summa Theologica*,11,11,Q.25, Art 3,cited in Peter Singer, Ibid

৩৯. Tom regan and peter Singer (ed), *Animal Right and Human Obligation*, 2nd edition, prentice Hall, New Jersey, 1989, pp.13-19

৪০. John Passmore, *Mans responsibility for Nature*, 2nd edition, wordsworth, London, 1980, p.21

৪১. H.C. Carey, *The past , the present and the Future*, Philadelphia, 1848, p.95 উদ্বৃত করা হয়েছে John Passmore, *Man's Resposibility for Nature*, Ibid.

৪২. John Locke, *Two Treatises of Grovernment*, Peter Laslett (ed), New American Library, New York, 1963, p.328

৪৩. Ibid.p.307

৪৪. Ibid.p.329

৪৫. শেখ আবদুল ওয়াহাব, *কান্টের নীতিদর্শন*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশণা, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ.৮৮

৪৬. I. Kant, *Foundamental Principles of the Metaphysic of Morals*, Tr. By T.K. Abbott, Longmans, London, 10th Edition, p.56

৪৭. I. Kant, op.cit, pp. 94-95

৪৮. Ibid, p.240

৪৯. Jeremy Bentham, The Principles of Morals and Lagislation, Oxford University Press, Oxford,197, Ch., 17, Sec., 1, cited in Joseph R. Des Jardins, Environmental Ethics, 2nd edition Worthwrth Publishing Company,NY, 1989,PP. 93-94 . 50. Bryan G. Norton, Environmental Ethics, vol.6, no. 2,p.

৫০. দেখুন, Tom Regan and Peter Singer, *Animal Rights and Human Obligations*, 2nd ed, Prentice Hall, USA, 1989.

৫১. B.G. Norton, *Toward Unity Among Environmentalists*, Oxford University Press, New York,1991.p.251

৫২. B.G. Norton, Environmental Ethics and Weak *Anthropocentrism*, *Environmental Ethics,* 6,1984, p.131-148.

৫৩. Immanuel Kant, Op. cit. pp.94-95

৫৪. B.G. Norton, Environmental Ethics and Weak *Anthropocentrism*, *Environmental Ethics,* Ibid

৫৫. C. Catherine, "A Reporter at Large: The Ancient Forest," New Yorker, 1990, pp. 46-84.

৫৬. GAO, Endangered Speceies: Spotted owl petition Evaluation Beset by problem, United States General Accounting Office, February,1989.

৫৭. Center for Philosophy and Public Policy, "The Preservation of Species: Why Should We Care?" QQ: Report from the Center for Philosophy and Public Policy, Vol. 5, No. 4 (Fall, 1985), pp. 1-5.

৫৮. Eric Katz, A Pragmatic Reconsideration of anthropocentrism, *Environmental Ethics*, vol. 21, no. 4, 1999, pp. 377-390.

৫৯. William Baxter, *People or Penguins: The case for optimal Pollution,* Columbia University Press, New York, p.5.উদ্বৃত্ত Des Jardins, Environmental Ethics, 2nd ed. Wardsworth

৬০. দেখুন B.G. Norton, Environmental Ethics and Weak *Anthropocentrism*, *Environmental Ethics,* 6,1984, p.131-148 এবং Eugene C. Hargrove, "Weak Anthropocentric Intrinsic Value," *The Monist*, op.cit.

৬১. B. G. Norton, *The Cultural Approach to Conservation Biology*, in searching for sustainability, Cambridge University press, Cambridge, 2003, p.475. Reprinted from pearl, M. And western, D. (eds.) *Conservation for the Twenty First Century*, Oxford University Press, New York, 1989.

৬২. Enlightened এবং Long-sighted মানবকেন্দ্রিকতাবাদ দুর্বল মানবকেন্দ্রিকতাবাদের সমার্থক হিসেবে বিবেচিত।

৬৩. B.G.Norton,Environmental Ethics and Weak *Anthropocentrism*, *Environmental Ethics*, 6, 1984. pp.131-148. B.G.Norton,Environmental Ethics and Weak *Anthropocentrism*, *Environmental Ethics*, 6, 1984. pp.131-148.

৬৪. *Ibid*,134

৬৫. *Ibid*

৬৬. *Ibid*, p.134

৬৭. B.G. Norton, *Why preserve Natural Variety?* Princeton University Press, New Jersey, 1987, p.129

৬৮. B.G. Norton, Environmental Ethics and Weak Anthropocentrism, *Environmental Ethics*, 6,1984, pp,134

৬৯. B.G. Norton, *why preserve Natural Variety?* Princeton University press, New Jersey, 1987,p.208

৭০. B.G. Norton, *The Cultural approach to conservation biology*, in searching for sustainability Cambridge University Press , Cambridge 2003, p.474. Reprinted form pearl, M. and western, D. (eds.) *Conservation for the twenty first century,* Oxford University Press, New York, 1989.

৭১. B.G. Norton, *Biological Resources and Endangered Species: History, Value and Policy*, in searching for sustainability, Cambridge University Press, Cambridge, 2003, P. 124. Reprinted from L.Guruswamy and J. McNcely, *Protecting*

Global Biodiversity: The Converging perspectives of Science, Politics Economics, Philosophy and Law, Durham, Duke University press, NC, 1997

৭২. B.G. Norton, *The Cultural approach to conservation biology*, in searching for sustainability Cambridge University Press , Cambridge 2003, p.474. Ibid

৭৩. B.G. Norton, Environmental Ethics and Weak Anthropocentrism, *Environmental Ethics*, 6,1984

৭৪. *Ibid*.

৭৫. E. Hargrove, *Weak Anthropocentric intrinsic value*, in A.light and H.Rolston III (eds.) *Environmental Ethics: An Anthology*, Blackwell publishers Ltd. Oxford, 2003,p.183

৭৬. Paul W. Taylor, "Are Humans Superior to Animals and Plants?" *Environmental Ethics*, 6,1984, p.151, cited in Eugene C. Hargrove, "Weak Anthropocentric Intrinsic value," *The monist*, Vol. 75, No. 2, April, 1992, p.189

৭৭. E. Hargrove, Ibid, P.179

৭৮. উদাহরণস্বরূপ, Jaws (1975), *Deep Blue Sea* (1999) *Open Water* (2003) এবং *The Reef (*2010) এই মুভিগুলোতে তাই দেখানো হয়েছে।

৭৯. Good paster Kenneth, *From Egoism to Environmentalism, in Ethics and Problems of the 21st century,* edited by K.E. Goodpaster and K.M. Sayre, Notre Dame University press, Notre Dame And London, 1979.

৮০. Tim Hayward, "Anthropocentrism: A Misunderstood Problem," *Environmental Values*, 6,1997,pp.49-63.

৮১. Richard D. Ryder, 'Panism: The Ethics of Animal Rights and the Environment, in *Animal Welfare and the Environment,* edited by Richard A. Ryder, Duckworth is Association with RSPCA, London, 1992, p.197

৮২. দেখুন, Tim Hayward, *Ecological Thought: An Introduction*, Polity Press, Cambridge, 1995, p.220

৮৩. Richard Routhley and Val Routley, "Against the Inevitability of Human Chauvinism", in Robert Elliot (ed), *Environmental Ethics*, Oxford University Press, New York, 1995,p.104

৮৪. Tim Hayward, *Ecological Thought: An Introduction*, Polity Press, Cambridge, 1995, p.220.

৮৫. Immanuel Kant, " *Duties to Animals And Spirits,*" in Lectures on Ethics, translated by Louis infield, Harper and Row, New York, 1963,pp.239-40

৮৬. R.G. Botzler & S.J. Armstrong, *Environmental Ethics*, 2nd editions, Mc. Grew Hill Co.Inc, Boston, USA.

৮৭. John Hospers, "Ethical Egoism," in *An Introduction to Philosophical Analysis*. 2nd Edition. Routledge, Kegan Paul: London, 1967.

৮৮. J. B. Callicott, *Beyond the Land Ethic: More Essays in Environmental Philosophy*, Albany, State University of New York Press, 1999, p. 244.

৮৯. J. B. Callicott, 'Non-Anthropocentric Value Theory and Environmental Ethics', *American Philosophical Quarterly*, vol. 21, no. 4, 1984, p. 306, notes 3.

৯০. P.Singer, "Speciesism and Moral Status, *Melaphilosophym* Vol. 40 nos.3-4, 2009, p.573

৯১. Routley and Routley "Human Chauvinism and Environmental Ethics, In Mannison, et al (eds) *Environmental Philosophy*, RSSS, ANV, 1980, pp.96-146.

৯২. কোনরূপ যৌক্তিক সমর্থন ছাড়াই, অন্ধভাবে নিজের শ্রেণীকে উৎকৃষ্ট বলে মনে করাকে স্বাজাত্যবাদ বলা হয়।

৯৩. Richard Routhley and Val Routhley, “Human Chunvinism and Environmental Ethics প্রবন্ধে অন্ধ-স্বাজাত্যবাদ ও মানবকেন্দ্রিকতাবাদকে একই অর্থে ব্যবহার করেন।

৯৪. Richard Routhley and Val Routley, “Against the Inevitability of Human Chauvinism”, in Robert Elliot (ed), *Environmental Ethics*, Oxford University Press, New York, 1995,p.104

৯৫. Although sometimes Regan and Singer are not regarded as sentiocentric, I will count them among the prominent defenders of sentiocentrism, like Gary Varner, Raffaele Rodogno, and some others did.

৯৬. P. Singer, *Animal Liberation*, New York, Harper Collins Publishers Inc., 2002, p. xv.

৯৭. Peter Singer, *practical Ethics*, Second Edition, Cambrige University press, 1999, p.275

৯৮. peter singer, *practical Ethics*, second Edition, Canmbridge University press, 1999, p.101

৯৯. peter singer, *practical Ethics*, p.110

১০০. *Ibid*.p.55

১০১. *Ibid*. p.55.

১০২. *Ibid.* p.56.

১০৩. *Ibid*. P-58.

১০৪. *Ibid*. P.58.

১০৫. D. Jamieson, *Ethics and the Environment: An Introduction*, Cambridge: Cambridge University Press, 2008, p. 120.

১০৬. T. Regan, ‘The Radical Egalitarian Case for Animal Rights’ in M. Boylan (ed.), *Environmental Ethics*, New Jersey, Prentice Hall, 2001, p.329

১০৭. *Ibid.*

১০৮. *Ibid.*, p.156.

১০৯. T. Regan, 'The Radical Egalitarian Case for Animal Rights' in M. Boylan (ed.), *Environmental Ethics*, New Jersey, Prentice Hall, 2001, p. 329.

১১০. *Ibid*.

১১১. J. B. Callicott, 'Non-Anthropocentric Value Theory and Environmental Ethics', *American Philosophical Quarterly*, vol. 21, no. 4, 1984, p.300.

১১২. *Ibid*.

১১৩. *Ibid.*, p. 301.

১১৪. P. S. Wenz, *Environmental Justice*, Albany, State University of New York Press, 1988, p. 272.

১১৫. G. G. Arsene, *The Human-Nature Relationship: The Emergence of Environmental Ethics*, p.27.

১১৬. peter singer, *Practical Ethics*, P.278

১১৭. *Ibid*, p.278

১১৮. J. C. Evans, *With Respect for Nature: Living as Part of the Natural World*, Albany, State University of New York Press, 2005, p. 77.

১১৯. M. Yu and Y. Lei, 'Biocentric Ethical Theories', *Environment and Development*, vol. 2., Encyclopedia of Life Support Systems, pp. 253-261

১২০. J. R. Desjardins, *Environmental Ethics: An Introduction to Environmental Philosophy*, 4th edn., Canada, Thomson Wadsworth, 2006, p. 133.

১২১. L. White, Jr., 'The Historical Roots of Our Ecologic Crisis', *Science*, vol. 155, no. 3767, 1967, p. 1207

১২২. *Ibid.*, p. 1206

১২৩. *Ibid*., p. 1207

১২৪. P. W. Taylor, *Respect for Nature: A Theory of Environmental Ethics*, 2nd edn., Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1989, p. 16.

১২৫. *Ibid.*, p. 17.

১২৬. P. W. Taylor, *Respect for Nature: A Theory of Environmental Ethics*, 2nd edn., Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1989, p. 17.

১২৭. P. W. Taylor, 'The Ethics of Respect for Nature', *Environmental Ethics*, vol. 3, no. 3, 1981, p. 201.

১২৮. P. W. Taylor, *Respect for Nature: A Theory of Environmental Ethics*, 2nd edn., Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1989, p. 99

১২৯. *Ibid.*, p. 99.

১৩০. P. W. Taylor, 'The Ethics of Respect for Nature', *Environmental Ethics*, vol. 3, no: 3, 1981, p. 207.

১৩১. P. W. Taylor, *Respect for Nature: A Theory of Environmental Ethics*, 2nd edn., Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1989, p. 263

১৩২. *Ibid.*, p. 172

১৩৩. *Ibid.*, p. 171.

১৩৪. Robin Attfield, *"Biocentric consequentialism, Pluralism and the 'Minimax Implication': A Reply to Alan Carter,"* Utilitas, vol.15, pp. 76-91.

১৩৫. J. R. Des jardins, *Environmental Ethics: An Introduction to Environmental Philosophy*, 4th edn., Canada, Thomson Wadsworth, 2006, p. 142.

১৩৬. Aldo Leopold, A sand County Almanac, Oxford University Press, New York, 1949. p.203 cited in J.B. Callicott "Animal

Liberation: A Traingular Affair," in Donald Sherer & Thomas Attig (ed). op.cit.pp.55-56.

১৩৭. A. Leopold, *A Sand County Almanac: with Essays on Conservation from Round River*, New York, The Random House Publishing Group, 1966, p. 239.

১৩৮. *Ibid.*, p. 261

১৩৯. Aldo Leopold, A sand County Almanac, Oxford University Press, New York, 1949. p.203 cited in J.B. Callicott "Animal Liberation: A Traingular Affair," in Donald Sherer & Thomas Attig (ed). op.cit.p.91.

১৪০. A. Leopold, *A Sand County Almanac: with Essays on Conservation from Round River*, New York, The Random House Publishing Group, 1966, p. 262.

১৪১. J. B. Callicott, *Beyond the Land Ethic: More Essays in Environmental Philosophy*, Albany, State University of New York Press, 1999, p. 70 .

১৪২. A. Leopold, *A Sand County Almanac: with Essays on Conservation from Round River*, New York, The Random House Publishing Group, 1966, pp. xviii-xix.

১৪৩. A. Leopold, *A Sand County Almanac: with Essays on Conservation from Round River*, New York, The Random House Publishing Group, 1966, p. 238

১৪৪. A. Naess, 'The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement: A Summary', in M. Boylan (ed.), *Environmental Ethics*, New Jersey, Prentice Hall, 2001, p. 52.

১৪৫. B. Devall and G. Sessions, 'Deep Ecology', in D. Schmidtz and E. Willot (eds.), *Environmental Ethics: What Reality Matters, What Really Works*, Oxford, Oxford University Press, 2002, p. 123.

১৪৬. *Ibid.*, p. 121

১৪৭. Joseph R.Des Jardins, Environmental Ethics, 2nd edition, Wordworth Publishing co., New York, 2001, p.166

১৪৮. B. Devall and G. Sessions, 'Deep Ecology', in D. Schmidtz and E. Willot (eds.), *Environmental Ethics: What Reality Matters, What Really Works*, Oxford, Oxford University Press, 2002, pp. 121-122.

১৪৯. *Ibid.*, p. 122

১৫০. H. Rolston III, 'Value in Nature and the Nature of Value', in A. Light and H. Rolston III (eds.), *Environmental Ethics*: *An Anthology*. Malden, MA, Blackwell Publishing, 2003, p. 146.

১৫১. H. Rolston III, 'Value in Nature and the Nature of Value', in A. Light and H. Rolston III (eds.), *Environmental Ethics*: *An Anthology*. Malden, MA, Blackwell Publishing, 2003, p. 152

১৫২. *Ibid.*, p. 144

১৫৩. *Ibid.*, p. 145

১৫৪. *Ibid.*, p. 148

১৫৫. *Ibid.*, p. 150

১৫৬. J. B. Callicott, 'Non-Anthropocentric Value Theory and Environmental Ethics', *American Philosophical Quarterly*, vol. 21, no. 4, 1984, p. 304.

১৫৭. J. B. Callicott, 'Intrinsic Value, Quantum Theory, and Environmental Ethics', *Environmental Ethics*, vol.7, 1985, pp.257-275

১৫৮. *Ibid.*, p. 263

১৫৯. J. B. Callicott, *Beyond the Land Ethic: More Essays in Environmental Philosophy*, Albany, State University of New York Press, 1999, p. 71.

১৬০. Jardins, J.R.D. Environmental Ehtics: An Interoduction to Environmental philosophy, Wadsworth, Australia, 2001, p.195

১৬১. T. Regan, *The Case for Animal Rights*, California, University of California Press, 1985, p. 362.

১৬২. B. Devall, 'Deep Ecology and its Critics', *The Trumpeter: Journal of Ecosophy*, vol. 5, no. 2, 1988, p. 57.

১৬৩. R. Watson, 'A Critique of Anti-Anthropocentric Ethics', in L. P. Pojman and P. Pojman (eds.), *Environmental Ethics, Readings in Theory and Application*, 6th edn., Clark Baxter, USA, 2012, p. 157.

১৬৪. B. Devall, 'Deep Ecology and its Critics', *The Trumpeter: Journal of Ecosophy*, vol. 5, no. 2, 1988, p. 57.

১৬৫. Jardins, J.R.D. *Environmental Ethics: An Introduction to Environmental Philosophy*, Wardworth, Australia, 2001,p.192

J.sterba, "*Reconciling Antropocentric and Non-anthropocentric Environmental Ethics"* Introther, H.ed. Ethics in practice An Anthology, Blockwell, Oxford, 1997, p.644

তৃতীয় অধ্যায়

মানবকেন্দ্রিকতাবাদ ও করণবাদ

সাধারণ অর্থে মানবকেন্দ্রিকতাবাদ এমন একটি মতবাদ যা বিশ্বজগতে মানুষের অবস্থানকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে। এ মতবাদ মানব প্রজাতির শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী এবং মানুষকেই সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে বিবেচনা করে। অপরদিকে এ মতবাদ পরিবেশকে সহায়ক সত্তা হিসেবে গণ্য করে। অর্থাৎ মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি মানব প্রজাতির শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী এবং জগতের অন্যান্য সবকিছু কেবল মানুষের উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে অস্তিত্বশীল বলে মনে করে। ব্যাপক অর্থে মানবকেন্দ্রিকতাবাদ হল, নৈতিক মানদন্ডগুলো কেবল মানুষের উপর প্রযোজ্য এবং মানুষের স্বার্থেরই সর্বোচ্চ মূল্য আছে। এ ধারণাটি মূলতঃ পাশ্চাত্য সনাতনী নীতিবিদ্যা থেকে উৎসারিত। কেননা সেখানে কেবল মানুষের সাথে মানুষের আচরণই নৈতিক বিবেচনাধীন বলে মনে করা হয়। যে সকল বস্তু নৈতিক বিবেচনাধীন বা নৈতিক বিবেচনাযোগ্য সেগুলো অন্য উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হিসাবে ব্যবহৃত হয় না বরং তা নিজ যোগ্যতায় নৈতিক মূল্যায়নের অন্তর্ভূক্ত হয়। যে প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষের জন্ম হয়, বেড়ে ওঠে, জীবনধারণ করে সে প্রাকৃতিক পরিবেশকে এ মতবাদ নৈতিকতার বিষয়বস্তু হিসেবে বিবেচনা করে না। এক্ষেত্রে রাউটলি বলেন, যেহেতু প্রাকৃতিক বিষয়গুলির কোন মূল্য নেই সেহেতু তাদের সাথে কোনরূপ আচরণ করতে বাধা নেই। অর্থাৎ প্রাকৃতিক বস্তুকে যেকোন ক্ষেত্রে, যে কোনভাবেই বিবেচনা করা অনুমোদনযোগ্য।[১]

পরিবেশ নীতিবিদ্যায় সাধারণত ধরে নেয়া হয় যে, মানবকেন্দ্রিকতাবাদ ও করণবাদের মধ্যে অপরিহার্য সম্পর্ক আছে এবং মানবকেন্দ্রিকতাবাদ অ-মানব প্রাকৃতিক সত্তার সাথে স্বতঃমূল্যে অপরিহার্যভাবে সম্পর্কিত। কিন্তু আমরা এ অধ্যায়ে দেখানোর চেষ্টা করবো মানবকেন্দ্রিকতাবাদের সাথে করণবাদের অপরিহার্য সম্পর্ক নেই এবং আরও প্রমাণের চেষ্টা করবো স্বতঃমূল্য ও পরতঃমূল্য বা ব্যবহারিকমূল্য মানুষের মূল্যায়নের উপর নির্ভর করে না। তাছাড়া পরিবেশ নীতিবিদ্যায় মানবকেন্দ্রিকতাবাদী হয়েও পরিবেশ সংরক্ষণে কোনো যৌক্তিক বাধা থাকবে না বলে আমরা বিশ্বাস করি। আমরা লক্ষ্য করলে দেখি যে, পরিবেশ নীতিবিদ্যায় অ-মানব প্রাকৃতিক সত্তার উপর মানুষের মূল্যায়নের বিষয়টি সকল বিতর্কের মূল বিষয়।

আমেরিকার প্রয়োগবাদী দার্শনিক জন ডিউই (John Deway-১৮৫৯-১৯৫২) করণবাদের কথা বলেন। তাঁর মতে, প্রয়োগবাদ হচ্ছে ‘করণবাদ’ (Instrumentalism)। তাঁর এ করণবাদের সাথে

মানুষ ও জগতের সমস্যা সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি বলেন মানুষ প্রতিনিয়ত যে বিপদের সম্মুখীণ হয়, তা সম্পূর্ণরূপে বিষয়গত পরিস্থিতি। এ বিষয়গত পরিস্থিতির সাথে যখনই মানুষ একাত্ম হয় তখনই তা সমস্যাপূর্ণ পরিস্থিতি হিসেবে চিহ্নিত হয়। অতঃপর মানুষ এ সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে চিন্তা মানুষকে সমস্যাযুক্ত পরিস্থিতি মোকবেলার জন্য চালিত করে। তিনি বলেন, চিন্তা হলো এক ধরনের ক্রিয়া, আর সত্যিকারের দর্শন হচ্ছে একটি ক্রিয়া। চিন্তার সাথে ব্যবহারের সম্পর্ক আছে। কোন কার্য সম্পাদনের জন্য আমাদেরকে এই চিন্তাকে কাজে লাগাতে হবে। ডিউই মনে করেন, করণবাদ হচ্ছে সমস্যাবলীর বুদ্ধিসম্মত সমাধানের জন্য সব অর্থপূর্ণ, সত্য এবং মূল্যবান ধারণাগুলোকে পর্যবেক্ষণমূলক উপকরণরূপে প্রয়োগ করা। তিনি বলেন চিন্তা উপকরণস্বরূপ এবং চিন্তার একটি প্রায়োগিক কাজ রয়েছে। তিনি দাবি করেন যে, দর্শন হচ্ছে ব্যবহারিক।[২]

এ প্রবন্ধের আলোচনায় করণবাদ ব্যবহারিক অর্থে ব্যবহৃত হবে। ব্যবহারিক অর্থে করণবাদ বলতে বুঝায় অ-মানব প্রাণী ও প্রাকৃতিক সত্তাসমূহের নিজস্ব কোন মূল্য নেই। মানুষের প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে এগুলোর উপর মূল্য আরোপ করা হয়। অর্থাৎ কেবল মানুষরই স্বতঃমূল্য (Intrinsic Value) আছে, প্রকৃতির অ-মানব সত্তার কোন স্বতঃমূল্য নেই, আছে ব্যবহারিক মূল্য। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, বিনোদন প্রভৃতির জন্য আমরা প্রাকৃতিক উপাদানসমূহের উপর নির্ভরশীল। এসব প্রাকৃতিক উপাদানসমূহ আামদের প্রয়োজন ও চাহিদাসমূহ যেভাবে পূরণ করে আমরা সেগুলোকে সেভাবে মূল্যায়ন করি। অর্থাৎ প্রাকৃতিক উপাদানের ব্যবহারিক মূল্য আছে বলেই আমরা তাদের মূল্যায়ন করি। যদি এগুলো আমাদের চাহিদাকে পূরণ করতে না পারে তাহলে আমরা তাদের মূল্য দেই না। আমরা দৈনন্দিন জীবনে বেশিরভাগ বস্তুকে ব্যবহারিকভাবে মূল্যবান মনে করি এবং ধরে নেই যে এটি আমাদের লক্ষ্য অর্জনের উপায়স্বরূপ। যেমন, আমরা একটি ওয়াশিং মেশিনকে মূল্য দিই কেননা এটি আমাদের কাপড় পরিষ্কারের জন্য ব্যবহার করা হয়। মূলতঃ এর কার্যকারিতা ও ব্যবহার উপযোগীতাই আমাদের কাছে মূল্যবান। যদি সুলভ মূল্যে পাশের বাড়িতে আমরা কোন লন্ড্রি পাই নিঃসন্দেহে তখন আমরা উক্ত ওয়াশিং মেশিনটি বিক্রি করে দিতে চাইবো। কেননা তখন আর আমার কাছে এর ব্যবহারিক মূল্য নেই। আবার আমরা সকলে অর্থকে মূল্য দিই। এখানে আমরা অর্থ যে লক্ষ্য অর্জনে ব্যবহৃত হয় তাকেই মূল্যবান মনে করি। মূল যে অর্থ তা হল কাগজ বা ধাতবমাত্র। তাই অর্থ আমাদের যে উপায়ে সুরক্ষা দেয় তাই আমাদের কাছে মূল্যবান। সুতরাং এর কেবল ব্যবহারিক মূল্যকে আমরা সকলে গ্রহণ করি। ব্যবহারিক মূল্য এক প্রকার পরতঃমূল্য কেননা এ ধরণের মূল্য বাহিরে থেকে আসে। কোন কিছু

ব্যবহারিকভাবে মূল্যবান মানে হল তা অপরের লক্ষ্য অর্জনের জন্য উপায়স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। Das Jardin ব্যবহারিক মূল্যের ধারণা সম্পর্কে বলেন: কোন বস্তুর ব্যবহারিক মূল্য বস্তুটিতে নয় বরং যে জিনিস ব্যবহারের উপর নির্ভর করে তার উপর। যখন এ ধরনের বস্তু আর ব্যবহার হয় না কিংবা তার জায়গায় অন্য কিছু প্রতিস্থাপন করা হয় তখন উক্ত বস্তুটি তার মূল্য হারাবে এবং তখন তাকে এড়ানো বা বাতিল করা যেতে পারে।[৩]

উপর্যুক্ত আলোচনায় গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, মানবকেন্দ্রিকতাবাদ ও করণবাদ উভয়ের ক্ষেত্রে অ-মানব প্রাকৃতিক সত্তাসমূহেকে ব্যবহারিক মূল্য অর্থে ব্যবহার করা হয়।

মানবকেন্দ্রিকতাবাদের সাথে করণবাদের অপরিহার্য সম্পর্ক নেই বলে আমরা মনে করি। এমনকি মানুষের অস্তিত্ব না থাকলেও অ-মানব সত্তার ব্যবহারিক মূল্য থাকতে পারে। যেমন, একটি মাকড়সা যখন পোকা খায় তখন সে পোকাটিকে তার জীবনধারণের জন্য ব্যবহার করে। এখানে পোকাটির মূল্য মাকড়সার নিকট ব্যবহারিক। পোকাটির মূল্য দেওয়ার জন্য মানুষের উপস্থিতির কোন প্রয়োজন নেই। সুতরাং মানবকেন্দ্রিকতাবাদ ব্যবহারিক মূল্য তথা করণবাদের সাথে অপরিহার্যভাবে সম্পর্কিত নয়। এক্ষেত্রে ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ ফেলো কিকক লি (Keekok Lee) বলেন, যদি কোন বস্তু 'O' কে 'A' এর লক্ষ্য বা সন্তুষ্টি বিধানের জন্য ব্যবহার করা হয় তখন A এর নিকট O এর ব্যবহারিক মূল্য আছে। A যদি মানুষের প্রতিনিধি এবং O ইঁদুর বা একটি গাছ হয় তাহলে প্রকৃতির ক্ষেত্রে ব্যবহারিক মূল্য আছে। আবার A হল অ-মানব প্রাকৃতিক সত্তার প্রতিনিধি (যেমন, ছাগল) এবং O হল গুল্ম। তাহলে এটাও স্পষ্ট যে একটি প্রাকৃতিক সত্তা অন্য একটি প্রাকৃতিক সত্তার নিকট ব্যবহারিকভাবে মূল্যবান থাকতে পারে। ফলস্বরূপ, ব্যবহারিকমূল্য অপরিহার্যভাবে মানুষ এবং প্রকৃতির মধ্যে ধারণ করে না এবং মানুষের অন্তর্ধানের সাথে সাথে অ-মানব প্রাকৃতিক সত্তার ব্যবহারিক মূল্য শেষ হয়ে যায় না। কেবল যে মূল্যগুলি মানুষের সাথে জড়িত সেগুলোই অদৃশ্য হয়ে যায়। প্রকৃতির অন্যান্য সত্তার মধ্যে ব্যবহারিক মূল্যের অস্তিত্ব মানুষের অনুপস্থিতিতেও বজায় থাকে।[৪] তাই এটি প্রমাণিত যে, দুইটি প্রাকৃতিক সত্তার মাঝে ব্যবহারগত সম্পর্ক মানুষের উপস্থিতি ছাড়াও হতে পারে। এ সম্পর্ককে অমানবকেন্দ্রিক ব্যবহারিক মূল্যের সম্পর্ক বলা যায়। কিন্তু জন বেয়ার্ড ক্যালিকট তাঁর "Non-anthropoecentric Value Theory and Environmental Ethics" প্রবন্ধে 'মানবকেন্দ্রিক' শব্দটিকে স্বতঃমূল্য অর্থে এবং অ-মানব সত্তাসমূহের ব্যবহারিক মূল্য অর্থে ব্যবহার করেন। তিনি মনে করেন যে, মানবকেন্দ্রিক মূল্যতত্ত্ব প্রকৃতির সকল অ-মানবসত্তাকে ব্যবহারিক মূল্যে মূল্যায়িত করে। প্রকৃতির সবকিছু মানুষের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য।

অর্থাৎ অ-মানবসত্তা যতটুকু পরিমাণে মানুষের কাজে লাগে সে পরিমানেই তা মূল্যবান মনে করা হবে। ক্যালিকটের ভাষায়- "মানবকেন্দ্রিক মূল্যতত্ত্ব সাধারণত এ বিষয়ে একমত যে, কেবল মানুষই স্বতঃমূল্যে মূল্যবান। মানুষ ছাড়া সকল প্রকারের প্রাণী ও অন্য সবকিছু শুধু ব্যবহারিক মূল্যে মূল্যবান। অর্থাৎ মানুষের কাজে লাগার উপায় বা যন্ত্র হিসাবে এগুলোকে যতটুকু ব্যবহার করা যায় এগুলো ততটুকু পরিমাণে মূল্যবান হবে। অপরদিকে, অ-মানবকেন্দ্রিক মূল্যতত্ত্ব কিছু অ-মানব সত্তাকেও স্বতঃমূল্যে মূল্যবান মনে করে।"[৫]

ক্যালিকটের উপর্যুক্ত বক্তব্যে মানবকেন্দ্রিকতাবাদের সাথে করণবাদের অপরিহার্য সম্পর্ককে নির্দেশ করে। ক্যালিকটের এ উক্তির অযথার্থতা প্রমাণ করলেই দেখা যাবে যে, মানবকেন্দ্রিকতাবাদের সাথে করণবাদের অপরিহার্য সম্পর্ক নেই এবং স্বতঃমূল্য ও পরতঃমূল্য মানুষের মূল্যায়নের উপর নির্ভর করে না।

মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হয় মানুষ হল মূল্যবান বিষয় এবং এই মূল্যায়নকারী ছাড়া কোন বস্তুরই নিজস্ব মূল্য থাকে না। হোমস রলস্টন মূল্যসংক্রান্ত সম্পর্ক নিয়ে নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা দেন– n হয় মূল্যবান বলার অর্থ হল n (প্রকৃতির কোন বস্তু) মূল্যবান হতে সক্ষম। h (কোন মানুষ) নামক কোন মানব মূল্যায়নকারী আসুক বা না আসুক এর উক্ত বৈশিষ্ট্য বর্তমান থাকবে। বিষয়ী উপস্থিতি ছাড়াই বস্তু তার কর্ম চালিয়ে যেতে পারে। কোনকিছু মূল্যবান মানেই হল কোন ব্যক্তি তা মূল্য দিতে সক্ষম। প্রকৃতি মূল্যায়নে সক্ষম হয় যদি কোন ব্যক্তি উক্ত বস্তুকে মূল্যায়ন করে। প্রকৃতি মূল্যবান নয় কিংবা এটি নিজের উপর মূল্য সরবরাহও করতে পারে না এমনকি উদ্ভিদ ও প্রাণীর এ ধরণের মূল্য সক্ষমতা নেই।[৬] অর্থাৎ এ দৃষ্টিকোণ অনুসারে, মানবকেন্দ্রিকতাবাদের মূলে মূল্য অবস্থান করে। এটি এমন নয় যে, বস্তু নিজেই নিজের উপর মূল্যারোপ করে। কিন্তু মূল্যায়নকারী সত্তা সে মূল্যকে গ্রহণ করে। অন্য কথায়, মূল্য বিষয়গতভাবে বর্তমান থাকে না বরং এটি মূল্যায়নকারী প্রতিনিধি দ্বারা মূল্যায়িত হয়। মূলতঃ মানবকেন্দ্রিকতাবাদ অনুসারে কেবল মানুষই হচ্ছে মূল্যায়নকারী প্রতিনিধি।

জে.বি. ক্যালিকট মনে করেন যে, মানবকেন্দ্রিক মূল্যতত্ত্ব প্রকৃতির সকল অ-মানবসত্তাকে ব্যবহারিক মূল্যে মূল্যায়িত করে। প্রকৃতির সবকিছু যতটুকু পরিমাণে মানুষের কাজে লাগে সে পরিমানেই তা মূল্যবান। বস্তুত রলস্টন এবং ক্যালিকটের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে।

উল্লেখিত বক্তব্যসমূহে মূল্যায়নকারী ব্যক্তি এবং মূল্যায়নকারী বস্তুর মধ্যকার বিতর্ক পরিলক্ষিত হয়। এ বিতর্ককে বুঝতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই স্বতঃমূল্য এবং ব্যবহারিক মূল্য সম্পর্কে জানতে হবে।

ইতোপূর্বে আমরা করণবাদ আলোচনা সাপেক্ষে ব্যবহারিক মূল্য সম্পর্কে আলোকপাত করেছি। সুতরাং স্বতঃমূল্য সম্পর্কে আমাদের অবহিত হওয়া প্রয়োজন। তাছাড়া লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, ক্যালিকট কেবল মানুষের স্বতঃমূল্যকে স্বীকার করেছেন। এই স্বতঃমূল্য শব্দটি নিয়ে পরিবেশ নীতিবিদ্যায় বিভ্রান্তি রয়েছে। বিভিন্ন নীতিদার্শনিক শব্দটিকে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেন। ফলে সকলের মধ্যে এক ধরনের মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়।

প্রাচীন গ্রীক দর্শন চিন্তা থেকে এই স্বতঃমূল্য বিষয়ক ধারণাটি আসে। সাধারণত স্বতঃমূল্য এমন নির্দিষ্ট মূল্যকে বোঝায় যা নিজেই ভাল এবং তা অন্যের লক্ষ্য অর্জনের জন্য নয়। ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিক অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ও পরিবেশ দার্শনিক জন ও'নিল তাঁর The Varieties of Intrinsic Value প্রবন্ধে স্বতঃমূল্যকে তিনটি অর্থে ব্যবহার করেন।[৭] এগুলো হলো:

১. অন্তর্নিহিত গুণাবলির মূল্যে মূল্যবান অর্থে স্বতঃমূল্য;

২. অ-ব্যবহারিক মূল্যে মূল্যবান অর্থে স্বতঃমূল্য; এবং

৩. বিষয়গত মূল্য অর্থে স্বতঃমূল্য।

অন্তর্নিহিত গুণাবলির মূল্যে অর্থে স্বতঃমূল্য হল যে মূল্যের নিজস্ব মূল্য রয়েছে বা নিজের জন্য চাওয়া হয়। এ মূল্য নিরপেক্ষ ও স্বাধীন। ব্রিটিশ দার্শনিক জর্জ এডওয়ার্ড ম্যুর (G.E. Moore, ১৮৭৩-১৯৫৮) দর্শনের ইতিহাসে সর্বপ্রথম 'স্বতঃমূল্য' শব্দটিকে অন্তর্নিহিত মূল্যে অর্থে ব্যবহার করেন। এ অর্থে স্বতঃমূল্য হলো কোনো বস্তু কেবল নিজের মধ্যে নিহিত গুণাবলীর কারণে মূল্যবান হবে। ম্যুর এর ভাষায়: 'স্বতঃমূল্য' বলার মানে হলো কোনো বস্তু ঐ মূল্য ধারণ করে কি না এবং কী পরিমাণে ধারণ করে তা সম্পূর্ণভাবে সেই বস্তুটিকে অন্তর্নিহিত প্রকৃতির উপর নির্ভর করে।[৮]

ম্যুরের উপর্যুক্ত বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, তিনি স্বতঃমূল্যকে অন্তর্নিহিত গুণাবলির মূল্যে মূল্যবান বলতে কোন বস্তুর অন্তর্নিহিত প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল এমন গুনাবলীর মূল্যকে বুঝিয়েছেন। এক্ষেত্রে ম্যুর 'অন্তর্নিহিত প্রকৃতি' বলতে 'অন্তর্নিহিত মূল্যকে' বুঝিয়েছেন।

তিনি আরো বলেন যে, অন্তর্নিহিত প্রকৃতির দুটি বস্তুর অন্তর্নিহিত মূল্যও অনুরূপ হবে।[৯] উদাহরণস্বরূপ, 'ক' ও 'খ' দুটি পৃথক বস্তু। এগুলো পৃথক বস্তু হওয়া সত্ত্বেও এদের অন্তর্নিহিত প্রকৃতি যদি একই হয় তাহলে অবশ্যই এদের অন্তর্নিহিত মূল্যও তদ্রুপ হবে।

'অন্তর্নিহিত মূল্যে মূল্যবান অর্থে স্বতঃমূল্য কথাটিকে উপলব্ধির জন্য পল টেইলর তাঁর Principles of Ethics: An Introduction গ্রন্থে ভিন্ন দুটি পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্যের কথা বলেন যা কোনো একটা বস্তুর মূল্য বিচারের ক্ষেত্রে সহায়তা করবে। এই দুটি পদ্ধতি হলো:

১. নিজস্ব প্রকৃতির জন্যেই বস্তুটি মূল্যবান হবে; এবং

২. অন্যান্য জিনিসের সাথে এর সম্পর্কের কারণে বস্তুটি মূল্যবান হবে।[১০]

সুতরাং এখানে স্বতঃমূল্য হবে যা তার নিজের প্রকৃতির জন্যে মূল্যবান। বিপরীতভাবে যা কিছু নিজের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত গুনাবলীর মূল্যে মূল্যবান নয়, বরং অপরের মূল্য লাভের সহায়ক হয়ে ওঠে তা পরতঃমূল্য। অর্থাৎ পরতঃমূল্যর বিপরীতার্থে যে স্বতঃমূল্য অন্তর্নিহিত মূল্যে অর্থে স্বতঃমূল্য সে অর্থেই ব্যবহৃত হয়। এ ধরণের স্বতঃমূল্যের উদাহরণ হল: কেউ বই পড়ে নিজের আনন্দের জন্য। বই পড়ার আনন্দের জন্য পাঠক যে সুখ অনুভব করে তা সে তার নিজের জন্যেই চায় তাই এর অন্তর্নিহিত মূল্য আছে। আবার টাকার নিজস্ব কোন মূল্য নেই। টাকার সাহায্যে আমরা ভোগ্যপন্য, বিলাসদ্রব্য কিনতে পারি বলেই টাকা আমাদের নিকট মূল্যবান। সুতরাং টাকার পরতঃমূল্য আছে, কিন্তু স্বতঃমূল্য নেই।

সুতরাং জীবনের এমন কতগুলি মূল্য আছে যেগুলোকে তাদের নিজেদের জন্যেই চাওয়া হয় অর্থাৎ এগুলো অন্তর্নিহিত মূল্যের কারনেই চাওয়া হয়। এগুলোকেই স্বতঃমূল্য বলে। এগুলো অপরের মূল্যলাভের সহায়কমাত্র নয়। এ ধরণের স্বতঃমূল্যের উৎকর্ষ স্বতঃমূল্যের বাইরের কোন কিছু থেকে আসে না, তার মূল্য আপন প্রকৃতির মধ্যেই নিহিত থাকে।

স্বতঃমূল্য অ-ব্যবহারিক মূল্যের সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অ-ব্যবহারিক অর্থে স্বতঃমূল্য হচ্ছে কোন সত্তার নিজেই নিজের উদ্দেশ্য হওয়া। অর্থাৎ এ ধরনের স্বতঃমূল্য হবে স্বগত লক্ষ্য সম্পন্ন (end-in-itself) । নায়েস 'স্বতঃমূল্য' শব্দটিকে এভাবে ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন পৃথিবীতে অ-মানব জীবনের নিজস্ব মূল্য আছে। এ মূল্য সীমিত ক্ষেত্রে মানুষের ব্যবহারিক উপযোগের উপর নির্ভরশীল।[১১] উল্লেখ্য যে, প্রফেসর আব্দুল মতীন তাঁর An outline of Philosophy গ্রন্থেও স্বতঃমূল্যের সংজ্ঞায় একই কথা বলেন। তিনি বলেন : An intrinsic Value in one which is an end by itself.[১২]

এই অর্থে স্বতঃমূল্য হলো কোনো সত্তার নিজেই নিজের উদ্দেশ্য কিনা তার উপর নির্ভরশীল। অ-ব্যবহারিকের বিপরীত শব্দ অবশ্যই ব্যবহারিক হবে। সুতরা এ অর্থে স্বতঃমূল্যের বিপরীত মূল্য হলো ব্যবহারিক মূল্য। তাহলে ব্যবহারিক মূল্য হলো কোন সত্তা যদি নিজেই নিজের উদ্দেশ্য না হয় বরং অন্য কোনো উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হিসেবে মূল্যবান হয়। আর্নি নায়েস পরিবেশের অ-মানব প্রাণী ও প্রকৃতির অ-ব্যবহারিক মূল্য আছে বলে মনে করেন। অর্থাৎ তিনি মনে করেন প্রকৃতির অ-মানব সত্তাসমূহ নিজেরাই নিজেদের উদ্দেশ্যে, মানুষের উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হিসেবে তারা মূল্যবান নয় বরং তাদের মানদন্ড হল স্বগতঃ লক্ষ্যসম্পন্ন। নায়েস এর ভাষায়: পৃথিবীর অ-মানব প্রাণীর মঙ্গলের স্বকীয় মূল্য আছে। এ মূল্য মানুষের সীমাবদ্ধ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যেকোনো প্রকারের ব্যবহারিক মূল্য থেকে স্বাধীন।[১৩]

উদাহরণস্বরূপ, লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চির মোনালিসা চিত্রকর্ম কিংবা প্রাকৃতিক বিস্ময়কর কোন বিষয় যেমন: দি গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন। এগুলোর স্বতঃমূল্য আছে অর্থ হলো এগুলোর স্বকীয় মূল্য থাকা। মোনালিসা চিত্রকর্ম বা দি গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন উভয়ই নিজেরা নিজেদের উদ্দেশ্য। অন্য কারো উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হিসেবে এগুলো মূল্যবান নয়। মোনালিসা চিত্রকর্মটি মানুষকে কতটুকু আনন্দ দিবে কিংবা দি গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন কতটুকু মানুষকে আশ্চার্যান্বিত করবে তার উপর এদের মূল্য নির্ভর করে না। এগুলোর নিজস্ব উদ্দেশ্য আছে।

আধুনিক জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্টের নৈতিকতার মূলনীতিতে শর্তহীন আদেশের দ্বিতীয় আকারের মধ্যে এ ধরনের স্বতঃমূল্যের কথা বলেন। তিনি বলেন, মানুষকে সর্বদা উদ্দেশ্য হিসেবে, অর্থাৎ স্বতঃমূল্যে মূল্যবান হিসেবে গণ্য করে কাজ করো, কখনোই মানুষকে শুধুমাত্র উপায় হিসেবে গণ্য করো না, তা সে মানুষ নিজে হও বা অন্য কেউ হোক।[১৪]

যে মূল্য মানুষের মূল্যায়নের উপর নির্ভর করে না তাকে বিষয়গত মূল্য অর্থে স্বতঃমূল্য বলা হয়। অর্থাৎ বস্তুর মূল্য কোন মূল্যায়নকারীর উপর নির্ভর করে না। উদাহরণস্বরূপ, আগ্রার তাজমহল বিষয়গত অর্থে স্বতঃমূল্যে মূল্যবান। মানুষ বা মূল্যায়নকারীর আরোপিত মূল্যের উপর এ মূল্য নির্ভর করে না। আবার কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের নয়নাভিরাম সৌন্দর্য এ অর্থে স্বতঃমূল্যে মূল্যবান। কক্সবাজারের অপার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, সাগর-পাহাড়ের অপূর্ব মিতালী, সামাজিক-সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধ ঐতিহ্য, নানা ধর্মের বর্ণের মানুষের অসাম্প্রদায়িক সহাবস্থান, পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্র্যের সমাহারসহ প্রকৃতির ভিন্নতর বৈশিষ্ট্যর কারণে এ স্থান বিষয়গত অর্থে স্বতঃমূল্যে মূল্যবান। পর্যটকরা এই স্থানের

গুরুত্ব দিচ্ছেন বলে তা স্বতঃমূল্যে মূল্যবান নয় বরং পর্যটক নিরপেক্ষভাবেই এ স্থানের নিজস্ব মূল্য আছে।

উপরের উল্লেখিত জন ও'নিল স্বতঃমূল্যের যে তিনটি ভিন্ন অর্থের কথা বলেন তা থেকে লক্ষ্য করা যায় ক্যালিকটের বক্তব্যে যে স্বতঃমূল্যের কথা বলা হয়েছে তা অ-ব্যবহারিক মূল্যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ তিনি মানুষ ছাড়া সকল অ-মানবসত্তাকে ব্যবহারিক মূল্যে মূল্যবান বলেছেন। আর মানুষকে স্বতঃমূল্যে মূল্যবান অর্থাৎ অ-ব্যবহারিক মূল্যে মূল্যবান অর্থে ব্যবহার করেছেন। ফলে ক্যালিকট মানবকেন্দ্রিক মূল্যের ক্ষেত্রে স্বতঃমূল্যকে অ-ব্যবহারিক অর্থে ব্যবহার করেছেন যা সত্যিকার অর্থে মানবকেন্দ্রিক মূল্য কথাটির সাথে সামঞ্জস্য কি না কিংবা যৌক্তিক কি না তা বিচার্য বিষয়। এর মাধ্যমে দেখানো যাবে যে মানবকেন্দ্রিকতাবাদের সাথে করণবাদের অপরিহার্য সম্পর্ক আছে কি-না এবং স্বতঃমূল্য ও পরতঃমূল্য মানুষের মূল্যায়নের উপর নির্ভর করে না।

ক্যালিকটের মানবকেন্দ্রিক মূল্যতত্ত্বের সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে তিনি ব্যবহারিক মুল্যকে মানবকেন্দ্রিকতা এবং অ-ব্যবহারিক মূল্যকে অ-মানবকেন্দ্রিকতা হিসেবে মনে করেন। অর্থাৎ তিনি মনে করেন মানবকেন্দ্রিক মূল্যতত্ত্ব অনুসারে অ-মানব প্রাণীসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক সত্তা কেবল ব্যবহারিক মূল্যে মূল্যবান। অর্থাৎ মানবকেন্দ্রিকতাবাদের সাথে করণবাদের অপরিহার্য সম্পর্ক আছে বলে তিনি মনে করেন। কিন্তু মানবকেন্দ্রিকতাবাদ হলেই তা করণবাদ হবে এমন নয়। এ কথা বাস্তব যে, পরিবেশের মধ্যে যত সত্তা রয়েছে তার মধ্যে মানুষ হচ্ছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ বলেই প্রকৃতিকে মানুষের উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হিসেবে সবসময় মূল্য দিবে, কেবল মানুষেরই স্বতঃমূল্য আছে এমন নয়, অ-মানব প্রাণী ও প্রকৃতিরও স্বতঃমূল্য থাকতে পারে। আবার প্রকৃতির ব্যবহারিক মূল্য আছে মানুষের নেই তাও বলা যায় না।

সুতরাং সকল ব্যবহারিক সম্পর্ক মানবকেন্দ্রিক হবে এমন নয় আবার সকল অ-ব্যবহারিক সম্পর্ক অ-মানবকেন্দ্রিক তাও বলা যাবে না। এ প্রসঙ্গে হারগ্রভ তাঁর Weak Antropocentric Intrinsic Value প্রবন্ধে আলোচনা করেন। তিনি ক্যালিকটের উল্লেখিত বক্তব্যকে অসমর্থন করেন এবং বলেন, বেশিরভাগ পরিবেশ নীতি-দার্শনিক মানবকেন্দ্রিক মূল্যকে ব্যবহারিক মূল্য এবং অ-মানবকেন্দ্রিক মূল্যকে অ-ব্যবহারিক মূল্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কারণ, পরিবেশগত নীতিনির্ধারণের সময় যেসব অর্থনৈতিক ও মূল্যবিষয়ক যুক্তি দেওয়া হয় সেসব যুক্তিতে মানুষের কাছে পরিবেশের মূল্যকে ব্যবহারিক মূল্য হিসেবে গণ্য করা হয়। হারগ্রভ মনে করেন এ কারণেই সম্ভাব্য

মানবকেন্দ্রিক শব্দটির প্রায়োগিক উদ্দেশ্যের দিক থেকে 'ব্যবহারিক' শব্দের সমার্থক হিসেবে গৃহীত হয়েছে।[১৫]

তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, গভীর বাস্তুবিদ্যার সমর্থকগণ ব্যবহারিক মূল্যের সাথে মানবকেন্দ্রিকতা এবং অ-ব্যবহারিক মূল্যের সাথে অ-মানবকেন্দ্রিকতার অভিন্নতাকে সমর্থন করে। ক্যালিকট গভীর বাস্তুবিদ্যার সমর্থক না হয়েও এ মতকে সমর্থন করেন। বস্তুত ক্যালিকট মানবকেন্দ্রিক মূল্যতত্ত্ব ও অ-মানবকেন্দ্রিক মূল্যতত্ত্বের সাথে যথাক্রমে ব্যবহারিক মূল্য ও অ-ব্যবহারিক মূল্যের সংমিশ্রণ করেন। হারগ্রভ তাঁর বিরুদ্ধে বলেন, এই ধারণা ত্রুটিপূর্ণ। মানবকেন্দ্রিক শব্দটি ব্যবহারিক শব্দের সমার্থক নয়, কখনোই ছিল না।[১৬]

হারগ্রভ দৃঢ়প্রত্যয়ী যে মানবকেন্দ্রিকতাবাদ থেকে অপরিহার্যভাবে করণবাদ নিঃসৃত হয় না। দুটি অ-মানব প্রাকৃতিক সত্তার মধ্যকার ব্যবহারিকগত সম্পর্ক থাকা খুবই স্বাভাবিক। এ ধরনের ব্যবহারিকগত সম্পর্ক অ-মানব প্রাকৃতিক সত্তার মধ্যে সংঘটিত হতে পারে। মানুষ জানুক আর না জানুক তাতে উক্ত অ-মানব সত্তার কিছুই যায় আসে না। একটি পোকা একটি মাকড়সা বা টিকটিকির নিকট ব্যবহারিকগতভাবে মূল্যবান হতে পারে। মানুষের তা জানা না জানা উক্ত অ-মানব সত্তাদ্বয়ের উপর প্রভাব ফেলে না। এ যুক্তির পক্ষে পরিবেশ নীতিবিদ্যায় একমাত্র দুর্বল মানবকেন্দ্রিক মতবাদকেই গ্রহণযোগ্য মতবাদ। আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে দুর্বল মানবকেন্দ্রিক মতবাদের প্রবক্তা হিসেবে নরটন, হারগ্রভ ও হেওয়ার্ড এর দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করেছি। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পর্যালোচনা করে হারগ্রভের দুর্বল মানবকেন্দ্রিক মতবাদটি অপেক্ষাকৃত বেশি গ্রহণযোগ্য মতবাদ বলে আমাদের ধারণা। মূলত হারগ্রভ তাঁর দুর্বল মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনায় বলেন যে, অ-মানব প্রাকৃতিক সত্তা কেবল স্বতঃমূল্যে মূল্যায়িত না বরং প্রকৃতিতে যেমন মানবকেন্দ্রিক স্বতঃমূল্য আছে তেমনি অ- মানবকেন্দ্রিক স্বতঃমূল্যও আছে। আবার মানবকেন্দ্রিক ব্যবহারিক মূল্য যেমন আছে তেমনি অ-মানবকেন্দ্রিক ব্যবহারিক মূল্যও আছে। এদিক থেকে হারগ্রভ স্বতঃমূল্য ও ব্যবহারিক মূল্যের উপর ভিত্তি করে মানবকেন্দ্রিক ও অ- মানবকেন্দ্রিক মূল্যের চার ধরণের সম্পর্কের কথা বলেন।[১৭] এগুলো হলো:-

১. অ- মানবকেন্দ্রিক ব্যবহারিক মূল্য;

২. মানবকেন্দ্রিক ব্যবহারিক মূল্য;

৩. অ- মানবকেন্দ্রিক অ-ব্যবহারিক মূল্য; ও

৪. মানবকেন্দ্রিক অ-ব্যবহারিক মূল্য।

উপর্যুক্ত সম্পর্কগুলো আলোচনার মাধ্যমে মানবকেন্দ্রিকতা প্রসঙ্গে ক্যালিকট যে ধারণা পোষণ করেছেন তা খন্ডন করা সম্ভব।

৩.১ অ-মানবকেন্দ্রিক ব্যবহারিক মূল্যঃ

হারগ্রভের মতে, অ- মানবকেন্দ্রিক ব্যবহারিক মূল্য মানুষের মূল্যায়ন ছাড়াই প্রকৃতিতে বিদ্যমান থাকে। অর্থাৎ এ মূল্য মানুষের মূল্যায়নের উপর নির্ভরশীল না। প্রকৃতিতে অ-মানব প্রাকৃতিক সত্তাসমূহের মধ্যে এ মূল্য সংঘঠিত হতে পারে। যেমন, একটি সাপ একটি বাজপাখির নিকট ব্যবহারিক মূল্যে মূল্যবান। আবার একটি ব্যাঙ্গ একটি সাপের নিকটও ব্যবহারিক মূল্যে মূল্যবান। মানুষের উপস্থিতি ছাড়াই কিংবা মূল্যায়ন ব্যতীত অ-মানব প্রাকৃতিক সত্তার মধ্যকার এ মূল্য বিদ্যমান থাকে। বস্তুত প্রাকৃতিক জগতে এ ধরণের দৃষ্টান্ত প্রায় সবক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, মানুষের মূল্যায়ন নিরপেক্ষভাবেই প্রকৃতিতে অ-মানবকেন্দ্রিক ব্যবহারিক মূল্য অস্তিত্বশীল।[১৮]

৩.২ মানবকেন্দ্রিক ব্যবহারিক মূল্যঃ

মানবকেন্দ্রিক ব্যবহারিক মূল্য মানুষের মূল্যায়নের উপর নির্ভরশীল। এ ধরণের মূল্য মানুষের উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন, ফ্লোরাইড মানুষের উপকারে আসে আবার ক্ষতিকরও বটে। মূলত ফ্লোরাইডের মূল্য মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়। এভাবে ফ্লোরাইডকে ব্যবহারিক মূল্যে মূল্যায়িত করা হয়। মানুষ তার প্রয়োজনবোধে এর মূল্য নির্ধারণ করে। উল্লেখ্য যে, মানুষ এ মূল্যকে আবিষ্কার করলেও তা সৃষ্টি করে না। ফ্লোরাইড কল্যাণকর কিংবা ক্ষতিকর হতে পারে তা মানুষের জানার উপর নির্ভর করে না। পূর্বেই বলেছি এ ধরণের মূল্য আমরা প্রকৃতিতে পেয়ে থাকি।[১৯] এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে মানবকেন্দ্রিক ব্যবহারিক মূল্যও অ- মানবকেন্দ্রিক ব্যবহারিক মূল্যের ন্যায় প্রকৃতিতে পাওয়া যায়।

৩.৩ অ-মানবকেন্দ্রিক অ-ব্যবহারিক মূল্যঃ

হারগ্রভের মতে, অ-মানবকেন্দ্রিক অ-ব্যবহারিক মূল্য মানুষের মূল্যায়নের উপর নির্ভর করে না এবং এ ধরণের মূল্যে মূল্যবান বস্তু নিজেই নিজের উদ্দেশ্য হিসেবে বিবেচিত হয়। অন্য কারও উদ্দেশ্য সাধনের উপায়স্বরূপ তা মূল্যবান হয় না। অর্থাৎ একে আমরা অ- মানবকেন্দ্রিক স্বতঃমূল্যে মূল্যবান

বলতে পারি। উদাহরণস্বরূপ, মাকড়সা তার জীবনধারণের জন্য পোকামাকড় ভক্ষন করে। এখানে মাকড়সা তার নিজেই নিজের উদ্দেশ্য হিসাবে অস্তিত্বশীল এবং নিজেদের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য এ অ-মানব প্রাণী প্রকৃতির আরেকটি অংশকে (পোকামাকড়) ব্যবহার করে। তাই বলা যায় যে, মাকড়সাটির অ-ব্যবহারিক স্বতঃমূল্য রয়েছে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এই মাকড়সার মূল্য মানুষের মূল্যয়নের উপরে নির্ভর করে না। প্রকৃতির যে নান্দনিক সৌন্দর্য তা অ-মানবকেন্দ্রিক কেননা মানুষ মূল্যায়ন কিংবা আবিষ্কার না করলেও প্রকৃতির নান্দনিক সৌন্দর্য নিঃশেষ হয় না। আবার, প্রকৃতির নান্দনিক সৌন্দর্য্যের মূল্যকে অ-ব্যবহারিক মূল্য বলা যায় কেননা, এই সৌন্দর্য্য অন্য কারো উদ্দেশ্য অর্জনের মাধ্যমে মূল্যবান নয় এবং তা নিজেই নিজের জন্য মূল্যবান অর্থাৎ নিজে নিজের উদ্দেশ্য হিসেবে বিবেচিত। হারগ্রভ তার অ-মানবকেন্দ্রিক অ-ব্যবহারিক মূল্য বা স্বতঃমূল্যের ধারণাটিকে পল টেইলরের সহজাত মূল্যের অনুরূপ মনে করেন। টেইলর তাঁর স্বতঃমূল্যকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সহজাত মূল্যের (Inherent Value) কথা বলেন। তাঁর মতে– কোনো একটি সত্তার সহজাত মূল্য আছে, এর মানে হলো এর ভালোত্ব (কল্যাণ, শুভ) সমস্ত নৈতিক কর্তার বিবেচনা ও মনোযোগের বিষয়াধীন। এর ভালোত্ব নিজেই নিজের উদ্দেশ্য হিসেবে লালন বা সংরক্ষণের উপযোগী এবং সেই সত্তার মঙ্গলের জন্যই এর ভালোত্বের লালন ও সংরক্ষণ করা দরকার। এই মূল্য কেবলমাত্র জীবন্ত সত্তাকেই নির্দেশ করে (মানুষ, প্রাণী বা উদ্ভিদ) । ... আর এসব সত্তার সহজাত মূল্য আছে এর মানে হল এদের মঙ্গলকে এদের নিজেদের জন্য লালন বা সংরক্ষণ করতে হবে।[২০]

এ থেকে আমরা বলতে পারি অ-মানবকেন্দ্রিক ব্যবহারিক মূল্যের ন্যায় অ-মানবকেন্দ্রিক অ-ব্যবহারিক মূল্যকেও প্রকৃতিতে পাওয়া যায় এবং মানুষের মূল্যায়ন ব্যতীত তা অস্তিত্বশীল থাকতে পারে।

৩.৪ মানবকেন্দ্রিক অ-ব্যবহারিক মূল্যঃ

হারগ্রভ মনে করেন, মানুষ যখন কোন সত্তাকে অ-ব্যবহারিক মূল্যে মূল্যবান মনে করে তখন তা মানবকেন্দ্রিক অ-ব্যবহারিক মূল্য বা স্বতঃমূল্যে মূল্যবান। তিনি মনে করেন এ ধরনের মূল্য মানুষের মূল্যায়নের উপর নির্ভরশীল এবং এ ধরণের মূল্যে মূল্যবান বস্তু নিজেই নিজের উদ্দেশ্য হিসেবে বিবেচিত হয়। অন্য কারও উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হিসাবে তা মূল্যবান নয়। অর্থাৎ এটি স্বতঃমূল্যে মূল্যবান। এক্ষেত্রে হারগ্রভ পল টেইলরের স্বতঃমূল্যের ধারণাকে গ্রহণ করেন। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে হারগ্রভের দুর্বল মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনায় আমরা এ বিষয়ে আলোকপাত করেছি। মূলত টেইলর বলতে চেয়েছেন যে, কোন সত্তাকে স্বতঃমূল্যে মূল্যবান হতে হলে মূল্যায়নকারী (মানুষ)

সত্তাকে মূল্যবান বলে মনে করবে। সত্তাটির মূল্য নিজ গুণেই বর্তমান থাকতে পারে। কিন্তু মানুষ যতক্ষন না মূল্য আরোপ করবে ততক্ষণ তা মূল্যবান হবে না।

হারগ্রভ মনে করেন যে, কোন একটি প্রথা বা রীতি-নীতিকে যদি মানুষ পালন না করে কিংবা মেনে না চলে তবে এর স্বতঃমূল্য থাকে না। সুতরাং স্বতঃমূল্যে মূল্যবান বস্তুকে সংরক্ষণ, লালন করতে হবে, একে ধ্বংস করা যাবে না। হারগ্রভের এ ধরণের মূল্য অ-মানব প্রাকৃতিক সত্তার উপরও আরোপ করা যায়। মূলতঃ এ ধরনের মূল্যকেই হারগ্রভ মানবকেন্দ্রিক স্বতঃমূল্য বলেন। হারগ্রভ চারপ্রকার মূল্যের মধ্যে মানবকেন্দ্রিক স্বতঃমূল্যকে সম্পূর্ণরূপে মানুষের মূল্যায়নের উপর নির্ভরশীল বলে মনে করেন।[২১] তাছাড়া তিনি মনে করেন যে, মানবকেন্দ্রিক মূল্য করণবাদকে নিঃসৃত করে না অর্থাৎ এ ধরনের মূল্য যেমন অ-ব্যবহারিক মূল্য এবং ব্যবহারিক মূল্য হতে পারে তেমনি অ-মানবকেন্দ্রিক মূল্যও অ-ব্যবহারিক মূল্য কিংবা ব্যবহারিক মূল্য হতে পারে।

অর্থাৎ স্বতঃমূল্য বা ব্যবহারিক মূল্যের সাথে মানবকেন্দ্রিকতাবাদ ও অ-মানবকেন্দ্রিকতাবাদের কোন অপরিহার্য সম্পর্ক বিদ্যমান নেই।

হারগ্রভ তাঁর দুর্বল মানবকেন্দ্রিকতাবাদ আলোচনা করতে গিয়ে অ-মানবকেন্দ্রিকতাবাদের দুটি মূল অবস্থানকে ব্যাখ্যা করেন।[২২] এগুলো হল:

১. বিষয়গত অ-মানবকেন্দ্রিক স্বতঃমূল্য;ও

২. বিষয়ীগত অ-মানবকেন্দ্রিক স্বতঃমূল্য।

স্বতঃমূল্য ও পরতঃমূল্য বা ব্যবহারিক মূল্য মানুষের মূল্যায়নের উপর নির্ভর করে কিনা তা সুস্পষ্ট করার জন্য হারগ্রভের এ সংক্রান্ত বিষয়গুলো ও পর্যালোচনা করা উচিত।

৩.৫ বিষয়গত অ-মানবকেন্দ্রিক স্বতঃমূল্য:

বিষয়গত অ-মানবকেন্দ্রিক স্বতঃমূল্য অনুসারে অ-মানব প্রাকৃতিক সত্তাসমূহের স্বতঃমূল্য আছে। হারগ্রভ এর বিরোধতা করেন। তিনি বলেন যে, এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবেশগত নীতিবিদ্যা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কার্যকর তত্ত্ব হিসেবে পরিগণিত হতে পারে না। কারণ বিষয়গত অ-মানবকেন্দ্রিক স্বতঃমূল্য কেবল জীবন্ত সত্তার স্বতঃমূল্যকে দাবি করে, প্রকৃতির প্রাণহীন সত্তাসমূহ নৈতিক বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত নয়। কিন্তু হারগ্রভের মানবকেন্দ্রিক স্বতঃমূল্য এ ধরনের ত্রুটিমুক্ত। কারণ মানবকেন্দ্রিক স্বতঃমূল্য জীবন্ত সত্তার পাশাপাশি প্রাণহীন সত্তাকেও নৈতিক বিবেচনার বিষয় মনে করে। তাই হারগ্রভের দাবি

বিষয়গত অ-মানবকেন্দ্রিক স্বতঃমূল্য পরিবেশ নীতিবিদ্যায় তখনই পর্যাপ্ত দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে যখন তা মানবকেন্দ্রিক স্বতঃমূল্যের পরিপূরক হবে।

৩.৬ বিষয়ীগত অ-মানবকেন্দ্রিক স্বতঃমূল্যঃ

হারগ্রভ বিষয়ীগত অ- মানবকেন্দ্রিক স্বতঃমূল্যকে খন্ডন করেন। এক্ষেত্রে তিনি ক্যালিকটের দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধিতা করেন। হারগ্রভ মনে করেন যে, বিষয়ীগত অ-মানবকেন্দ্রিক স্বতঃমূল্যকে আমরা খুব সহজেই মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রতিস্থাপন করতে পারি। বিষয়ীগত অ-মানবকেন্দ্রিকতাবাদী হিসেবে ক্যালিকট দাবি করেন যে, মূল্যগুলো সম্পূর্ণভাবে মানুষের বিবেচনার উপর নির্ভরশীল। পৃথিবীতে এমন কোন মূল্যের অস্তিত্ব নেই যা মানুষ দ্বারা আরোপিত হয়নি। হারগ্রভ যুক্তি দেন যে, যদিও ক্যালিকট নিজেকে অ-মানবকেন্দ্রিক দাবি করেছে তথাপি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির সাথে মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে খুব কমই পার্থক্য আছে। ক্যালিকট স্বীকার করেন যে, বৈজ্ঞানিক প্রাকৃতিকবাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সকল প্রকার মূল্যের উৎস হল মানব সচেতনতা। কিন্তু তার মানে এটা নয় যে, সকল মূল্যের স্থান হলো প্রজ্ঞা, আনন্দ এবং জ্ঞানের মতো চেতনা। অন্য কথায়, কোনকিছু মূল্যবান হতে পারে, কিন্তু এটি উদ্দেশ্যমূলক কিন্তু আত্ম-নির্দেশক নয়। এক্ষেত্রে নবজাতক তার পিতামাতার নিকট খুবই আনন্দের কেবল তাদের নিজের স্বার্থেই। একটি শিশু একটি পাথর বা হাইড্রোজেন পরমানুর ন্যায় মূল্য নিরপেক্ষ। আধুনিক বিজ্ঞানের বিষয়ী-বিষয় বা ঘটনা মূল্যের বিপরীতের মাধ্যমে কঠোরভাবে বিবেচনা করা হয়। তবুও বলতে হয় যে একটি নবজাতক শিশু স্বতঃমূল্যে মূল্যবান (যদিও এর মূল্য মানব চেতনার উপর নির্ভর করে) এক্ষেত্রে ক্যালিকটের বক্তব্য হল:

...Yet we still may wish to say that a new born infant is “intrinsically valuable” (even though its value depends, in the last anylysis, on human consiousness) in order to distinguish the nonistrumental value it has for its parents, relatives, and the human community generally from its actual or potential instrumental value- the pleasure it gives its parents, the pride it affords its relatives, the contribution it makes to society and so forth. In doing so, however, “intrinsic Value” ratains only half of its traditional meaning. An Intrinsically valuable thing or this reading is valuable for its own sake, for itself, but it is not valuable in itself, that is, completely independently of any conciousness, since no value can, in principle, from

the point of view of normal science, be altogether independent of a valuing consciousness.[২৩]

ক্যালিকটের উপরোক্ত দাবি অ-মানবকেন্দ্রিক কেননা তাঁর মতে, মানুষ অ-মানব প্রাকৃতিক সত্তাসমূহকে তাদের নিজেদের প্রয়োজনে মূল্য দেয়। আবার এটি স্বতঃমূল্যে মূল্যবান কেননা অন্যান্য বস্তু তাদের নিজেদের প্রয়োজনে মূল্যবান। তিনি আরও বলেন মানব মূল্যায়নকারী কোন বস্তুকে মূল্য দেয় কেবল তার নিজের জন্য, অ-মানব প্রাকৃতিক সত্তা তাদের নিজেদের জন্য মূল্যবান নয়, কেননা প্রকৃতিতে কোন প্রকার বিষয়গত অ-মানবকেন্দ্রিক স্বতঃমূল্য নেই। হারগ্রভ ধারণা করেন ক্যালিকটের এ দৃষ্টিভঙ্গিই এক পর্যায়ে মানবকেন্দ্রিকতায় পর্যবসিত হয়। ক্যালিকট যখন বলেন যে, মানুষ দ্বারা মূল্য আরোপিত না হলে মূল্যের অস্তিত্ব থাকে না। তখন হারগ্রভ তাঁর অ-মানবকেন্দ্রিক ব্যবহারিক মূল্যের কথা বলেন। কেননা এ ধরনের মূল্য মানুষের বিবেচনা ছাড়াই প্রকৃতিতে অস্তিত্বশীল থাকে। তাই হারগ্রভ বলেন যে, বিষয়ীগত মানবকেন্দ্রিকতাবাদীদের স্বীকার করা উচিত যে, অ-মানবকেন্দ্রিক স্বতঃমূল্য মানুষের আরোপিত মূল্য ছাড়াও অস্তিত্বশীল থাকে। হারগ্রভ বলেন যে, এছাড়াও ক্যালিকটের অবস্থান খুব বেশি বিষয়ীমূলক কেননা তিনি দাবি করেন কোন মূল্যই মানুষের দ্বারা আরোপিত হওয়া ছাড়া অস্তিত্বশীল হয় না। কিন্তু হারগ্রভ বলেন যে, মূল্য সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তির পছন্দের দ্বারা স্বেচ্ছাচারী সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল নয়। কারণ বাস্তবে আমরা দেখি যে, প্রকৃতিতে মানুষের উপস্থিতি কিংবা অনুপস্থিতি উভয় অবস্থায় স্বতঃমূল্য ও ব্যবহারিক মূল্যের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে। সুতরাং ক্যালিকটের অবস্থানকে তাঁর বিষয়ীগত মনোভাবের জন্য মানবকেন্দ্রিক বলা হয়। তাই বলা যায় ক্যালিকটের দৃষ্টিভঙ্গিতে অসংগতি রয়েছে। সাধারণত আমরা দেখি যে, অ-মানবকেন্দ্রিকতাবাদ মূল্যের বিষয়গত দিককে সমর্থন করে।

কিন্তু ক্যালিকটই অ-মানবকেন্দ্রিক স্বতঃমূল্যের কথা বলে আবার মূল্যের বিষয়ীগত দিককে বিশ্বাসের দাবি করেন। কারণ তিনি বলেন মূল্য হলো মানব মনের অভিক্ষেপ। সুতরাং ক্যালিকটের মতবাদে স্ববিরোধিতা লক্ষ্য করা যায় যখন তিনি বলেন যে, মূল্য হলো মানব মনের অভিক্ষেপ এবং অ-মানব প্রাকৃতিক সত্তার কেবল স্বতঃমূল্য আছে। তাছাড়া আমরা দেখি যে, ক্যালিকটের স্বতঃমূল্যের ধারণার মধ্যে অসংগতি আছে।

ক্যালিকট তাঁর স্বতঃমূল্য ধারণাটিকে জৈব-সহানুভূতি (Bio-Empathy) থেকে গ্রহণ করেছেন। তাঁর এই জৈব-সহানুভূতি মূলত হিউম, ডারউইন এবং লিওপোল্ড থেকে উদ্ভূত। ক্যালিকটের তিনজন

তাত্ত্বিক সমন্বয়ের সাথে আমরা একমত হবো না কেননা তাদের মধ্যে তত্ত্বগত পার্থক্য রয়েছে এবং তাঁরা কেউ স্বতঃমূল্যের কথা তাদের তত্ত্বে বলেন নি।

স্বতঃমূল্যের উৎস হিসেবে জৈব-সহানুভূতিকে সমর্থন করা একধরনের বিভ্রান্তিকর, অপ্রাসঙ্গিক এবং ক্যালিকটের অ-মানবকেন্দ্রিক স্বতঃমূল্য বিষয়ক ধারণার সাথে এর কোন সামঞ্জস্যতা নেই। ক্যালিকট হিউম, ডারউইন এবং লিওপোল্ডের মূল্যবিদ্যা (Axiology) সংক্রান্ত বিষয়কে জৈবিক সত্তাসমূহের সাথে এক করে ফেলেন। তিনি মূলতঃ হিউমের নৈতিকতা থেকে জৈব-সহানুভূতি ধারণাটি নিয়েছেন।

ব্রিটিশ দার্শনিক ডেভিড হিউমের (১৭১১-১৭৭৬) মতে, কোন স্বতঃসিদ্ধ চিরন্তন নিয়ম থেকে নৈতিকতা উৎসারিত হয় না। বরং মানুষের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থানসমূহ হল নৈতিকতার মূল উৎস। তাই তিনি অনুভূতি ও আবেগ (Passions)কে মানুষের সকল ঐচ্ছিক ক্রিয়ার মূল উৎস বলে মনে করেন। তাঁর মতে, প্রজ্ঞা নয় বরং ভাবোচ্ছ্বাসই আমাদের নৈতিক কার্য নির্ধারণ করে থাকে।[২৪]

তিনি মনে করেন নৈতিকতার সাথে মানুষের সাধারণ স্বার্থের একটি যোগসূত্র আছে। তাই এক্ষেত্রে তিনি আবেগ অনুভূতির ভূমিকাকে গুরুত্ব দেন। কার্যনির্ধারণ নীতি (action guiding principle) হিসেবে নৈতিক অবধারণগুলো আমাদের আবেগ অনুভূতির মধ্যেই নিহিত থাকে। তবে তিনি প্রজ্ঞার ভূমিকাকে একেবারে অস্বীকার করেন নি। নৈতিক সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে, নৈতিক প্রশ্নের সমাধানের ক্ষেত্রে প্রজ্ঞারও যে ভূমিকা আছে হিউম তা স্বীকার করেন। তবে এক্ষেত্রে ভাবোচ্ছ্বাস বা আবেগ-অনুভূতিই মূখ্য, প্রজ্ঞার ভূমিকা গৌণ। অর্থাৎ আমরা যখন কোনকিছুকে ভাল বা মন্দ বলি তখন কাজাটিকে ভাল বা মন্দ বলার পেছনে প্রজ্ঞার চেয়ে আবেগ-অনুভূতিই বেশি ভূমিকা পালন করে। পাশাপাশি হিউম নৈতিক প্রশ্নে প্রজ্ঞার ভূমিকার কথাও বলেন। তাঁর মতে, কাজের ভালমন্দ নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রজ্ঞার ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাঁর মতে, আবেগ বা অনুভূতি দ্বারা উদ্বুদ্ধ নৈতিক আদর্শটিকে রূপায়নের ক্ষেত্রে প্রজ্ঞা উপায় নির্ধারণের সহায়ক। অতএব কোন কাজে ব্যক্তির সুখ বা দুঃখ উৎপাদিত হবে, তখন প্রজ্ঞা তা আমাদেরকে অবহিত করে। তবে হিউমের একমাত্র প্রধান বক্তব্য হল, নৈতিক বিচারের ক্ষেত্রে প্রজ্ঞার ভূমিকা আবেগ অনুভূতির মত মূখ্য নয়।[২৫]

হিউম এভাবে নৈতিক জ্ঞানের বিষয়গত ধারণা প্রত্যাখ্যান করে বলেন যে নৈতিকতা ব্যক্তির সুখ বা দুঃখের অনুভূতির সাথে সংযুক্ত। হিউম বিষয়গত বা সার্বজনীন নৈতিক আদর্শ বলতে কোনো কিছুকে স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, নৈতিক প্রশ্ন মাত্রই আত্মকেন্দ্রিক কামনা-বাসনার প্রতিফলন। তিনি আরও মনে করেন যে, নৈতিক মূল্য ব্যক্তির আবেগ-অনুভূতির উপর নির্ভরশীল এবং নৈতিক মূল্যবোধ

আমাদের মানসিক অবস্থার প্রতিফলন। বস্তুর মধ্যে ভালত্ব-মন্দত্ব বলতে কোন কিছু নেই, ভালত্ব-মন্দত্ব আমাদের মন দ্বারা আরোপিত ধারণা। সুখের অনুভূতি ভাল এবং দুঃখের অনুভূতি মন্দ। এখন প্রশ্ন হলো এগুলো নিরূপনের উপায় কী ? অর্থাৎ কোন সুখকে আমরা ভালো বলবো আর কোন সুখকে মন্দ বলবো? ব্যক্তির নিজের জন্য সুখ ভাল নাকি সর্বসাধারণের জন্য সুখ চাওয়া ভাল? আবার, ব্যাক্তির নিজের দুঃখ খারাপ নাকি সর্বসাধারণের বেদনা কষ্টকে খারাপ বা মন্দ বলবো? এ প্রসঙ্গে হিউম বলেন, অন্যের প্রতি সহানুভূতির মাধ্যমে নিঃস্বার্থ বা পক্ষপাতশূন্য সুখ বা দুঃখের অনুভূতিই একমাত্র নৈতিক দিক থেকে ভাল বা মন্দ। সহানুভূতি আমাদেরকে অন্যের সুখ কামনা এবং দুঃখ পরিহার করতে প্রলুব্ধ করে। এ বিষয়ে হিউম বলেন, অন্যের প্রতি সহানুভূতির জন্য আমরা যে কাজে আনন্দ পাই তা অনুমোদন করি এবং যে কাজে দুঃখ বা বেদনা অনুভব করি, তা অননুমোদন করি। তাই তিনি বলেন, আত্মস্বার্থবাদ থেকে পরার্থবাদে উত্তরণে সহানুভূতিই আমাদের অনুপ্রেরণা যোগায়।

হিউমের উপর্যুক্ত নৈতিক মতবাদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো মানুষের আচরণ একান্তভাবে তার আবেগ-অনুভূতি এবং আত্ম-স্বার্থের উপর ভিত্তি করে হয়ে থাকে। তাই কোন নৈতিক সিদ্ধান্তকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা যায় না। এ ধরনের আপেক্ষিক নৈতিকতা (Relativistic ethics) সম্পর্কিত সমস্যাকে কাটিয়ে উঠার জন্য হিউম 'বিচক্ষণ দর্শক' (Judicious Spectator) এর কথা বলেন।[২১] একজন বিচক্ষণ দর্শক কোন কাজ ভাল নাকি মন্দ তা তাদের আবেগ এবং আগ্রহের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করবেন। এ ধরণের 'বিচক্ষণ দর্শক' কোন বিষয় বা পরিস্থিতি সম্পর্কে নিরপেক্ষভাবে বিবেচনা করা উচিত এবং কোন প্রকার ব্যক্তিগত স্বার্থ অথবা অনুভূতিকে তাদের বিচারের সময় অনুমোদন করবে না।

এক্ষেত্রে হিউম তিনটি শর্তের কথা বলেন,

১. আমাদেরকে বিষয় বা পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন হওয়া উচিত।

২. আমাদের মানব প্রকৃতি সম্পর্কে সচেতন থাকা উচিত এবং

৩. একজন বিচক্ষণ দর্শক অ-আত্মকেন্দ্রিক (Non-egocentric) হয়ে কাজ করবেন।[২৬]

উপর্যুক্ত শর্তগুলো পূরণ করা অত্যন্ত কঠিন হলেও প্রত্যেকটি পরিস্থিতিতে অনুমোদন কিংবা অননুমোদন পাওয়ার জন্য এগুলো পূরণ হওয়া আবশ্যক।

যাহোক, এখন পর্যন্ত এটি অস্পষ্ট যে, ক্যালিকট কেন হিউমের নৈতিক অবস্থানের সাথে তাঁর স্বতঃমূল্যকে সম্পর্কিত করলেন। মূলতঃ ক্যালিকট হিউমকে স্বতঃমূল্যের উৎস হিসাবে চিহ্নিত করার কারণ হল হিউমের সম্প্রদায়গত স্তর গঠন (Community level Formation) এবং হিউমের মতে ব্যক্তির প্রতি সহানুভূতি হতেই পরবর্তীতে তা সম্প্রদয়ের মধ্যে সম্প্রসারিত হয়। ক্যালিকট এটাকে তাঁর মতের সাথে সংযুক্ত করেন। তিনি মনে করেন, ব্যক্তি থেকে সম্প্রদয়ের মধ্যে সম্প্রসারিত হলে তা সমষ্টিতগত সত্তার মধ্যে বিস্তার লাভ করবে এবং অতঃপর পুরো বাস্তুসংস্থানে তা বর্ধিত হবে।

ক্যালিকটের এই চিন্তাটা একেবারেই সঠিক নয় কেননা হিউমের সহানুভূতি কেবল ব্যক্তির সাথে সংযুক্ত; ক্যালিকট যেভাবে সমষ্টিগত সত্তার ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ করেছেন হিউম তা একেবারেই বলেনি। তিনি মানুষের ক্ষেত্রে ব্যক্তি থেকে সমষ্টিগত মানুষে উত্তরণ হবে বলেছেন। অর্থাৎ তিনি আত্মস্বার্থবাদ থেকে পরার্থবাদে উত্তরণের কথা বলেছেন যা মূলতঃ মানুষের সাথে সংশ্লিষ্ট।

হিউমের দর্শনের সাথে ক্যালিকটের ব্যাখ্যাটির মধ্যে উক্ত অসঙ্গতি থাকা সত্ত্বে ক্যালিকট দাবি করেন যে, ডারউইনের অবস্থানে হিউমের প্রত্যক্ষ ফলাফল ছিল। এখানে ক্যালিকটের মূল ভূলটি হল তাঁর জৈব-সহানুভূতি পদ্ধতিতে হিউম কখনই অ-মানব অস্তিত্বের ক্ষেত্রে স্বতঃমূল্যের কথা বলেন নি।

যান্ত্রিক বা জৈবিক বিবর্তনবাদের সমর্থক চার্লস ডারউইন (১৮০৯-১৮৮২) বলেছেন যে, প্রজাতির বেঁচে থাকার জন্য পিতামাতাদের তাদের বংশধরদের প্রতি যত্নশীল হতে হয়।[২৭] ফলে সহানুভূতি পিতামাতার যত্ন থেকে শুরু হয়, পরবর্তীতে দেখা যায় পিতা-মাতা তাদের সন্তানদের বেঁচে থাকার জন্য সম্প্রদায় বা সমাজের সুরক্ষার কথা ভাবলেন। এটাই ছিল মূল্যের উৎপত্তি ও বিকাশের কারণ। এটা ছিল সরাসরি কারও বংশধর টিকিয়ে রাখার জন্য জৈবিক প্রতিক্রিয়া। প্রথমদিকে এটি পুরোপুরি আত্ম-স্বার্থকেন্দ্রিক ছিল কিন্তু পরবর্তীতে তা সমগ্রের মধ্যে বিস্তার লাভ করেছে। এখানেও বোঝা খুবই দুরুহ যে ক্যালিকট কিভাবে ডারউইনের এ দৃষ্টিভঙ্গির সাথে অ-মানব সত্তার স্বতঃমূল্যকে সমর্থন করেন। ডারউইন প্রস্তাব করেছিলেন যে, সহানুভূতির মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ন্যায়বিচার বিকশিত হয়েছে। পরিবার থেকে যত্নের প্রয়োজনটি ধীরে ধীরে সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রসারিত হতে শুরু করে। যেমন, কেউ একজন তার সন্তানকে দেখাশুনা করছে, পরবর্তীতে সেটা অন্য কোন ব্যক্তি যেমন, চাচা, মামা, খালু এবং শেষ পর্যন্ত পরিবারের গন্ডি পেরিয়ে পুরো সমাজের প্রতি যত্নশীল হতে শুরু করে। সময়ের সাথে সাথে এই সহানুভূতি ব্যক্তি থেকে সমাজ, সমাজ থেকে প্রদেশ, জাতি এবং শেষ পর্যন্ত সামগ্রিক বাস্তুসংস্থানের মধ্যে প্রসারিত হতে থাকে। তবে এখনও এটা অস্পষ্ট যে,

ডারউইনের চিন্তা ভাবনার সাথে অ-মানব সত্তার স্বতঃমূল্যের মূল্যায়ন কিভাবে সম্পর্কিত। ডারউইন তাঁর লেখায় কোথাও অ-মানব প্রাণীর স্বতঃমূল্য কিংবা অ-ব্যবহারিক মূল্য সম্পর্কে বলেন নি। তবে হয়তো ডারউইনের বিবর্তনমূলক কাঠামোটিকে অ-মানব সত্তার স্বতঃমূল্যে মূল্যবান হওয়ার দিকে অগ্রসর হতে সহায়তা করবে।

প্রশ্ন হচ্ছে ক্যালিকট জৈব সহানুভূতির মাধ্যমে হিউম, ডারউইন এবং লিওপোল্ডের মধ্যে যে সংযোগ স্থাপন করেছেন তা প্রাসঙ্গিক কিনা? তাছাড়া হিউমের সাথে ডারউইনের মতের পার্থক্যও রয়েছে। হিউমের মতে সমাজ ও ন্যায়বিচার সম্প্রদায়ের অন্যান্য ব্যক্তির প্রতি সহানুভূতির পূর্বেই ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, সহানুভূতি তৈরী হওয়ার পূর্বে সমাজকে একসাথে ঐক্যমত হতে হবে। সমাজকে এর সম্পত্তি এবং ব্যক্তির উপকারের জন্য ন্যায়বিচার এবং আইনগুলো নির্ধারণ করা হয়েছিল। তারপর সহানুভূতি ও নৈতিক অনুভূতি এসেছে যখন ব্যক্তিরা বুঝতে পেরেছিল যে উদার হলে তা তাদের জন্য, তাদের সম্প্রদায়ের জন্য উপকার বয়ে আনবে। অন্যদিকে ডারউইন মনে করেন যে, সহানুভূতি প্রথমে পরিবারের সদস্য থেকে আসে, এটি তারপর সম্প্রদায়, সমাজের মধ্যে প্রসারিত হয়। অতঃপর ন্যায়বিচার ও আইনগুলি তৈরি করা হয়।

এ পার্থক্যটিই ক্যালিকটের স্বতঃমূল্যের ধারণাটিকে পুরোপুরি অকার্যকর করে দেয়। কারণ ক্যালিকট দু'জনের তত্ত্বকে একই মূল্যবিদ্যক দৃষ্টিভঙ্গির আওতায় নিয়ে আসেন। আবার ক্যালিকট লিওপোল্ডের দৃষ্টিভঙ্গিকেও তাঁর জৈব-সহানুভূতি দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সংযুক্ত করেন। লিওপোল্ডের দৃষ্টিভঙ্গি পর্যলোচনা করেও আমরা দেখবো যে ক্যালিকট সঠিকভাবে লিওপোল্ডের তত্ত্বকেও উপলব্ধি করতে পারেন নি।

লিওপোল্ডের ভূমি নীতিবিদ্যা কেবল মানব সম্প্রদায়কে নয় সমগ্র ভূ-সম্প্রদায়কে নৈতিক বিবেচনার আওতাভুক্ত করার কথা বলে। তিনি মনে করেন মানবসমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাথে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা রয়েছে। একইভাবে বাস্তসমাজে জলাভূমি, জনহীন প্রান্তর, মরুভূমি, অরণ্য প্রভৃতি সম্প্রদায় আছে। এগুলোও পারস্পরিক নির্ভরশীলতার সম্পর্কে সম্পর্কিত। অর্থাৎ প্রকৃতির সকল কিছু একে অন্যের সাথে সংযুক্ত। সনাতনী নীতিবিদ্যায় কেবল মানুষকেই নীতিবিদ্যার বিষয়বস্তু হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। লিওপোল্ড তাঁর ভূমি নীতিবিদ্যায় সনাতনী নীতিবিদ্যার মানুষের স্থলে সমগ্র 'বাস্তুতন্ত্র' কে প্রতিস্থাপন করেন। তিনি বলেন, সমগ্র বাস্তুতন্ত্র হলো নৈতিক বিবেচনার বিষয়বস্তু। ক্যালিকট দাবি করেন যে লিওপোল্ড এখানে স্বতঃমূল্যের কথা বুঝিয়েছেন। যদিও লিওপোল্ড কখনও তা উল্লেখ করেননি।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণ হয় যে, হিউম, ডারউইন এবং লিওপোল্ড কখনোও উল্লেখ করেননি যে, অ-মানব সত্তা স্বতঃমূল্যে মূল্যবান । কিন্তু ক্যালিকট এখনও দাবি করছেন যে, তারা অ-মানব সত্তার স্বতঃমূল্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

ক্যালিকট এটাও বলেন যে, লিওপোল্ড তাঁর মতাদর্শের মাধ্যমে স্বতঃমূল্যের কথা বলেন এবং সেই জন্যই তিনি একজন অমানবকেন্দ্রিক। এক্ষেত্রে ব্রায়ান নরটন দাবি করেন যে, লিওপোল্ড মূলত অ-মানবকেন্দ্রিকতাবাদী নন। তবে তাকে দুর্বল মানবকেন্দ্রিকতাবাদী বলা যায়। তিনি দাবি করেন যে, লিওপোল্ড অ-মানব সত্তার সংরক্ষণে সমর্থন করেছিলেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কল্যাণের কথা চিন্তা করে এবং তিনি কোথাও অ মানবকেন্দ্রিকতাবাদ নিয়ে আলোচনা করেননি।[২৮]

লিওপোল্ড একটি দুর্বল মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ করেছেন কারণ তিনি দাবি করেন যে, প্রজাতিগুলোর রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব কেননা সেগুলো আমাদের ব্যবহারের জন্য, বাস্তুতন্ত্রের জন্য প্রয়োজনীয় এবং তদুপরি আমাদের বেঁচে থাকার জন্য দরকারী। লিওপোল্ড আরও বলেন, আমাদের বাস্তুতন্ত্রকে রক্ষা করা উচিত কারণ বর্তমানে আমাদের কোন কাজে না লাগলেও ভবিষ্যতে ব্যবহার হতে পারে। এটা অর্থনীতির option value এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।[২৯]

কোন একটি নির্দিষ্ট প্রজাতির প্রয়োজন না থাকতে পারে। কিংবা কোন প্রজাতির আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ মূল্য নেই তার মানে এই নয় যে, তারা ভবিষ্যতে মূল্যবান হবে না। (ভবিষ্যতের কোন নির্দিষ্ট সময়সীমা দেয়া হয়নি। পরিবেশ রক্ষার প্রতিই প্রধান গুরুত্ব দেয়া হয়েছে কারণ ভবিষ্যতের মানুষেরা তাদের কাছ থেকে উপকৃত হতে পারে)। তাই যদি আমাদের তাদের রক্ষা করার ক্ষমতা থাকে তবে কনডর, আটার এবং গ্রিজলির মতো প্রজাতিগুলো বিলুপ্ত হতে দেয়া উচিত নয় ।[৩০]

লিওপোল্ড দাবি করেননি যে, এই প্রজাতিগুলোকে আমাদের রক্ষা করা উচিত কারণ তাদের নিজস্ব মূল্য আছে। বরং তিনি বলেছেন যে, বর্তমানে আমাদের নিকট তাদের কোন মূল্য না থাকলেও ভবিষ্যতে আমাদের নিকট মূল্যবান হতে পারে অর্থাৎ আমাদের কাজে লাগতে পারে। সুতরাং এই বাধ্যবাধকতা ভবিষ্যৎ মানুষের উপকারের জন্য কোন প্রজাতির জন্য নয়। এমনকি লিওপোল্ড এটাও বলেছেন যে বৃহত্তর কোন গ্রহণযোগ্য ভালোর জন্য কয়েকটি প্রজাতিকে অপসারণও করা যাবে।[৩১]

তাই নরটন বলেন যে, লিওপোল্ডের সমষ্টিবাদ দুর্বল মানবকেন্দ্রিকতাবাদেরই আরেকটি রূপ । আমরা বাস্তুতন্ত্রকে রক্ষা করবো কারণ তা আমাদের জন্য মূল্যবান। লিওপোল্ড দাবি করেন যে, মানবকল্যাণের জন্য পরিবেশের গ্রহণযোগ্য পরিবর্তন সাধন করা যাবে।[৩২] লিওপোল্ড এর

মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি এ উক্তির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়ঃ "প্রত্যেকের মতো আমারও একটি ভবিষ্যৎ লক্ষ্য আছে। আমিও সংরক্ষণে আগ্রহী। এর দুটি কারণ: ১. এটি দ্বারা আমাদের অর্থনীতি চূড়ান্তভাবে বিপর্যস্ত হবে ২. এটি ছাড়া অনেক উদ্ভিদ, প্রাণী এবং এগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর অস্তিত্ব পাবো না।[৩৩]

সুতরাং লিওপোল্ডের ভূমি-নীতিবিদ্যা অ-মানব প্রজাতি ও বাস্তুতন্ত্রের উপর আমাদের নির্ভরশীলতার কথা বলে এবং পরিবেশের জন্য আরও বিস্তৃত দায়িত্বশীল পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তার কথা বলে। আমাদের অবশ্যই নিজের জন্য ও অন্যান্য সমস্ত জীবনের একটি সম্মানজনক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা উচিত যেখানে পৃথিবীকে অপবিত্র না করেই সকলে একসাথে বসবাস করতে সক্ষম হবে।[৩৪]

কোন কোন পরিবেশ দার্শনিক মনে করেন যে, লিওপোল্ড মানবকেন্দ্রিকতাবাদ থেকে অ-মানবকেন্দ্রিকতাবাদে পরিবর্তিত হয়েছেন। কিন্তু এটা হল মূলত প্রথম দিকে তাঁর বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে। লিওপোল্ড যখন বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতামূলক জ্ঞান সম্পর্কে অবহিত হন তখন তিনি পূর্বের নেতিবাচক সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেন। এটা ছিল মূলতঃ তাঁর অ-মানবকেন্দ্রিকতাবাদের দিকে যাওয়ার চেয়ে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও গবেষণার বিকাশের ফলাফল।

সুতরাং ক্যালিকটের জৈব-সহানুভূতি দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ক্যালিকটের উল্লেখিত তিনজন দার্শনিকের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। অধিকন্তু উক্ত তিনজন দার্শনিক- হিউম, ডারউইন এবং লিওপোল্ড যথেষ্টভাবে একে অপরের থেকে পৃথক হওয়া সত্ত্বে তাঁরা মানুষের মূল্যকে সমর্থন করে এবং অ-মানব সত্তার স্বার্থের চেয়ে মানুষের স্বার্থ রক্ষার জন্য তাদেরকে সংরক্ষণের কথা বলেন। মূলত, তিনজন দার্শনিকই আমাদের নৈতিক উদ্বেগকে আরও প্রসারিত করার প্রস্তাব করেছিলেন কারণ এতে করে মানুষ নিজেই উপকৃত হবে।

ক্যালিকট তাঁর In Defence of the land Ethics: Eassays in Environmental Philosophy গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ে বলেন– From a scienctific viewpoint "the source of all value is human consciousness but it by so resons follows that the locus of all value is conciousness" (পৃ.১৩৩, ১৯৮৯) এর মূল অর্থ হলো পৃথিবীতে মানুষই সব মূল্যের স্রষ্টা । এর অর্থ এই নয় যে, আমরাই মূল্যের একমাত্র বস্তু।

ধারণা হিসেবে মূল্য স্পষ্টভাবেই মানবকেন্দ্রিক কেননা এটি মানুষের সৃষ্টি, মানুষের ভাষাতত্ত্বের মাধ্যমে, বাস্তবায়নের মাধ্যমে এর ব্যবহার হয়। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, সমস্ত মূল্যের কেবল

নির্ধারণ মানবকেন্দ্রিক হবে। অন্যান্য প্রজাতিরও মূল্য আছে। মূল্য বিষয়গত এবং সংবেদনশীল। তবে এর অর্থ এই নয় যে, নির্দিষ্ট কিছু সময় মূল্যায়নকারীর দ্বারা মূল্যবান হবে। নরটন দাবি করেন যে, তিনি অ-মানব সত্তার স্বতঃমূল্যের বিরুদ্ধে নয়। কিন্তু তিনি কেবল অ-মানব সত্তার সুরক্ষার জন্য এ ধরণের মূল্য দেওয়ার বিরোধিতা করেন।[৩৫]

বস্তুতঃ জীব, প্রজাতি এবং সজীব সম্প্রদায়ের স্বতঃমূল্যকে দুর্বল মানবকেন্দ্রিকতাবাদীরা তখনই গ্রহণ করে যখন দেখে যে, এ ধরণের মূল্য প্রদানের মাধ্যমে বাস্তুতন্ত্র ভাল থাকে তথা মানুষ ভাল থাকে। বাস্তুসংস্থানের ক্ষতি বা অবনতি হল 'Loss of richness from the human experience'। তাই বাস্তুসংস্থানকে অবনতি থেকে মুক্ত করতে হবে কেননা তা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য মূল্যবান। এ ধরনের দুর্বল মানবকেন্দ্রিকতাবাদ অ-মানব সত্তার স্বতঃমূল্যের উপর নির্ভর করে না। তাই হারগ্রভ মনে করেন যে, মানবকেন্দ্রিক স্বতঃমূল্য ক্যালিকটের অ-মানবকেন্দ্রিক স্বতঃমূল্যের চেয়ে বেশি যথোপযুক্ত। কারণ 'স্বতঃমূল্য' শব্দটি স্পষ্টভাবে বুঝায় যে কোন কিছু নিজের জন্য। আর তাই এটি মূল্যায়নকারীর মূল্যায়ন থেকে মূল্যবান বস্তুর মূল্যকে পৃথক করে। মূল্য বস্তুর সাথেই স্বতঃমূল্যভাবেই সংযুক্ত থাকে, মূল্যায়নকারীর মূল্যয়নের উপর তা নির্ভরশীল নয়।

তথ্যনির্দেশ

১. Richard Routhley and Val Routhley, Human Chauvinism and Environmental Ethics,D. S.Mannision et al. (ed), *Environmental philosophy*, Department of philosophy, Australian National University,1980, p.109.

২. মুহম্মদ আবদুল বারী, *দর্শনের কথা*, হাসান বুক হাউস, ঢাকা,২০০৬,পৃ. ১৮৪

৩. Joseph R. Des Jardins, *Environmental Ethics*, 3rd edition, Wordsworth publishing Company, London, 2001, p.128

৪. Keekok Lee, "The Source and Locus of Intrinsic Value: A Reexamination", in *Environmental Ethics*, Vol.18, No.3 (Fall) 1996,p.300

৫. J.Baird Callicott, "Non-Anthropocentric Value Theory and Environmental Ethics", *American Philosophical Quarterly*, 21, 1984, p. 299.

৬. Holmes Rolston, "Naturalizing Values: Organisms and Species", in L.P.Pojman (ed) *Environmental Ethics: Readings in Theory and Application*, Third edition, wadsworth, USA, UK, pp.79-80.

৭. John O'Neil, "The Varieties of Intrinsic Value," in *The Monist*, Vol.75, No.2, April,1992, p.121

৮. G.E. Moore, "The conception of Intrinsic Value," *Philosophical Studies*, Routledge, London, 1922, p.260

৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬০-১৬২

১০. Paul W. Taylor, *Principles of Ethics: An Introduction*, Wordsworth Publishing Company, USA, 1975, p.117

১১. A. Naess, A Defense of the Deep Ecology Movement, *Environmental Ethics*, 6,1984,p.206

১২. A Matin, *An Outline of Philosophy*, Adhuna Prakashan, 2006, p.27

১৩. Arne Naess, "A Defense of Deep Ecology Movement," *Environmental Ethics*, op.cit, p. 266.

১৪. I.Kant, *Fundamental Principles of the Metaphysics of Morals*, Tr. By T.K. Abbot. Longmans, London, 10th edition, p.56

১৫. Eugene C. Hargrove, "Weak Anthropocentric Intrinsic Value, *The Monist*, Vol, 75, No.2, April, 1992, op.cit. p.183

১৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৩-১৮৪

১৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৬

১৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৭

১৯. Eugene C. Hargrove, "Weak Anthropocentric intrinsic Value, op. cit, p.187

২০. Paul W. Taylor, "Are Humans Superior to Animals and Plants?" *Environmental Ethics*, 6, Monist, Vo.15,No.2, April, 1992, P. 189

২১. Eugene C. Hargrove, "Weak Anthropocentric Intrinsic Value", op.cit, p.189.

২২. J.Baird Callicott, "Non-Anthropocentric Value Theory and Environmental Ethics", *American Philosophical Quarterly*, 21, 1984, p. 299.

২৩. David Hume,*A treatise of Human Nature*, Vol 11.M/S. BK. III. Dent & Sons Ltd, London, 1952, pp.166-167

২৪. Reason is and ought only to be, the slave of the passions, and can never pretend to any other office than to serve and obey them. `Lyb D.Hume, A treatise of Human Nature, BK. III, The clrendon Press, Oxford, 1896, p.459

২৫. D.Hume, *A Treatise of Human Nature*, Kansas: Digireads.com Publishing, 2010,p.318

২৬. Lo, Y.S. 'Making and finding value in nature: From a Humean point of view',*Inquiry*, 49 (2), 2006, pp.27-130

২৭. C.Darwin, *The Descent of Man and Selection in Relation to Sex*, London: Penguin Classics, 2004.

২৮. B.Norton, 'The constancy of Leopold's land ethic', in *Searching for Sustainability*, 2003,14-15 Cambridge: Cambridge University Press. Reprinted from Norton, B.G. (1988) 'The constancy of Leopold's land ethic', *Conservation Biology*, 2, pp. 93-102.

২৯. অর্থনীতিবিদরা প্রজাতি রক্ষার জন্য options value এর কথা বলেন। নরটন (১৯৮৭) ও এ পরিভাষাটি ব্যবহার করেন।

৩০. A. Leopold, 'A biotic view of land', in Flader, S.L., and Callicott, J.B. (eds.) (1991)*The River of the Mother of God and Other Essays by Aldo Leopold,* Wisconsin: The University of Wisconsin Press, 1939 , p.271

৩১. পূর্বোক্ত, p.255

৩২. A.Leopold, 'Planning for wildlife', in Callicott, J. B. and Freyfogle, E. T. (eds.) *Forthe Health of the Land*, Washington: Island Press., 1941, p.194

৩৩. A. Leopold, 'Wherefore wildlife ecology?', in S. L. Flader, and J. B. Callicott, (eds.)*The River of the Mother of God and Other Essays by Aldo Leopold,* Madison, Wisconsin: TheUniversity of Wisconsin Press,1947,p.336.

৩৪. A. Leopold, 'Some fundamentals of conservation in the Southwest', in S.L. Flader, ,and J.B. Callicott, (eds.) (1991) *The River of the Mother of God and Other Essays by Aldo Leopold*, Wisconsin: The University of Wisconsin Press, 1923,p.97.

৩৫. B.Norton, 'Biological resources and endangered species: History, values, andpolicy', in *Searching for Sustainability*, Cambridge: Cambridge University Press. Reprinted from L.Guruswamy, , and J. McNeely, (1997) *Protecting Global Biodiversity:*

TheConverging Perspectives of Science, Politics, Economics, Philosophy, and Law, Durham, NC: Duke University Press, 2003, p.469

চতুর্থ অধ্যায়

মানবকেন্দ্রিকতাবাদের উপর বিভিন্ন ধর্মের প্রভাব

প্রাচীনকাল থেকেই মানুষকে বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশের মুখোমুখি হয়ে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করতে হতো। এ প্রতিকূল অবস্থা থেকে মুক্তি লাভের জন্য সে প্রতিনিয়ত পরিত্রাণকর্তার সাহায্য প্রার্থনা করত। মূলতঃ মানুষ বিপদ থেকে মুক্তি লাভের আশায় ও নিজের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য সব সময় কোন বৃহত্তর শক্তির সহায়তা কামনা করেছে। এ অবলম্বনের চেষ্টাই হল ধর্মবোধ। তাই লক্ষ্য করা যায় যে, প্রথম থেকেই মানুষের ধর্ম সম্পর্কিত চিন্তা অনেকাংশেই তার ব্যবহারিক প্রয়োজনের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আসছে। গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, তখন মানুষের মধ্যে দুটি আকাঙ্ক্ষা প্রবল ছিল: প্রথমটি হলো প্রতিকূল শক্তি থেকে আত্মরক্ষার জন্য শক্তিমান কোন সত্তার নিকট আশ্রয় কামনা আর দ্বিতীয়টি হলো আত্মপ্রসার অর্থাৎ আমি ভালো থাকবো, আমার সম্পদ বাড়বে, স্বাচ্ছন্দ্য ও ঐহিক সুখ বাড়বে এ ধরনের ইচ্ছা পূরণের জন্য সর্বশক্তিমানের কাছে প্রার্থনা করত। এ দুটি প্রয়োজনবোধ থেকেই মানুষ ঈশ্বরকে আবিষ্কার করার তাগিদ অনুভব করে।

তাই বলা যায় মানুষের জীবনধারায় সবচেয়ে প্রাচীন ও অনিবার্য বিষয় হলো ধর্ম। অধিকতর স্পষ্ট করে বলা যায় মানবজাতির ইতিহাস তাই ধর্মেরই ইতিহাস। সব যুগে, সংস্কৃতি ও সভ্যতা বিকাশের সব স্তরে, পৃথিবীর মানবগোষ্ঠীর মধ্যে ধর্ম স্বমহিমায় বিদ্যমান ছিল। ধর্মকে মানুষের জীবন থেকে কখনই আলাদা করা যায়নি। তাই একে মানব জীবনের অনিবার্য ও অবিভাজ্য বৈশিষ্ট্যও বলা যায়। ধর্মের সাথে মানুষের জীবনের এ সংযোগ, সম্পৃক্তি কোনো অর্থহীন বিষয় নয়। মূলতঃ জীবনের সঙ্গে ধর্মের এ অবিভাজ্যতা, আবশ্যক নির্ভরতাই মানুষের জীবনে ধর্মের সীমাহীন গুরুত্ব ও অপ্রতিরোধ্য প্রয়োজনীয়তাকে প্রমাণ করে। মানুষের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকার কারণে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে বহুমাত্রিক বিশ্বাস ও বিচিত্র উপাদান যুক্ত হয়েছে। সমাজতত্ত্ববিদ ও নৃবিজ্ঞানীগণ ধর্মকে তাই পার্থিব জীবনের একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। আমেরিকান দার্শনিক সি.জে.ডুকাস (C.J.Ducasse) এর মতে, "মনে হয় কোনো না কোনো এক ধরণের ধর্ম মানব জীবনের সার্বিক বৈশিষ্ট্য।" (Religion of one kind or another seems to be a nearly universal feature of the life mankind).[১]

স্থান কাল নির্বিশেষে পৃথিবীর প্রায়ই সকল মানুষ কোনো না কোনো ধর্মের অনুশীলন করে আসছে। আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত প্রায় চার হাজার বিভিন্ন ধর্মের প্রতিটির মূল বিষয় ছিল অলৌকিক বা

অস্বাভাবিক বিশ্বাস বা অতিপ্রাকৃত শক্তি ও কল্পনার অস্তিত্বে বিশ্বাস । আমরা দেখি প্রাচীনকাল থেকেই ধর্ম মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি নির্মাণ ও আচরণ নিয়ন্ত্রণের অন্যতম উপাদান। ধর্ম আবার নৈতিকতারও একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। পৃথিবীর প্রতিটি প্রধান ধর্ম মানুষ ও পরিবেশের সম্পর্ক নিয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মত প্রকাশ করেছে। পরিবেশে মানুষের স্থান কী, মানুষ ও পরিবেশের সাথে সম্পর্ক কিরূপ হবে – এ সব বিষয়ে প্রতিটি প্রধান ধর্মই সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা দিয়েছে এবং এর দ্বারা মানুষ প্রভাবিত হয়েছে।

পৃথিবীর প্রধান ধর্মগুলোর মধ্যে অন্যতম হল ইসলাম ধর্ম, ইহুদি ধর্ম, খ্রিষ্টান ধর্ম, হিন্দু ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম ও জৈন ধর্ম। এ সকল ধর্মে পরিবেশের মধ্যে মানুষের অবস্থান, পরিবেশ ও মানুষের সম্পর্ক কেমন হবে তার দিকনির্দেশনা দেয়া আছে। সকল ধর্মে সাধারণভাবে এ বিশ্বাস পোষণ করা হয় যে, মানবজাতির উন্মেষের নেপথ্যে ধর্মীয় উদ্দেশ্য কার্যকর ছিল। আলোচ্য অধ্যায়ে আমরা তাই বিভিন্ন ধর্মে মানুষের স্থান বা মর্যাদা কী এবং মানুষ ও পরিবেশের মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে ধর্মীয় দিকনির্দেশনাগুলো কি এবং এ দিকনির্দেশনা দ্বারা মানুষ প্রভাবিত হচ্ছে কিনা তা আলোচনা করার চেষ্টা করবো । এছাড়া দেখা যায় যে, আলোচনায় বিভিন্ন ধর্মের অনেক পার্শ্বিক বিষয় এসে পড়েছে যা পরিবেশ সংক্রান্ত আলোচনার সঙ্গে সম্পৃক্ত। যেমন, ধর্মের মোড়কে লোককৃষ্টিতে পরিবেশ ও তার সংরক্ষণে যেসব রীতি বা অনুশাসন বা প্রথা এসেছে এবং জাতক, হিতোপদেশ, জীববৈচিত্র্য, বাস্তুসংস্থান ইত্যাদি সাদৃশ্যনীয় বিষয়গুলোকে উপস্থাপন করে আমরা বর্তমান পরিবেশ নীতিবিদ্যার অন্যতম মতবাদ মানবকেন্দ্রিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির উপর ধর্মীয় প্রভাব সম্পর্কে জানতে পারবো। এতে আমরা জানতে পারবো যে, ধর্মীয় শিক্ষায় মানবকেন্দ্রিকতাবাদের যে উন্মেষ ঘটেছে তা পরবর্তীতে প্রাকৃতিক পরিবেশ ধ্বংসে সহায়তা করেছে।

এখানে ইসলাম ধর্ম, ইহুদি ধর্ম, খ্রিষ্টান ধর্ম, হিন্দু ধর্ম বৌদ্ধ ধর্ম ও জৈন ধর্মভিত্তিক মানবকেন্দ্রিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ধারাবাহিক আলোচনা করা হলো:

৪.১ ইসলাম ধর্ম

ইসলামকে মানবজীবনের শাশ্বত জীবনবিধানও বলা হয়। ধর্মীয় দৃষ্টিতে ইসলামের সারকথা হচ্ছে মহান আল্লাহর ইচ্ছার কাছে সমর্পিত হওয়া এবং আল্লাহর বিধানের প্রতি অনুগত থাকা। আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিকূলের মাঝে কেবল মানবজাতিকে আশরাফুল মাখলুকাত অর্থাৎ সৃষ্টির সেরা জীব হিসাবে মর্যাদা প্রদান করেছেন। কিন্তু জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পরিবেশ মানবজীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। মানুষ তার জীবনের ক্রমোন্নয়নের ধারায় জ্ঞান-বুদ্ধি, পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার আলোকে যা অর্জন

করেছে তা দ্বারা নিজের সত্তা ও ব্যক্তিত্বের সাথে এই প্রাকৃতিক পরিবেশের সুসমন্বয় সাধন করেছে। তাই মানুষের জীবনের সাথে পরিবেশ ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

পরিবেশের সাথে মানুষের সম্পর্ক নিয়ে ইসলাম ধর্মের আলোকে নিম্নে আলোচনা করা হলো:

ইসলামপূর্ব যুগে মানবসত্তার কোনো অধিকার ছিল না। আরব উপদ্বীপ, রোম, পারস্য এবং বিশ্বের সর্বত্র অবলীলায় মানুষ হত্যার শিকার হতো, কাউকে বা জ্বালিয়ে দেয়া হতো, আবার কখনো কখনো বহু প্রাণীর জীবন নাশ হতো। ইসলামের আগমনের ফলে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে মানুষের সম্মানবোধ স্থির হয়। ইসলাম ন্যায়সঙ্গত কারণ ব্যতীত প্রাণ হরণ নিষিদ্ধ করে। স্পষ্ট ভাষায় আল কুরআন ঘোষণা দেয়: "এ কারণে আমি বনী-ইসরাঈলের প্রতি লিখে দিয়েছি যে, যে কেউ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ অথবা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করার কারণ ব্যতীত কাউকে হত্যা করে সে যেন সব মানুষকে হত্যা করল এবং যে কারো জীবন রক্ষা করলো, সে যেন সবার জীবন রক্ষা করল।"[২]

ইসলামের নীতি অনুযায়ী, মহান আল্লাহর সৃষ্টি করা প্রাণী হিসেবে, জন্মের সময়ে সকল মানব-সত্তাই সম-মানসম্পন্ন।[৩] একজন মুসলিম বিশ্বাস করেন যে, সকল মানবসত্তাই আদি পিতা আদম (আঃ) ও আদি মাতা হাওয়া (আঃ) এর উত্তরসূরী হিসেবে তারা সবাই একই সমতার সম-অংশীদার। মানব মর্যাদার ক্ষেত্রে ইসলাম তার কিতাব ও রাসূলের মাধ্যমে সকল মানুষের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছেন। আল কুরআন- এ আল্লাহ চারবার শপথ সহকারে বলেছেন, "কসম ত্বীন ও যাইতুনের এবং কসম সিনাই পাহাড় ও নিরাপদ (মক্কা) নগরীর, নিশ্চয়ই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সেরা দৈহিক আকৃতিতে।"[৪]

আলোচ্য আয়াতে লক্ষ্যণীয়ভাবে বলা হয়েছে যে, মানুষকে যুক্তিবোধ, আদেশ পালনের সক্ষমতা, ভাল-মন্দ বুঝতে পারার জন্য বিচার-বিবেচনাশক্তি সহকারে ঋঁজু অবয়বে সজ্জিত করা হয়েছে যেন সে তার হাত দিয়েই তার খাদ্য আহরণ করতে পারে। আল্লাহ মানুষের কাছে অর্পণ করেছেন জ্ঞান, শক্তি, বুদ্ধিমত্তা, যুক্তিবোধ, বাক-শ্রবণ-দর্শন ইন্দ্রিয়, স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি, প্রজ্ঞা এবং পরিকল্পনা করার সক্ষমতা– এসকল বৈশিষ্ট্যই মূলত সৃষ্টিকর্তা আল্লাহরই বৈশিষ্ট্য। তিনি তাঁরই আদলে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। রাসুলুল্লাহ হযরত মুহাম্মদ (স) বলেছেন, আল্লাহতায়ালা নিজেরই আদলে আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করেছেন।[৫] কুরআনে বলা হয়েছে- "তিনিই আল্লাহ যিনি তোমাদের জন্য এ পৃথিবীকে আবাসস্থল হিসেবে তৈরী করেছেন এবং আকাশকে করেছেন ছাদ এবং তোমাদেরকে সৃষ্টি করে

তোমাদের অবয়বকে খুঁতমুক্ত করেছেন ও তোমাদেরকে দান করেছেন উৎকৃষ্ট রিযিক। তিনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রভু ; জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ কত মহান!"[৬]

আলোচ্য আয়াতটিতে মানুষের দৈহিক অবয়ব এবং অন্তর্নিহিত নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সামর্থ্য উভয় দিকের কথা বলা হয়েছে।[৭]

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ আরো বলেন-"তিনি (আল্লাহ্) জমিনের সবকিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি মহাকাশের দিকে মনোযোগ দিলেন এবং মহাকাশকে সাত স্তরে সুবিন্যস্ত করলেন। বস্তুত তিনিই সকল বিষয়ে অবগত আছেন।"[৮]

মানুষকে সৃষ্টির সময়েই আল্লাহ তায়ালা জ্ঞান ও ধীশক্তি প্রদান করেছেন যা দিয়ে মানুষ অনেক ক্ষেত্রে ইচ্ছামত প্রকৃতিকে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছে। এই গ্রহের সকল কিছুর সৃষ্টি হয়েছিল মানবজাতির কল্যাণার্থে। বনের কোনো ক্ষুদ্র জীব হতে শুরু করে সাগরের অতিকায় জীব, ক্ষুদ্র লতা-গুল্ম হতে শুরু করে বিশাল সাগর পর্যন্ত সমস্ত কিছুই মানুষের উপকারের জন্য। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন, "তোমরা কি দেখনা, মহাকাশ ও পৃথিবীর সবকিছুই আল্লাহ তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন এবং তোমাদের প্রতি সম্পূর্ণ করেছেন তাঁর দৃশ্যমান এবং অদৃশ্যমান নিয়ামত সমূহকে?"[৯]

মহান আল্লাহর সৃষ্ট জগৎ সংসার সৃষ্টিতে মানুষের কোনো সক্রিয় ভূমিকা না থাকলেও, আল্লাহ তাঁর অফুরন্ত উদারতায় মানুষকে আরো অনেক কিছুর সাথে প্রকৃতির শক্তিকে অনেকাংশে জয় করার যোগ্যতা যেমন- চিন্তাশীলতার ক্ষমতা, ধীশক্তি ও অন্তঃদৃষ্টি ইত্যাদি প্রদান করেছেন যা দিয়ে মানুষ উচ্চ পর্যায়ের অনেক রহস্য উৎঘাটন করতে পারে। মহান আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর প্রতিভূ হওয়া মানুষের জন্য অতীব মর্যাদাকর। এজন্যই মানুষকে ভাবা হয় সৃষ্টির সেরা-'আশরাফুল মাখলুকাত'। এ বিষয়টিকে আরও দৃশ্যমান করার জন্য আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে বললেন আদম (আ) এর প্রতি শ্রদ্ধাবনত হতে। তিনি বলেন, "আর যখন আমি ফেশেতাদেরকে বললাম "আদমকে সিজদা কর" তখন ইবলীস ছাড়া সবাই সিজদা করল। সে সিজদা করতে অস্বীকৃতি জানালো এবং অহংকার করল ফলে সে অবিশ্বাসীদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেলো।[১০] আল কুরআন-এর তফসীরকারকদের অন্যতম আল-আলুসির মতে, "মানবকুলের ধর্মপরায়ণ বা পাপী, সকল সদস্যের জন্যই মানবিক মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে।" [১১]

বিংশ শতাব্দীর মুসলিম আইনবিদগণ এবং তফসীরকারকগণ উল্লেখ করেন যে, সৎকর্ম দ্বারা মানবিক মর্যাদা অর্জন করতে হবে বিষয়টি এমন নয় ; বরং এটি (মানবজন্মের সুবাদে) আল্লাহর দেয়া একটি

রহমতের বহিঃপ্রকাশ হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত; একইসাথে এটিও প্রতিষ্ঠিত যে, মানবিক মর্যাদা হচ্ছে মানবজন্মের মুহূর্ত থেকে প্রত্যেক ব্যক্তি মানুষের জন্মসূত্রে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক ও অলংঘনীয় সহজাত অধিকার। এ অধিকার আল্লাহ প্রদত্ত এবং প্রাকৃতিক অধিকার ; সেহেতু কোনো ব্যক্তি কিংবা রাষ্ট্র কারো থেকে এ অধিকার কেড়ে নিতে পারে না। এ মানবিক মর্যাদা থেকেই সমস্ত মানাবাধিকার উৎসারিত হয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয়ই আমি আদম সন্তানদেরকে সম্মানিত করেছি এবং তাদেরকে পরিচালিত করেছি ভূপৃষ্ঠের ও সমুদ্রের উপর দিয়ে এবং তাদেরকে উত্তম জিনিস থেকে জীবিকা দিয়েছি এবং আমাদের সৃষ্টিসমূহের মধ্যে অনেক কিছুর ওপরে তাদেরকে অগ্রগণ্যতা প্রদান করেছি।"[১২]

মূলত সৃষ্টির প্রথম মুহূর্ত থেকেই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ফেরেশতাদের মাধ্যমে মানুষকে মর্যাদা দেয়ায় মানুষের সম্মান সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছে। আল-কুরআনে আল্লাহকর্তৃক মানুষকে মর্যাদা দান এবং সম্মান প্রদর্শনের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন,"আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সুন্দরতর অবয়বে।"[১৩] তিনি আরো বলেন, "নিশ্চয় আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, আমি তাদেরকে স্থলে ও জলে চলাচলের বাহন দান করেছি ; তাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ প্রদান করেছি এবং তাদেরকে অনেক সৃষ্ট বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।"[১৪]

উল্লিখিত আয়াতসহ অপরাপর আয়াতগুলো পর্যালোচনা করলে বুঝা যায় যে, মহান আল্লাহ তাঁর সকল সৃষ্টির মধ্যে মানুষকে উচ্চ আসনে স্থান দিয়েছে। আল-কুরআন মানবিক ও শ্রেষ্ঠত্বকে ধর্ম বা শরীয়তের বিবেচনায় শুধু মুসলিমদের সাথে সংযুক্তি করেনি বরং তা আদম (আঃ) ও তাঁর সকল সন্তানদের সাথে সম্পৃক্ত করেছে। এভাবে ইসলাম মানুষকে সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে উল্লেখ করে মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির দৃষ্টান্ত দেয়। লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, মানুষ নিজেদেরকে উচ্চতর বিবেচনা করার কারনে অ-মানব প্রাকৃতিক সত্তাসমূহকে নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে অনুপ্রানিত হয়েছে।কিন্তু এটা সত্যি যে মানুষ পরিবেশের এক বিশিষ্ট সত্তা। খাদ্য, বায়ু, আলো, পানি সবই পরিবেশ থেকে সংগ্রহ করতে হয়। অন্যান্য জীবিত বস্তুর মতো মানুষও পরিবেশের একজন সংগঠক। আল্লাহ তায়ালা তাঁর সৃষ্টির মধ্যে কেবল মানবজাতিকে ভূ-পৃষ্ঠের প্রতিনিধিত্ব প্রদান করে শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা প্রদান করেছেন। তাই পরিবেশের সাথে মানুষের সম্পর্ক গভীর। মানুষ পরিবেশকে যত্রতত্র ব্যবহার করবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, "তিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে ঠিকানা

দিয়েছেন, তোমরা নরম মাটিতে অট্টালিকা নির্মাণ কর এবং পর্বতগাত্র খনন করে প্রকোষ্ঠ নির্মাণ কর। অতএব আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করো না।" [১৫]

আল্লাহ অপূর্ব সৃষ্টি কৌশল দিয়ে পৃথিবীর বুকে মানুষের জন্য ভূ-পৃষ্ঠকে মানুষের আওতাধীন করে দিয়েছেন যাতে করে মানুষ ভূ-পৃষ্টকে আবাদ করতে পারে এবং সুস্থ ও সুন্দরভাবে বাঁচতে পারে। আল্লাহ বলেন, "তোমরা কি দেখ না আল্লাহ নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে সবই তোমাদের কাজে নিয়োজিত করে দিয়েছেন।"[১৬] তিনি আরো বলেন, "তোমরা কি দেখ না যে, ভূপৃষ্ঠের যা আছে এবং সমুদ্রে চলমান নৌকা তৎসমুদয়কে আল্লাহ নিজ আদেশে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন।"[১৭]

আল্লাহ বলেন, "তিনি সেই সত্তা যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য যা কিছু যমীনে রয়েছে সে সমস্ত।"[১৮]

কোরআনের এ সকল বাণী মূলত মানুষের মানবকেন্দ্রিক মনোভাবকে আরো সুদৃঢ় করে। অ-মানব প্রাণী ও প্রকৃতি মূলত মানুষের জন্যই সৃষ্টিকর্তা তৈরী করেছেন। আল কুরআনে আল্লাহ্ উল্লেখ করেন, "বল হে নবী, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করি মানুষের প্রতিপালক, মানুষের বাদশাহ ও মানষের মাবুদের নিকট। প্রতিপালক হিসাবে তিনি মানুষের জীবনধারণের জন্য যা প্রয়োজন তা সবকিছুর ব্যবস্থাই করে রেখেছেন।"[১৯]

এটা ঠিক যে, ইসলামে অ-মানব প্রাণীকে উপায় হিসাবে ব্যবহারের সুযোগ দেয়া হয়েছে। মানুষ তার প্রয়োজনে আল্লাহ নির্ধারিত পন্থা অবলম্বন করে অ-মানব প্রাণীসমূহকে ব্যবহার করতে পারবে। মূলতঃ মহান আল্লাহ এ সকল অ-মানব প্রাণীকে মানুষের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। রাসুলুল্লাহ বলেন, "আল্লাহ তোমাদের গৃহকে অবস্থানের জায়গা করে দিয়েছেন এবং চতুষ্পদ বস্তুর চামড়া দ্বারা তোমাদের জন্য তাবুর ব্যবস্থা করেছেন। তোমরা এগুলোকে সফরকালে ও অবস্থানকালে পাও। ভেড়ার পশম, উটের কবরি চুল ও ছাগলের লোম দ্বারা কত আসবাবপত্র ও ব্যবহার সামগ্রী তৈরী করেছেন এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত।" [২০] রাসুলুল্লাহ আরো বলেন, "কেয়ামত দিবসে মানুষকে আল্লাহ্ বলবেন আমি কি তোমাকে চক্ষু, কর্ণ, সম্পদ এবং সন্তান দান করিনি? এবং চতুষ্পদ জন্তু এবং শস্যক্ষেত্র আয়ত্তাধীন করে দেইনি? এবং এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ এর দায়িত্ব তোমার উপর ছেড়ে দিয়েছি।"[২১]

সুতরাং এখন পর্যন্ত দেখা যায় যে, ইসলামে যে মানবকেন্দ্রিকতার কথা বলা হয়েছে সেখানে মানুষকে প্রাকৃতিক পরিবেশের যত্রতত্র ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, এই ইসলামই আবার প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতি সদয় হতে বলেছে। কেননা এতে করে মানুষই লাভবান হবে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) বলেন, "ওহে জগতবাসী, জগতের আল্লাহর সৃষ্ট জীবিত প্রাণীর প্রতি সদয় হও ; তখন আল্লাহ তায়ালা তোমাদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করবেন।"[২২]

পাখি জীব পরিবেশ তথা অ-মানব জগতের উল্লেখযোগ্য উপাদান। মানব বিধ্বংসী অনেক জীবাণু যা পরিবেশ দূষণের ফলে সৃষ্ট হয় তাকে দূরীকরণের ক্ষেত্রে এবং পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখতে পাখিও বিরাট ভূমিকা পালন করে। কাজেই পাখি শিকারে মাত্রাজ্ঞানহীনতা পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি বয়ে আনতে পারে। মুহাম্মদ (সঃ) বলেছেন, যে লোক অনর্থক কোন পাখি হত্যা করবে কিয়ামতের দিন তা এই বলে আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করবে যে, হে আল্লাহ! অমুক লোকটি আমাকে অযথা হত্যা করেছিল, কোন ফায়দা লাভের জন্য হত্যা করেনি।[২৩] এ হাদীস থেকে নিঃসন্দেহে বলা যায়, ইসলাম অ-মানব প্রাণীকে মানুষের উপকারে (ফায়দা লাভ) ব্যবহারের অনুমতি দেয়।

আল্লাহ ভূমিকে মানবজাতির জন্যই তৈরি করেছেন যাতে তারা অবাধে এর উপর বিচরণ করতে পারে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য, আমদানি-রপ্তানির মাধ্যমে, কৃষি কাজের মাধ্যমে আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক অন্বেষণ করতে পারে। তবে এ থেকে উপকারিতা লাভের অনুমতি আছে কিন্তু বিপর্যয় সৃষ্টির অনুমতি নেই। কেননা আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকে পছন্দ করেন না।[২৪] এভাবে আল কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইসলাম মাটির বা ভূমির উপর মানব কর্তৃত্বকে প্রাধান্য দেয় এবং সদ্ব্যবহার করার আহবান জানায়।

আল্লাহ বলেন, "আর যিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তোমাদের জন্য ফল ফসল উৎপাদন করেছেন তোমাদের খাদ্য হিসেবে।"[২৫] মানুষের জীবনধারণের জন্য সৃষ্টিকর্তা প্রয়োজনীয় পানি সরবরাহ করেন। মানুষ তাঁর এ নেয়ামতকে এমনভাবে ব্যবহার করবে যাতে করে প্রকৃতির অন্যান্য সত্তাগুলো বঞ্চিত না হয়। এতে করে মানুষের স্বার্থই সুরক্ষিত হবে। নদ-নদী, সমুদ্র প্রত্যেকটি প্রাকৃতিক পরিবেশের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আল্লাহ মানবজাতির কল্যাণে এদেরকে তৈরী করেছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন, "এবং তিনি (ভূ-পৃষ্ঠে) নদী ও পথ তৈরী করেছেন, যাতে তোমরা পথ প্রদর্শিত হও।[২৬] তিনি আরও বলেন, "এবং তিনি জলযানসমূহকে তোমাদের আজ্ঞাবহ করে দিয়েছেন, যাতে তার আদেশে জলযানসমূহ সমুদ্রে চলাফেরা করে এবং নদীকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন।"[২৭]

নদ-নদী সমুদ্র সংক্রান্ত উল্লিখিত আয়াতসমূহে যে মুখ্য বিষয় বিবৃত হয়েছে তা হলো সমুদ্রকে আল্লাহ তায়ালা মানুষের অধীন করে দিয়েছেন। তাই মানুষ নিজেদের সামর্থ্য ও যোগ্যতা অনুসারে সমুদ্রের যাবতীয় সম্পদ আহরণ করে নিজেদের কাজে লাগাবে। পবিত্র কুরআনে সাগর সম্পর্কে তিনটি সুস্পষ্ট কথা বলা হয়েছে। মানুষের জন্য সাগরের অবদান হচ্ছে–

১. টাটকা গোশত সরবরাহ করা;

২. মুক্তা প্রবাল থেকে অলংকার নির্মাণ; ও

৩. সমুদ্র বক্ষে নৌ চলাচলের মাধ্যমে বাণিজ্য সুবিধাদি অর্জন।[২৮]

আল্লাহ আরও বলেন, "এবং তিনি পৃথিবীর উপর বোঝা রেখেছেন যে, কখনো যেন তা তোমাদের নিয়ে হেলেদুলে না পড়ে এবং নদী ও পথ তৈরী করেছেন যাতে তোমরা পথ প্রদর্শিত হও। এবং তিনি পথ নির্ণায়ক বহু চিহ্ন সৃষ্টি করেছেন এবং তারকা দ্বারাও মানুষ পথের নির্দেশ পায়।"[২৯]

এভাবে মহান আল্লাহ পৃথিবীকে সকলের বসবাসের উপযোগী করে তুলেছেন। মানবকল্যাণের উদ্দেশ্যে অ-মানব ও প্রকৃতি সৃষ্টি করেছেন। তাই মানুষের নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সুন্দর বাসযোগ্য পৃথিবী উপহার দেয়ার জন্য আল্লাহর দেওয়া নেয়ামতগুলোর সদ্ব্যবহার ও সংরক্ষণ করতে হবে। ইসলাম মূলত এভাবেই মানবকেন্দ্রিকতাবাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে ধারণ করে। বর্তমানে বায়ুমন্ডলের উষ্ণতা বৃদ্ধি, সবুজ বৃক্ষরাজি ধ্বংস, বিপুল সংখ্যক প্রাণীকূলের উপযোগী পরিবেশ ধ্বংস হওয়ায় পৃথিবী থেকে বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী বিলুপ্ত হতে চলেছে। ইউএনডিপির এক জরিপে দেখা গেছে বিগত পাঁচ দশকে পঞ্চাশ হাজার প্রজাতির পাখি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তিন লক্ষ প্রজাতির প্রাণী পরিবর্তিত পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে জীবন সংগ্রামে লিপ্ত। এদের মধ্যে প্রায় এক হাজার প্রজাতির মেরুদন্ডী প্রাণী (এর মাঝে পাখি প্রজাতি ৭০, স্তন্যপায়ী ৩০০, মাছ ২০০, অবশিষ্ট সরীসৃপ এবং উভচর) আজ গুরুতর বিপদের সম্মুখীন। পৃথিবীতে বাঘের সংখ্যা গত পঞ্চাশ বছরে এক লক্ষ থেকে কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র পাঁচ হাজারে। হাতি, চিতা, কুমীর, তিমি, ডলফিন, চিল, শ্বেত ভল্লুক, ঈগল, বাজ, শকুন ইত্যাদি বহু ধরণের প্রাণী আজ বিলুপ্তির পথে। পৃথিবীতে এ যাবত প্রায় ১.০৩ মিলিয়ন প্রজাতির প্রাণীর সন্ধান পেয়েছেন বলে বিজ্ঞানীরা অনুমান করেছেন এবং ৮০ মিলিয়ন এর বেশি প্রজাতির নাম বিজ্ঞানীরা এখনও সংগ্রহ করতে পারেনি। কিন্তু নাম না জানা এ বিপুল সংখ্যক প্রাণী যারা অতি সুক্ষভাবে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে চলেছে ; অথচ পৃথিবীতে মানুষের কাছে পরিচিত হওয়ার পূর্বেই এ বিশ্বজগৎ থেকে

মানুষের অপরিণামদর্শী কার্যকলাপের অনিবার্য ফলস্বরূপ বিলুপ্ত হতে চলছে । বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখেছেন প্রতিদিন গড়ে ১৪০টি প্রজাতি পরিবেশের মাঝ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে, যাদের পাওয়ার আর কোন সম্ভাবনা নেই।[৩০] ইসলাম তাই পরিবেশকে মানুষের উপযোগী রাখতে অ-মানব প্রাণী সংরক্ষণে জোর দেয়। প্রকৃতিপ্রদত্ত এ জীবজন্তু, পশুসম্পদের যথাযথ সংরক্ষণ করতে আমরা ব্যর্থ হলে এ পৃথিবী বাসযোগ্য রাখতে পারব না। নিজেদের অস্থিত্বের প্রশ্নেই আমাদের চারপাশের পরিবেশকে সংরক্ষণ করতে হবে এবং এর উন্নয়ন বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণে সচেষ্ট হতে হবে।

৪.২ ইহুদি ও খ্রিষ্টান ধর্ম

বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত বিশ্বজনীন এবং বৃহত্তম ধর্মসমূহের মধ্যে খ্রিষ্টধর্ম অন্যতম। বিখ্যাত ধর্মতত্ত্ববিদ হাস্টন স্মিথ বলেছেন, মানুষের সব ধর্মের মধ্যে খ্রিষ্টধর্ম সবচেয়ে সুদূরপ্রসারী এবং এরই সবচেয়ে অধিক সংখ্যক অনুগামী। আজকের দিনে প্রতি তিন জনে একজন খ্রিষ্টান।[৩১] মানবপ্রেম, অহিংসা এবং মানবসেবাকে খ্রিষ্টধর্মে অতি উচ্চ মর্যাদা এবং সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। যীশুখ্রিষ্টের জীবন, চরিত্র ও বাণী খ্রিষ্টধর্মের মূল উৎস। তিনি মানবপ্রেম, নৈতিক আদর্শ ও নিজ বাণী রক্ষায় সানন্দে ও দৃঢ়চিত্তে মৃত্যুবরণ করে অনন্য সাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। মূলতঃ ইহুদি ও খ্রিষ্টান ধর্ম উভয়ই পৃথিবীর প্রধান দুটি ধর্ম। খ্রিষ্টানধর্ম ইহুদি ধর্মের উত্তরাধিকার বহন করে। দুইটি ধর্মের মূল ধর্মগ্রন্থ যথাক্রমে বাইবেলের পুরাতন পুস্তক (Old testament) ও নতুন পুস্তক (New testament) । ম্যাকডোনাল বলেন, ইহুদি ধর্মমতের ওপর ভিত্তি করে খ্রিষ্টের দ্বারা প্রবর্তিত একটি একেশ্বরবাদী ধর্ম হলো খ্রিষ্টধর্ম যে ধর্মে খ্রিষ্টকে ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যস্থ বলে গণ্য করা হয়েছে, যে ধর্মে খ্রিষ্টের আত্মোৎসর্গমূলক মৃত্যুর দ্বারা মানব জাতির প্রায়শ্চিত্ত সাধিত হয়েছে এবং যে ধর্ম তার ধর্মীয় ও নৈতিক পরিসরের মধ্যে সমগ্র মানব জাতিকে অন্তর্ভূক্ত করেছে। এ ধর্ম খ্রিষ্টের জীবন ও বাণীকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।[৩২]

বর্তমান গবেষণাকর্মের অংশ হিসেবে পরিবেশে মানুষের অবস্থান সম্পর্কে ইহুদি ও খ্রিষ্টান উভয় ধর্মেই সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা পাওয়া যায়। উভয় ধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থের অবলম্বনে প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষ ও অমানব সত্তার অবস্থান সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো ঃ

ইহুদি ও খ্রিষ্টধর্ম সৃষ্টিতত্ত্বে বিশ্বাসী। পবিত্র বাইবেলের আদিপুস্তকে ছয় দিনে বিশ্বসৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। সংক্ষেপে বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে নিম্নরূপভাবে বলা যেতে পারে –

১ম দিনে ঈশ্বর আলো সৃষ্টি করলেন,২য় দিনে স্বর্গ সৃষ্টি করলেন,৩য় দিনে পৃথিবী এবং উদ্ভিদ জগত, ৪র্থ দিনে নক্ষত্র এবং গ্রহমন্ডলী, ৫ম দিনে জলচর প্রাণী এবং পক্ষীকূল, ৬ষ্ঠ দিনে গরু বাছুর, ভেড়া, বন্যপ্রাণী ও মানুষ; এবং ৭ম দিনে ঈশ্বর তাঁর কাজ শেষ করলেন এবং বিশ্রাম নিলেন।[৩৩]

লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, এখানে মানুষকে সৃষ্টির শেষ প্রাণী হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। যা অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত ও মানবকেন্দ্রিক। মানুষ যেহেতু সৃষ্টির সেরা জীব তাই মানুষের প্রয়োজনীয় সকল কিছুকে পৃথিবীর মধ্যে সাজিয়ে তারপরে ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করলেন। উপরোক্ত ছয়দিনে ঈশ্বর মানুষের জীবনধারণের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো তৈরী করেছেন। আদম-হাওয়াকে তৈরী করার পর ঈশ্বর মাটি থেকে সকল জীব তৈরী করলেন এবং আদমকে তাদের নাম রাখতে বললেন। আদিকালে নামকরণের অধিকার পাওয়ার অর্থ হল কর্তৃত্ব লাভ করা।[৩৪] এভাবে নামকরণের কর্তৃত্ব লাভের মাধ্যমেই অন্যান্য প্রাণী ও বস্তুর উপর মানুষের কর্তৃত্ব শুরু হয়। ঈশ্বর তাঁর অন্যসকল সৃষ্টির চেয়ে মানুষকে বেশি মর্যাদা দিয়েছেন। কারন তিনি অন্যকোন প্রাণীকে নয়, কেবল মানুষকেই তার প্রতিমূর্তি হিসাবে নির্মাণ করেন এবং তার সৃষ্ট অন্যসব কিছুর উপর কর্তৃত্ব করার অনুমতি দেন। পবিত্র বাইবেলে উল্লেখ আছে, "পরে ঈশ্বর কহিলেন, আমরা আমাদের প্রতিমূর্তিতে, আমাদের সাদৃশ্যে মনুষ্য নির্ম্মাণ করি; আর তাহারা সমুদ্রের মৎস্যদের উপরে, আকাশের পক্ষীদের উপরে, পশুগণের উপরে, সমস্ত পৃথিবীর উপরে ও ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় সরীসৃপের উপরে কর্তৃত্ব করুক। পরে ঈশ্বর আপনার প্রতিমূর্তিতে মনুষ্যকে সৃষ্টি করিলেন; ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতেই তাহাকে সৃষ্টি করিলেন, পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া তাহাদিগকে সৃষ্টি করিলেন।"[৩৫]

তাই বলা যায়, মানুষ হল ঈশ্বরের সকল সৃষ্টির মধ্যে সেরা বা উচ্চস্তরের জীব আর তাই ঈশ্বর মানুষকে প্রকৃতির অ-মানব সত্তার উপর কর্তৃত্ব করার সম্পূর্ণ অধিকার দিয়েছেন। এ সম্পর্কে পবিত্র বাইবেলে বলা হয়েছে, "পরে ঈশ্বর তাহাদিগকে আর্শীবাদ করিলেন; ঈশ্বর কহিলেন, তোমরা প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হও এবং পৃথিবী পরিপূর্ণ ও বশীভূত কর, আর সমুদ্রের মৎস্যগণের উপরে, আকাশের পক্ষিগণের উপরে, এবং ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় জীবজন্তুর উপরে কর্তৃত্ব কর।"[৩৬]

বাইবেলের আদিপুস্তকে উল্লেখিত বাণীগুলোতে ঈশ্বর মানুষকে 'কর্তৃত্ব' করার নির্দেশনা দিয়েছেন। যারা ইহুদি ও খ্রিষ্টান ধর্মকে মেনে চলে তাদের দৈনন্দিন জীবনাচরণকে উক্ত বাণীগুলো গভীরভাবে প্রভাবিত করছে এবং এতে করে তারা মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই প্রকৃতির অন্যান্য সত্তাগুলোর সাথে আচরণ করছে। তাছাড়া ঈশ্বরকর্তৃক প্রদত্ত বাণীকে তারা নৈতিক দায়িত্ব মনে করে এবং ব্যবহারিক জীবনেও তা অনুসরণ করে। "প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হও" বলতে ঈশ্বর অন্যান্য সত্তাকে

মানুষের বশীভূত হতে এবং মানুষের বংশবৃদ্ধি করে মূলত প্রজাতি বিস্তারের প্রতি জোর দিয়েছেন– যা মূলত প্রকৃতিতে মানুষের অবস্থানকে আরও সুদৃঢ় করে তোলে। পবিত্র বাইবেলের নতুন পুস্তকে ঈশ্বর বলেন, "একদিন বিশ্রামবারে যীশু শস্যক্ষেত্র দিয়া যাইতেছিল, এমন সময়ে তাহার শিষ্যেরা শীষ ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া হাতে মাড়িয়া খাইতে লাগিলেন। তাহাতে কত্রকজন ফরীশী কহিল, বিশ্রামবারে যাহা করা বিধেয় নয়, তোমরা কেন তাহা করিতেছ? যীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, দায়ূদ ও তাহার সঙ্গীরা ক্ষুধিত হইলে তিনি কি করিয়াছিলেন, তাহাও কি তোমরা পাঠ কর নাই? তিনি ত ঈশ্বরের গৃহে প্রবেশ করিয়া, যে দর্শন-রুটী কেবল যাজকবর্গ ব্যতিরেকে আর কাহারও ভোজন করা বিধেয় নয়, তাহা লইয়া আপনি ভোজন করিয়াছিলেন, এবং সঙ্গিগণকেও দিয়াছিলেন। পরে তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, মনুষ্যপুত্র বিশ্রামবারের কর্ত্তা।"[৩৭]

এ উক্তিগুলো থেকে এটাই নির্দেশ করে যে মানুষ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জীব এবং মানুষ ব্যতীত অন্যান্য প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের সৃষ্টি কেবলমাত্র মানুষের প্রয়োজনেই। সুতরাং সর্বশ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে অন্যদের উপর কর্তৃত প্রতিষ্ঠা করার অধিকার মানুষের রয়েছে।

বাইবেলের আদিপুস্তকের ৬,৭ ও ৮ অধ্যায়ে মহাপ্লাবন-সংক্রান্ত বর্ণনা বিদ্যমান। সেখানে বলা হয়েছে মানুষের দুর্নীতি ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়লে ঈশ্বর মানুষদের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে মানুষ এবং সেই সাথে অন্যসব জীবন্ত প্রাণীকেও নির্মূল করার সিদ্ধান্ত নেন। এদিকে আগেই তিনি হযরত নূহ (আঃ) কে মহাপ্লাবনের পূর্বাভাস দেন এবং নির্দেশ দেন যে, "কিন্তু তোমার সহিত আমি আপনার নিয়ম স্থির করিব; তুমি আপন পুত্রগণ, স্ত্রী ও পুত্রবধূদিগকে সঙ্গে লইয়া সেই জাহাজে প্রবেশ করিবে। আর মাংসবিশিষ্ট সমস্ত জীব-জন্তুর স্ত্রীপুরুষ যোড়া যোড়া লইয়া তাহাদের প্রাণরক্ষার্থে আপনার সহিত সেই জাহাজে প্রবেশ করাইবে; সর্ব্বজাতীয় পক্ষী ও সর্ব্বজাতীয় পশু ও সর্ব্বজাতীয় ভূচর সরীসৃপ যোড়া যোড়া প্রাণ রক্ষার্থে তোমার নিকটে প্রবেশ করিবে। আর তোমার ও তাহাদের আহারার্থে তুমি সর্ব্বপ্রকার খাদ্য সামগ্রী আনিয়া আপনার নিকট সঞ্চয় করিবে। তাহাতে নোহ সেইরূপ করিলেন, ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারেই সকল কর্ম্ম করিলেন।"[৩৮]

উপরোক্ত বাণীগুলোতে সুস্পষ্টভাবে মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পায় এবং পাশাপাশি দেখা যায় তিনি প্রাণী সংরক্ষণের বিষয়েও জোর দিয়েছেন। বিশেষভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, নূহ-এর নৌকায় মানুষের অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে এবং প্রকৃতির সকল জীবের অস্তিত্বের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করার জন্য জোড়ায় জোড়ায় নেওয়া হয়েছে। প্লাবনের পরে নূহ ও তাঁর পুত্রগণকে ঈশ্বর নির্দেশ দেন যে, "তোমরা প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হও, পৃথিবী পরিপূর্ণ কর। পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণী ও আকাশের যাবতীয় পক্ষী তোমাদের হইতে ভীত ও ত্রাসযুক্ত হইবে; সমস্ত ভূচর জীব ও সমুদ্রের সমস্ত মৎস্যশুদ্ধ

সে সকল তোমাদেরই হস্তে সমর্পিত। প্রত্যেক গমনশীল প্রাণী তোমাদের খাদ্য হইবে; আমি হরিৎ ওষধির ন্যায় সে সকল তোমাদিগকে দিলাম।"[৩৯] এ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে ঈশ্বর মানবজাতিকে প্রজাতি বিস্তার করে পৃথিবীকে পরিপূর্ণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এমনকি পৃথিবীর অন্যান্য অ-মানব প্রাণীকে মানুষের বশীভূত করেছেন এবং তাদেরকে মানুষের খাদ্যহিসেবে ভক্ষণের অনুমতি দিয়েছেন। কেবল জীবজগৎ নয় উদ্ভিদজগৎও মানুষের খাদ্যরূপে ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছেন স্বয়ং ঈশ্বর। বাইবেলে বলা আছে, "ঈশ্বর আরও কহিলেন, দেখ, আমি সমস্ত ভূতলে স্থিত যাবতীয় বীজোৎপাদক ওষধি ও যাবতীয় সজীব ফলদায়ী বৃক্ষ তোমাদিগকে দিলাম, তাহা তোমাদের খাদ্য হইবে।"[৪০]

তবে উল্লেখ্য যে, আদমের পতনের আগে ও পরে ঈশ্বরের নির্দেশের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। পতনের পূর্বে আদম ও পশু সবার জন্য শাক-সবজি, নিরামিষ আহারকে নির্ধারণ করা হয়েছে। উপরোক্ত নির্দেশটি আদমের পতনের পুর্বে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, আদমের পতনের পরে উদ্ভিদের পাশাপাশি ঈশ্বর পৃথিবীর সকল জীব ভক্ষণের নির্দেশ দিয়েছেন। যেহেতু আদমের প্রতি ঈশ্বরের নির্দেশ ছিল অ-মানব প্রাণী ও উদ্ভিদের উপর কর্তৃত্ব করার তিনি তাই করলেন। কেননা তাঁর জন্য এর বিকল্প কিছুই ছিল না, তা ছিল মহান ঈশ্বরেরই নির্দেশ। মূলত আদি পিতা আদম (আ) এর উপর অর্পিত সে নির্দেশ আদমের বংশানুক্রমে বর্তমান মানবজাতি অ-মানব প্রাণী ও উদ্ভিদের উপর কর্তৃত্ব করে যাচ্ছে।

উপরে উল্লেখিত মানুষের মর্যাদা বা অবস্থান এবং অ-মানব প্রাণী ও উদ্ভিদের প্রতি মানুষের যে কর্তৃত্বমূলক আচরণের দিকনির্দেশনা ইহুদি ও খ্রিষ্টানধর্মের মূল ধর্মীয় গ্রন্থ বাইবেলে উল্লেখ করা হয়েছে (যা মূলত ঈশ্বরের বাণী) তা স্পষ্টতই প্রভুত্ববাদী ও মানবকেন্দ্রিক। বর্তমানে পশ্চিমা বিশ্ব যে পরিবেশগত বিপর্যয়ের মুখোমুখী এর সাথে গণতন্ত্র, প্রযুক্তি, উন্নত জীবনধারা, ব্যক্তি সম্পদের বৃদ্ধি এবং পরিবেশের সাথে শত্রুভাবাপন্ন অবস্থানের একটা প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে। আর এসব শক্তির উপর ইহুদি ও খৃষ্টান সংস্কৃতির ব্যাপক প্রভাব রয়েছে।[৪১] ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক লিন হোয়াইট (Lynn White, ১৯০৭-১৯৮৭) ১৯৬০ এর দশকে ইহুদি ও খ্রিষ্টধর্ম অনুযায়ী পরিবেশের সাথে মানুষের সম্পর্ক যে মানবকেন্দ্রিক তা প্রথমবারের মতো উল্লেখ করেন। পাশাপাশি তিনি খ্রিষ্টধর্মকে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি মানবকেন্দ্রিক ধর্ম বলে আখ্যায়িত করেন।[৪২] তিনি আরও বলেন, ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের রয়েছে এ পৃথিবীর সবকিছুকে নিরঙ্কুশভাবে উপভোগ করার প্রবণতা ও বৈধতা। বিশ্বের সকল জীব ও জড় পদার্থের উপর তাদের যে প্রাধান্য, তা তাদেরকে

এটাই শিখিয়েছে যে, পৃথিবী তাদের ক্ষমতার নিকট নতজানু হবে।[৪৩] বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জন্ম, বেড়ে উঠা, ইহুদী-খ্রিষ্টানদের সংস্কৃতি- সভ্যতার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয় বিধায় পরিবেশগত সমস্যার সমাধান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পক্ষে দেয়া সম্ভব নয়। অপরদিকে বস্তুবাদী অর্থনৈতিক দর্শন উন্নয়নের পথকে সুগম করলেও মানবকল্যাণের পরিবর্তে অনেক অকল্যাণেরই জন্ম দিয়েছে। ফরাসী বিপ্লবোত্তর ইউরোপ শিল্পভিত্তিক শহর গড়ে তোলায় পরিবেশগত বিপর্যয়কে আলিঙ্গন করে নিয়েছে। কারণ প্রাকৃতিক উপাদানের অপরিণামদর্শী ব্যবহারই পরিবেশকে বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিয়েছে। লিন হোয়াইট তাই জোর দিয়ে বলেছেন প্রয়োজন নতুন এক জীবন ব্যবস্থার যা আমাদেরকে সমস্যার আবর্ত থেকে উদ্ধার করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।[৪৪]

প্রাচীন পৌত্তলিকতাবাদ ও এশীয় ধর্মগুলোর মধ্যে সর্বপ্রাণবাদী উপাদান বিদ্যমান ছিল। পৌত্তলিকতাবাদের অনুসারীরা মনে করত যে, প্রকৃতির সবকিছুর মাঝে ঈশ্বর রয়েছেন। এ কারণে তারা প্রকৃতির প্রাণময় আত্মাগুলোকে অতিপ্রাকৃত ও ঐশ্বরিক শক্তির আধার ভেবে নিয়ে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও পূজা করত। তাদের এ বিশ্বাসের সাথে যুক্ত ছিল রহস্যবোধ, গভীর আবেগ অনুভূতি আর ভক্তিমিশ্রিত ভয় ও শ্রদ্ধা। ইহুদী ও খ্রিষ্টানধর্মের সাথে এর তুলনা করলে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করা যায়। খ্রিষ্টানধর্মে মানুষ ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ পৃথক। এখানে স্বয়ং ঈশ্বর মানুষকে অ-মানব প্রাণী ও উদ্ভিদরাজির উপর কর্তৃত্ব করার নির্দেশ দেন। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, উক্ত ধর্মগুলোয় কর্তৃতের কথা বলা হলেও পাশাপাশি মানুষকে প্রকৃতির সেবক হিসেবেও দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। বাইবেল এর পুরাতন পুস্তক ও নতুন পুস্তকে উল্লেখিত বক্তব্য থেকে পরিবেশের প্রতি মানুষের আচরণ সম্পর্কে দুটি দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয়।[৪৫] যেমন–

১. প্রভুত্ববাদী (Despotic); এবং

২. তত্ত্বাবধানবাদী (Stewardship) ।

প্রভুত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা যায়, প্রাকৃতিক পরিবেশ কেবল মানুষের ব্যবহারের জন্যই সৃষ্টি হয়েছে। ঈশ্বর যখন মানুষকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'প্রভুত্ব কর' কিংবা 'কর্তৃত্ব কর', 'প্রজাবন্ত হও' তার মানে হলো মানুষ পরিবেশের প্রভু। পরিবেশ মানুষের নিকট উপায় বা যন্ত্রস্বরূপ। মানুষ ইচ্ছামাফিক পরিবেশ তথা প্রাকৃতিক উপাদানকে তার নিজ প্রয়োজনে ব্যবহার করার একচ্ছত্র অধিকার রাখে। সুতরাং প্রভুত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে মানুষের নিকট পরিবেশ হল যন্ত্রতুল্য মূল্যে মূল্যবান অর্থাৎ পরিবেশের মূল্য নির্ধারিত হবে মানুষের ব্যবহার উপযোগীতার উপর। মানুষের যতটুকু প্রয়োজন হবে ততটুকুই মূল্যবান হিসেবে বিবেচিত হবে।

তত্ত্বাবধানবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলা যায়, প্রাকৃতিক পরিবেশ মানুষের মূল্যায়নের উপর নির্ভরশীল নয়। মানুষ হল কেবল প্রকৃতির তত্ত্বাবধায়ক। পরিবেশের যত্ন নেওয়া মানুষের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। এখানে পরিবেশের যন্ত্রতুল্য মূল্য অস্বীকার করে বরং মানুষের ন্যায় পরিবেশের স্বতন্ত্র মর্যাদা দেয়া হয়েছে। তবে লক্ষ্যনীয় যে, মানুষ ও পরিবেশকে সমান মর্যাদা দেয়া হয়নি। আবার মানুষকে পরিবেশের স্বেচ্ছাচারী ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশও দেয়া হয়েছে। এতে করে মানুষের উপর প্রকৃতি দেখাশুনার বা তত্ত্বাবধানের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পিত হয়। প্রভুত্ববাদী ও তত্ত্ববধানবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করে বলা যায়, ঈশ্বর মানুষকে প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর কর্তৃত্ব করা বা এর উত্তম ব্যবহার করার জন্যই বলেছেন। যা কার্যত মানুষের মঙ্গলের জন্যই। কেননা পরিবেশ ভাল থাকলে মানুষ ভাল থাকবে। সুতরাং উভয়ই দৃষ্টিভঙ্গিই মানবকেন্দ্রিক।

৪.৩ হিন্দুধর্ম

বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত এবং অনুসারীর সংখ্যার দিক থেকে বিবেচনা করলে হিন্দু ধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন যুগের অসংখ্য মুনি, ঋষি, আচার্য ও ভক্তের নানা রকম ধর্মীয় ও নৈতিক অভিজ্ঞতা এবং উপদেশ এ ধর্মের ভিত্তি বলে বিবেচিত হয়। গবেষণাকর্মের এ অংশে হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থে পরিবেশ ও মানুষ সম্পর্কিত বিষয়গুলো বিশ্লেষণপূর্বক উপস্থাপন করলেই আমরা তার সত্যতা নিরুপন করতে পারব। হিন্দু ধর্মের উৎপত্তি যেহেতু ভারতবর্ষেই সেহেতু প্রকৃতির সঙ্গে প্রাচীন মানুষের সম্পর্ক কেমন ছিল তা জানতে একমাত্র ভারতবর্ষই যথেষ্ট।

ভারতবর্ষে উৎপত্তি লাভ করা বৌদ্ধ, জৈন, শিখসহ অন্যান্য ধর্মসমূহের মধ্যে হিন্দুধর্মের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এ স্বকীয় বৈশিষ্ট্য মূলত স্বাতন্ত্র্য কর্মপদ্ধতির জন্য। শান্তি, প্রেম, সহানুভূতি ও সেবার ধর্ম হিন্দুধর্মে অনেক দেব-দেবীর অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। এ ধর্মে মানুষের মর্যাদা দেয়া হয়েছে বিভিন্নভাবে। তাছাড়া সমগ্র জীবজগত ও উদ্ভিদজগতের তথা সমগ্র সৃষ্টিজগতকে এ ধর্মে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। হিন্দু ধর্মে সৃষ্টিজগত ও সৃষ্টিকর্তাকে অভিন্ন মনে করা হয়। এ ধর্মের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, আচার অনুষ্ঠান ইত্যাদি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে প্রকৃতির সাথে মানুষের মেলবন্ধন অত্যন্ত গভীর। ব্রহ্মসূত্রে বলা হয়েছে, জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ অর্থাৎ জীবই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই সব, জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। উপনিষদে এ অদ্বৈতবাদ বিশেষভাবে বিবৃত হয়েছে। হিন্দুধর্ম মতে, দেবতা এ পৃথিবীতে অবতার হিসাবে আবির্ভূত হন। বুৎপত্তিগতভাবে অবতার বলতে এমন কাউকে বোঝায় যে অবতীর্ণ হয়। হিন্দুধর্ম মতে, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর জগৎজুড়ে বিরাজমান থাকলেও বিশেষ সময়ে, বিশেষ কারণে, বিশেষ রূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হন এবং মানুষের সঙ্গে লীলা করেন। বিশেষরূপে ঈশ্বরের

পৃথিবীতে আগমনের এ বিশ্বাসই অবতারবাদ। অবতারবাদের মূল বিষয় হলো পৃথিবীর মানুষের মঙ্গল সাধনের লক্ষ্যে বিভিন্ন রূপে ঈশ্বরের পৃথিবীতে আবির্ভূত হওয়া। শ্রীমদভাগবত গীতায় বলা হয়েছে "যখনই পৃথিবীতে ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের উত্থান হয় তখন দুষ্টের বিনাশ, সাধুর পরিত্রাণ এবং ধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ঈশ্বর আবির্ভূত হন।" মূলত মানুষের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে মহান ঈশ্বর স্বেচ্ছায় মানুষ বা অন্যরূপ ধারণ করে পৃথিবীতে আবির্ভূত হন যাতে মানুষ তার স্বরূপ সম্পর্কে সামান্য হলেও জানতে পারে। অবতারবাদ থেকে উপলব্দি করা যায় যে, ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টিকূলের মধ্যে মানুষকে প্রাধান্য দিয়েছেন। মানুষের মঙ্গলের কথা চিন্তা করেই তিনি পৃথিবীতে যখন অর্ধম ধর্মের ওপর, দুষ্ট সাধুর উপর, মন্দ ভালোর উপর অন্যায় প্রতিষ্ঠা করে, প্রেম, কল্যাণের স্থান দখল করে নেয় তখনই তিনি পৃথিবীতে আবির্ভূত হন এবং ন্যায় ধর্ম প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা পালন করেন। যেমন, রামচন্দ্র রাবনকে হত্যা করে ন্যায়রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ কংস ও শিশুপালকে হত্যা করে এবং কুরুক্ষেত্রে কর্মোপদেশ দিয়ে ন্যায়ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এ সবকিছুর মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল মানুষ। তবে লক্ষ্য করা যায় ঈশ্বর কেবল মানুষের রূপেই পৃথিবীতে আসেননি, অন্যান্য জীবরূপেও জগৎ পরিচালনা ও রক্ষা এবং জগতের অধিবাসীদের মঙ্গলের জন্য অসংখ্য বার তিনি পৃথিবীতে আবির্ভূত হন। যেমন তিনি মৎস্যরূপে সমুদ্রের পানি থেকে বেদকে উদ্ধার করেন, শ্রীবিষ্ণু পৃথিবীকে রক্ষার জন্য কচ্ছপরূপে নিজ পৃষ্টদেশে গোটা পৃথিবী ধারণ করেন। আবার রাক্ষসরাজ রাবণের অত্যাচারে যখন জীবকূল দিশেহারা তখন শ্রীবিষ্ণু রামচন্দ্র রূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হন এবং রাবণকে হত্যা করে জীবকূলকে রক্ষা করেন। অশুভ শক্তির প্রভাবে যমুনার জল বিষময় হয়ে ওঠে। প্রাণীকূলের প্রাণ রক্ষার পরিবর্তে যমুনা নদী প্রাণ হরণের কারণে পরিণত হয়। শ্রীবিষ্ণু এবার বলরাম রূপে আবির্ভূত হন এবং যমুনার পানিতে লাঙল আকর্ষন করে যমুনার পানিকে অমৃতে পরিণত করেন। বৈদিক যুগে যজ্ঞের নামে অবাধে পশু হত্যা করা হতো। এতে পশুকূলের বংশগতি নির্বংশ হবার উপক্রম হয়। এ প্রেক্ষাপটে শ্রীবিষ্ণু পৃথিবীতে বুদ্ধরূপে আগমন করেন। তিনি এসে জীব হত্যা মহাপাপ ঘোষণা করে পশু রক্ষার ব্যবস্থা করেন। বস্তুত পৃথিবীতে ঈশ্বরের বিভিন্ন অবতাররূপে আসার মূল কারণ ছিল মানুষকে কেন্দ্র করে। জগতের অধিবাসীদের কল্যাণেই তিনি অসংখ্যবার অবতাররূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হন এবং ন্যায় ধর্ম প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা পালন করেন।

হিন্দুধর্মের প্রধান ভিত্তি হল বেদ। বেদের চারটি ভাগ রয়েছে। যেমন- ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ, অথর্ববেদ। বেদের উক্ত চারটি অংশেই পরিবেশ সম্পর্কিত আলোচনা পাওয়া যায়। তাছাড়া রামায়ন ও মহাভারতেও এ সম্পর্কিত বিভিন্ন বাণী রয়েছে। সংক্ষিপ্তকারে এগুলো নিচে আলোকপাত করা হলো

ঋগ্বেদে উল্লিখিত পরিবেশ প্রসঙ্গগুলো হল:

ঋগ্বেদের ৪/৫৭/১-৮ সূক্ত একান্তভাবে কৃষিকার্য সম্বন্ধীয়। ঋগ্বেদের যুগে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তির ও বিন্যাসের একটা পরিবর্তন ঘটেছিল। পশুপালনের পরিবর্তে কৃষিকার্য ক্রমশ অর্থনৈতিক ভিত্তি হয়ে উঠেছিল। ঋগ্বেদের ৪/৫৭ সূক্তের প্রথম থেকেই ক্ষেত্রপতির নিকট প্রার্থনা করা হয়েছে তিনি যেন প্রচুর বৃষ্টি দেন। কারণ তখন কৃষি একান্তই প্রাকৃতিক বৃষ্টির উপরই নির্ভর ছিল। চতুর্থ ঋকে মানুষকে কৃষিকাজের উপকরণরূপে গরু দিয়ে লাঙ্গলের সাহায্য ভূমিকর্ষনের ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে।[৪৬]

ঋগ্বেদে বলা হয়েছে,"আমাদের হিতের জন্য ক্ষেত্রপতির সঙ্গে আমরা ক্ষেত্র জয় করব। তিনি আমাদের গো ও অশ্বের পুষ্টি প্রদান করে আমাদের সুখী করুন।"[৪৭] এখানে দেখা যায়, মানুষ সৃষ্টিকর্তার নিকট তার নিজের জন্যই গরু ও ঘোড়ার পুষ্টি প্রার্থনা করছে। অর্থাৎ অমানবের প্রতি মানুষের সদাচরণ থাকবে কেবল মানুষের নিজের জন্য যা মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির ধারক। ঋগ্বেদে মানুষ তার নিজের মঙ্গল কামনায় ঈশ্বরের নিকট আরও প্রার্থনা করে। যেমন–

"ওষধিসমূহ আমাদের জন্য মধুময় হোক; দ্যুলোক, অন্তরিক্ষ, জলসমূহ আমাদের জন্য মধুময় হোক। ক্ষেত্রপতি আমাদের জন্য মধুযুক্ত হোন। আমরা শত্রুকর্তৃক অহিংসিত হয়ে তাঁকে অনুসরণ করব।"[৪৮]

ঋগ্বেদে পশুদের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে বিশেষ করে যে সকল পশু কৃষি কাজে ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রেও মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে ওঠেছে। কেননা কৃষিকাজের একমাত্র উদ্দেশ্য মানুষের জীবনধারণ করা। ঋগ্বেদে পশুদের সুব্যবস্থা নিয়ে উল্লেখ আছে যে, "পশুদের জলপান স্থান প্রস্তুত করো। চর্মরজ্জু যোজনা কর।"[৪৯] এছাড়াও বলা হয়েছে, "অশ্বদিগকে পরিতৃপ্ত করো, ক্ষেত্রে সংস্থাপিত ধান্য গ্রহণ করো। সহজে ধান্য বপন করে এইরূপ রথ প্রস্তুত করো। পশুদের জন্য এ জলপূর্ণ জলাধার এক দ্রোন[৫৪] প্রমাণ হবে। এতে অশ্ম বা প্রস্তর নির্মিত চক্র আছে। আর মনুষ্য পানোপযোগী জলাধার আছে। একে জলপূর্ণ করো।"[৫০]

উপরোক্ত ঋক্গুলো থেকে যেসব বিষয় স্পষ্ট তা হল:

১. পশুদের প্রতি সহমর্মিতা; ও

২. মানুষের প্রয়োজনে পশুকে ব্যবহার এর অনুমোদন।

যেহেতু আর্যরা প্রাথমিকভাবে পশুপালক ছিলেন, তাদের যাযাবর জীবনে কৃষিভিত্তিক অর্থনৈতিক সমাজ গড়ে ওঠার আগে পশুচারণ ও পশুপালনেই তারা বেশি অভ্যস্ত ছিলেন। তাই সমগ্র ঋগ্বেদে গ্রামীণ কৃষি অর্থনীতির চেয়ে পশুসম্পদের বিষয়টি আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। পশু সম্পদের মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান ছিল গবাদি পশু ও ঘোড়া।[৫১] ঋগ্বেদের সময় গোচারণের জন্য পৃথক ভূমি সংরক্ষণ করে রাখা হতো।যেমন, "হে মিত্র বরুণ, বাহু প্রসারিত করো। আমাদের জীবনার্থে আমাদের গোচারনস্থান জলসিঞ্চিত করো; মনুষ্যসমূহের মধ্যে আমাদের বিখ্যাত করো। তোমরা নিত্য তরুন। আমাদের এ আবাহন শোনো।"[৫২]

উপর্যুক্ত সূক্তে গভীরভাবে দৃষ্টি দিলে উপলব্ধি করা যায় যে, দেবতারা মানুষের মাঝে নিজেদের বিখ্যাত করতে চায়। এতে মানুষের মর্যাদাকে সৃষ্টিজগতের অন্যান্য সৃষ্টিকূল থেকে উচ্চতরের তাই বুঝা যাচ্ছে। এছাড়া মানুষের প্রয়োজনে বিভিন্ন পশুকে ব্যবহারের অনুমতি ঋগ্বেদে দেয়া আছে। যেমন, ১০/২৬/৬ ঋকে ভেড়ার পশম দিয়ে বস্ত্র তৈরীর কথা বলা হয়েছে।

সামবেদের পঁচাত্তরটি মন্ত্র ব্যতীত বাকি সব মন্ত্রগুলোই ঋগ্বেদ থেকে গৃহীত। সামবেদে জীবনে পানির গুরুত্ব, বাস্তুতন্ত্রে পানির ভূমিকা, পানিচক্র ইত্যাদি সম্পর্কীয় পরিবেশভাবনা বা ধারণাগুলির বিক্ষিপ্ত কিছু উল্লেখ পাওয়া যায়। মেঘসৃষ্টি, বারিবর্ষণের বিভিন্ন পর্যায়ে সামবেদে সোম, সোমদেব, পবমান সোম ও ইন্দুর উল্লেখ পাই। এখানে সোমকে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করতে দেখা যায়। যেমন, উত্তরার্চিকের ১০৯৩ মন্ত্রে সোমকে পানির সমার্থক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পৌরাণিক যুগে সোমকেই চাঁদ বোঝাত। ঋগ্বেদে সোম এক প্রকার লতা বা গুল্ম। দেবতাদের অবস্থিতি স্থান অনুসারে সোমকে পৃথিবীস্থানের দেবতাও বলা হয়েছে। নিম্নে সামবেদে উল্লেখিত পরিবেশ সংক্রান্ত কতিপয় মন্ত্র উল্লেখ করা হল:

"হে সোম, দেবতাদের আনন্দপানের জন্য যেমন তুমি নদীকে জলপূর্ণ কর, তেমনি তোমার প্রতি যে জাগরুক (অর্থাৎ অনুগত) তাকে জলের মধুর ক্ষরিত ধারার মতো সোমের মদিরাধারায় পূর্ণ করো।"[৫৩] সামবেদে আরও উল্লেখ আছে, "হে পবমান সোম, তুমি সুকৌশলে পরিষ্কৃত হয়ে আকাশে সশব্দে বিচরণ কর। তুমি বহুলোকের আকাঙ্ক্ষিত প্রচুর জলসম্পদ এনে দিয়ে থাক।"[৫৪]

উপরের মন্ত্রগুলো থেকে উপলব্ধি করা যায় যে, সামবেদে কেবল পানিচক্র নয়, জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, প্রাণের বিকাশে ও পৃথিবীর বিভিন্ন বাস্তুতন্ত্রে পানির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। প্রথম মন্ত্রের দিকে গভীরভাবে দৃষ্টি দিলে উপলব্ধি করা যায় এখানে জাগরুক (মানুষ) কে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

মানুষকে জল দ্বারা পূর্ণ করার কথা বলা হয়েছে। এখানে আরও বলা হয়েছে, সামের আশ্রয় স্বর, স্বরের আশ্রয় প্রাণ; প্রানের আশ্রয় অন্ন, অন্নের আশ্রয় পানি। সুতরাং পানি হল জীবনের জীবনীশক্তি। আধুনিক পরিবেশবিদদের ভাষায় পানি হল - The most democratic liquid.[৫৫]

বর্তমান যজুর্বেদে দুটি শাখা পাওয়া যায়–শুক্ল যজুর্বেদ ও কৃষ্ণ যজুর্বেদ। যজুর্বেদে পরিবেশ ও মানুষ সংশ্লিষ্ট যেসব প্রসঙ্গের উল্লেখ আছে, তাদের কিছু এখানে উল্লেখ করা হলো:

"ধীর কৃষিকর্মে অভিজ্ঞেরা দেবগণের সুখের জন্য বৃষের সঙ্গে হালযুক্ত করছে ও যুগগুলি বিস্তার করছে। হে কৃষকগণ, হালযুক্ত করো, যুগগুলি বিস্তার করো। কর্ষন করা হলে ক্ষেত্রে দেবমন্ত্রে বীজ বপন করো। ব্রীহি প্রভৃতি পুষ্টিলাভ করুক, অতি অল্পকালে পক্বধান দাত্রের সাহায্যে ছিন্ন হয়ে আমাদের গৃহে আসুক। সুন্দর লৌহময় ফলাগুলি অনায়াসে ভূমি কর্ষণ করুক, কৃষকগণ সুখে ষাঁড়ের সঙ্গে থাক। হে বায়ু ও আদিত্য, তোমার জল দিয়ে ভূমি সিক্ত করে ওষধিগুলি সুন্দর ফলযুক্ত করো।"[৫৬] আরো বলা হয়-

"হে ওষধিসকল চিকিৎসার জন্য তোমাদের মূল যিনি খনন করেন, তার বিনাশ যেন না হয়। রুগ্ন ব্যক্তি চিকিৎসার জন্য আমি যার মূল খনন করেছি সে যেন আমার বিনাশ না করে। দ্বিপদী, চতুষ্পদ, স্ত্রী-পুরুষ, সকল প্রাণী যেন রোগশূন্য হয়।"[৫৭]

উক্ত মন্ত্রগুলোতে লক্ষ্য করা যায়, ঈশ্বর মানুষকে পশু ব্যবহার করে জমিচাষের নির্দেশ দিয়েছেন। তাছাড়া পৃথিবীর সকল জীবের মঙ্গল কামনায় রোগমুক্তি কামনা করা হচ্ছে।

ঋগ্বেদের মতো অথর্ববেদেও কৃষিকার্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। পৃথিবী ও প্রকৃতির উদ্দেশ্যে মন্ত্রগুলি অথর্ববেদের দ্বাদশ কান্ডের প্রথম অনুবাকের অন্তর্গত ও তা 'পৃথিবীসূক্ত' নামে পরিচিত। এ বিশেষ মন্ত্রগুলিতে বৈদিক ঋষিরা মাতা ধরিত্রীর সাথে মানুষের নাড়ীর বন্ধনের কথা বলেছেন: মাতা ভূমিপুত্রম্ পৃথিব্যাঃ। ধরিত্রী আমার মাতা, আমি তার সন্তান। মাতা ধরিত্রী আরাধ্য হয়েছেন তাঁর অকৃপন স্নেহের দানের জন্য, তাঁর প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের জন্য। তাঁর তৃণ শ্যামলিমায়, তাঁর লতা-গুল্ম-বৃক্ষরাজি, রৌদ্র-মেঘ-বৃষ্টি, পর্বত ও মহাসাগরের প্রচন্ড সুন্দর মহিমায়। আর তাই বৈদিক ঋষিরা সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য মাতা ধরিত্রীর কাছে নম্র নমস্কারে বারবার আর্শীবাদ প্রার্থনা করেছেন। আশীর্বাদ করেছেন, সকলের কল্যাণময় ইচ্ছার সার্থক রূপ যেন হয়। তারা অঙ্গীকার করেছেন, পৃথিবী বা ধরিত্রীকে মানুষের লোভ লালসা, স্বার্থ-পরতার থেকে মুক্ত করতে যাতে পৃথিবীটা সুস্থ থাকে। এ সকল প্রার্থনা গানের মতোই উৎসারিত হয়েছে অথর্ববেদের পৃথিবীসূক্তে। ধরিত্রীকে অমলিন, অক্ষত ও অব্যাহত রাখার সংকল্পে,

পরিবেশ ও প্রকৃতির সংরক্ষণে ও পরিপোষণে এবং তাকে সকল প্রকার স্বার্থসিদ্ধি থেকে দূরে রেখে সুন্দর বাসযোগ্য পৃথিবী গড়ার অঙ্গীকার করেন। অথর্ববেদে দ্বাদশ কান্ডে প্রথম অনুবাক প্রথম সুক্তে বলা হয়েছে, "পৃথিবীতে জীবনকে মহানত্বে উর্ত্তীণ করতে প্রয়োজন ঋজু ন্যায়পরায়নতা, দৃঢ় বিচারবোধ, অটল অধ্যবসায়, মেধা ও উদারতা।" অর্থাৎ এই পৃথিবী অতীতে আমাদের প্রতিপালন করেছে, ভবিষ্যতেও প্রতিপালন ও লালনের কাজ অব্যাহত থাকবে, মানুষের জীবন ধারাকে অবিরাম ও প্রসারিত রাখতে পৃথিবীর এ পুণ্যভূমি অনুকূল ও উপযুক্ত। অথর্ববেদে মানুষকে সর্বাধিক গুরুত্বের সাথে দেখা হয়েছে। মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তুরাজির সমাহার হিসেবে পৃথিবীকে সাজানো হয়েছে। তাছাড়া আরও বলা হয়েছে যে, এই ধরিত্রী শোভিত সাগর ও নদী দ্বারা। এখানে ফসল জন্মায়, পক্ব হয়, প্রাচুর্য বহন করে আনে। এই ফসল আমাদের প্রয়োজনীয় পুষ্টি জোগায়, জীবকলায় জীবিত প্রাণকে প্রাণিত করে রাখে।[৫৮]

মানুষের প্রয়োজনে অ-মানব প্রাণী যেমন গরু, ঘোড়াকে ব্যবহারের কথাও অথর্ববেদে বলা হয়েছে। যেমন-

"গো, অশ্বের মতো গৃহপালিত পশুরা এবং আমাদের উপকারী বিহঙ্গকুল এই ধরিত্রীতে আশ্রিত। হে ধরিত্রী, হে বসুন্ধরা, আমাদের সকলকে শক্তি ও সমৃদ্ধি দাও।"[৫৯]

বেদ ও উপনিষদের গ্রন্থ প্রকৃতি থেকে রামায়ণের গ্রন্থ প্রকৃতি আলাদা। রামায়ণের কবি ছিলেন অরণ্যবাসী। তার ধারণা প্রকৃতির মাঝে ঋষিরা ধ্যানমগ্ন হয়ে প্রকৃতির আনন্দময় রহস্যকে সুস্পষ্ট উপলব্দি করতে পারেন। রামায়ণের রচয়িতা বাল্মীকি তাদেরই প্রতিভূ। "প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ট হয়ে প্রকৃতির সঙ্গে নিজেদের সত্তার গভীর আত্মীয়তা উপলব্ধি করতে পেরে আর্য ঋষিরা বলতে পেরেছিলেন–যদিদং কিঞ্চিৎ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং। এই যা কিছু সবই পরম প্রাণ হতে নিঃসৃত হয়ে প্রাণের মধ্যেই কম্পিত হচ্ছে। সেখানে তারা বাস করতেন যেখানে বিশ্বব্যাপী বিরাট জীবনের সঙ্গে তাঁদের জীবনের অবারিত যোগ ছিল। এ বন তাঁদের ছায়া দিয়েছে, ফূল ফল দিয়েছে, কুশ সমিধ্ জুগিয়েছে, তাঁদের প্রতিদিনের সমস্ত কর্ম, অবকাশ ও প্রয়োজনের সঙ্গে বনের (অর্থাৎ প্রকৃতির) আদান-প্রদানের জীবনময় সম্বন্ধ ছিল। এই উপায়েই নিজের জীবনকে তাঁরা চারিদিকের একটি বড়ো জীবনের সঙ্গে যুক্ত জানতে পেরেছিলেন। চতুর্দিকে তাঁরা শূন্য নির্জীব বলে, পৃথক বলে জানতেন না। বিশ্বপ্রকৃতির ভেতর দিয়ে আলোক বাতাস, অন্নজল প্রভৃতি যে সব দান তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন, সেই দানগুলি যে মাটির নয়, গাছের দান, শূন্য আকাশের দান নয় একটি চৈতন্যময় অনন্ত আকাশের মধ্যেই তার মূল প্রস্রবণ, এইটিই তারা একটি সহজ অনুভবের দ্বারা জানতে

পেরেছিলেন।" এ থেকে বোঝা যায় বন ভারতবর্ষের চিত্তকে নিজের নিভৃত ছায়ায় নিগূঢ় প্রাণের মধ্যে কেমন করে লালন করেছে।[৬০]

রামায়ণের মহাকাব্যে দেখা যায় রামচন্দ্রের সঙ্গে বনে ভরত দেখা করতে যেতে যেতে পথে যেখানে দরকার সেখানে তার লোকজন বাঁধ তৈরী করছে। কোথাও অতিরিক্ত পানি দিতে প্রবাহের পথ খুঁড়ছে। সমুদ্রের মতো হ্রদ খনন করছে কোথাও। এমনকি যাত্রাপথের বহু স্থানে নানা প্রকারের কূপও খনন করে দিচ্ছে। চলার পথ তৈরী করতে বহু গাছ কাটতে হয়, তাই সেই ক্ষতিপূরণে এবং যে স্থান গাছবিরল সেখানে বৃক্ষরোপন করা হয়েছে। মহাকাব্যের এই দৃষ্টান্ত থেকে অনুমান করা যায় প্রাচীন ভারতের মানুষেরা কত যত্নে প্রকৃতি সংরক্ষণ করতেন। দ্বান্দ্বিক নয়, সহযোগীতার মেলবন্ধনই গড়ে উঠেছিল মানুষ ও তার পরিবেশের মধ্যে সম্পর্ক। তাছাড়া রামায়ণে রাম-সীতার বনবাসে কথা উল্লেখ আছে। কিন্তু রাম-সীতার এ বনবাস ছিল আনন্দের। রামায়নের কবি বারবার বনের এই আনন্দকে উল্লেখ করেছেন। বনের তরুলতা, পশুপাখি তাদের হৃদয়কে কেবলই আনন্দ দিয়েছে। তরুলতা সম্পর্কে বাল্মীকি ও রাম-সীতা কতটা সচেতন ছিলেন তার প্রকাশ বিভিন্ন শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে। তরুলতার সাথে রাম ও সীতার কতখানি প্রাণের সংযোগ হয়েছিল তার বিভিন্ন উদাহরণ পাওয়া যায়। রাবণ দ্বারা অপহৃত হবার সময় সীতা পঞ্চবটির গাছপালার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছেন। সীতা গাছপালার কাছে নিবেদন করলেন তোমরা অতিদ্রুত রামকে সংবাদ দাও যে রাবণ সীতাকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে। রাম ও সীতার অন্বেষণের প্রাথমিক পর্যায়ে বনরাজিকেই উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন করেছেন।[৬১] রামচন্দ্র কদম্ব, বিল্ব, অর্জুন, কুরুবক, বকুল, অশোক, তাল-জাম, কর্নিকার প্রভৃতি বৃক্ষের কাছে সীতার খোঁজ নিয়েছেন। রামায়নে অজস্র গাছের নাম, কয়েকটি বিস্তৃত অরণ্য, সুসজ্জিত উদ্যানের (যেমন, লঙ্কার অশোককানন, যেখানে সীতা বন্দিনী ছিলেন) বর্ণনা পাওয়া যায়। প্রকৃতির বিচিত্রসুন্দর বৃক্ষারাজি, জলসম্পদের বর্ণনাও এখানে পাওয়া যায়। মূলত: রামায়ণের এ বর্ণনাগুলিকে আধুনিক পরিবেশবিদ্যার অন্তর্গত বাস্তুবিদ্যার নিরিখে বিশ্লেষণ করা যায়।

বিষয়গত বৈচিত্র্য ও শ্রেষ্ঠত্বের কারণে মহাভারতকে হিন্দুধর্মের বিশ্বকোষ এবং পঞ্চমবেদও বলা হয়। শ্রীমদভাগবত গীতার ৩/২৯/৩০ এ উল্লেখ আছে, রূপভেদবিদস্তত্র ততশ্চোভয়তোদতঃ। তেষাঃকহুপদাঃ শ্রেষ্ঠাশ্চতুল্পাদস্ততো দ্বিপাৎ।।

অর্থাৎ শ্রবণক্ষম প্রাণীদের থেকে রূপের পার্থক্য নিরূপণ করতে সক্ষম জীবেরা শ্রেষ্ঠ। তাদের থেকে দুই পঙক্তি দন্ত-বিশিষ্ট প্রাণীরা শ্রেষ্ঠ এবং তাদেও থেকেও শ্রেষ্ঠ হচ্ছে বহু পদ বিশিষ্ট প্রাণী। তাদের

থেকে শ্রেষ্ঠ চতুষ্পদ এবং তাদের থেকেও শ্রেষ্ঠ হচ্ছে দ্বিপদ বিশিষ্ট মানুষ। মূলত এই শ্লোকে বিভিন্ন শ্রেণীর জীবের মধ্যে মানুষকে শ্রেষ্ঠ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

মহাভারতের অনুশাসন পর্বের ৫৮তম অধ্যায়ে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বৃক্ষরোপনের সুফল সম্পর্কে বলেছেন। "উদ্ভিদপদার্থ বৃক্ষ, গুল্ম, লতা, বল্লী, বংশ ও তৃণ এই ছয় জাতিতে বিভক্ত। এই সমুদয় রোপন করিলে ইহলোকে কীর্তি শুভ ফল ও পিতৃলোকে সম্মান লাভ হইয়া থাকে। অতএব বৃক্ষরোপন করা মানবগণের অবশ্য কর্তব্য। তাঁহারা ধর্মানুসারে রোপনকর্তার পুত্রস্বরূপ। বৃক্ষসমূহ রোপন করিয়া পুত্রের ন্যায় তাহাদের প্রতিপালন করা শ্রেয়োলাভার্থী ব্যক্তির অবশ্য কর্তব্য।" লক্ষণীয় যে, এখানে বৃক্ষকে রোপনকর্তার সন্তানরূপে স্বীকৃতি দেবার মধ্যে বৃক্ষাদির সাথে রোপনকর্তার আত্মিক সম্পর্কের কথা ভাবা হয়েছে। এ আত্মিকতার ভাবনা হিন্দুধর্মের পরিবেশ ভাবনার একটির লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

প্রকৃতিতে মানবজাতির অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য আদর্শ বাস্তুতন্ত্রের প্রয়োজন। পুকুর, জলাশয় পানীয় জলের অন্যতম প্রধান উৎস। এগুলো পানীয় জলের উৎস ছাড়াও আধুনিক বাস্তুতন্ত্র অনুসারে পুকুর বা জলাশয় আদর্শ বাস্তুসংস্থান পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্যই নয় উদ্ভিদও অন্যান্য প্রাণীর জন্যও এগুলোর গুরুত্ব রয়েছে।

পরিবেশের ওপর যে ঘটনার প্রভাব বিপুল ও সুদূরপ্রসারী এবং একবিংশ শতাব্দীতেও যা থেকে উদ্ভূত সমস্যা আমাদের চিন্তিত করে তা হল প্রাকৃতিক পরিবেশকে বিনষ্ট করে নগরায়ন করা। মহাভারতপূর্ব অন্যকোন ভারতীয় গ্রন্থে এ প্রসঙ্গের উল্লেখ আছে বলে আমার জানা নেই। পান্ডবদের রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থ নির্মাণের প্রয়োজনে অরণ্য ধ্বংস করা হলো। বৃক্ষলতা, পশু-পাখির শশ্মানভূমির উপর গড়ে উঠল নতুন রাজধানী। একে বলা হয় মানব ইতিহাসের একটি প্রধান পদক্ষেপ, আদিমতাকে দূর করে সভ্যতার প্রথম অভিযান ; মানুষের হাতে প্রকৃতির পরাজয় তথা মানবকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনার জয়।

উপরে হিন্দুধর্মের আলোকে পরিবেশ ও মানুষ সম্পর্কিত আলোচনায় কালানুক্রমে পরিবেশের পরিবর্তন কিরূপ হচ্ছে তা উপলব্ধি করা যায়। যেমন ঋগ্বেদের সময়ে দূষণ সমস্যা বর্তমান কালের মত প্রকট ছিল না। তখন লোকসংখ্যা কম ছিল, আবার প্রাকৃতিক সম্পদ ছিল পর্যাপ্ত। ঋগ্বেদের সময়ের চিন্তাশীল মানুষেরা আধুনিক অর্থে পরিবেশ বলতে আমরা যা বুঝি, সেই অর্থে তারা ভাবেননি। তারা ভেবেছেন প্রকৃতিকে নিয়ে। তাদের প্রকৃতি চেতনার ব্যাপ্তি ও বিস্তার ছিল অনেক বেশি প্রসারিত। যে ভূখন্ডে জীবের স্বাভাবিক বসবাস, সেখানকার মাটি, আকাশ, বাতাস, পানি, উষ্ণতা, আবহাওয়া ও প্রতিবেশী বিভিন্ন জীব নিয়ে যে পরিমন্ডল সেই পরিমন্ডলে বিদ্যমান অবস্থায়

জীবের পরিবেশ। সুতরাং পরিবেশ প্রকৃতির খন্ডাংশ। সর্বশেষ মহাভারতে দেখা যায় স্বাভাবিক প্রাকৃতিক পরিবেশকে ধ্বংস করে নগরায়ন প্রতিষ্ঠা করা। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চেতনার বিবর্তন ঘটেছে। মানুষ নিজেদেরকে নিয়ে ভাবতে শিখেছে। প্রকৃতিকে করায়াত্ব করে নিজেদের ভোগবিলাসের প্রয়োনীয় সবকিছুর ব্যবস্থা করছে। গভীরভাবে বলতে গেলে বর্তমান পৃথিবীর পরিবেশ সমস্যা বা সংকটের সিংহভাগ ভোগবাদী জীবনদর্শন। কিন্তু মানব অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার নিমিত্তে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য পৃথিবী বিনির্মাণ করতে হবে। সেই পৃথিবী পরিবেশকে ধ্বংস করে নয়, বরং পরিবেশের সাথে সহাবস্থান করে মানুষের প্রেক্ষিতে চিন্তা করেই পরিবেশ নৈতিকতার চর্চা করতে হবে। তবে হিন্দু ধর্মে কখনোই প্রকৃতিকে প্রতিপক্ষ ভাবেনি। বরং প্রকৃতির সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে, প্রকৃতির সাথে নিজেদের সত্তার গভীর আত্মীয়তা অনুভব করার কথা বলা আছে। "যদিদং কিঞ্চিৎ জগৎ সর্বং প্রাণ এ জাতি নিঃসৃতং"।

৪.৪ বৌদ্ধ ধর্ম

বৌদ্ধ ধর্ম মানবতাবাদী, জীবপ্রেমী ও প্রকৃতিপ্রেমী ও মধ্যপন্থী ধর্ম। মহামতি গৌতম বুদ্ধের (৫৬৩-৪৮৩ খ্রিঃপূঃ) প্রচারিত বাণী ও জীবনদর্শনই বৌদ্ধধর্মের মূলমন্ত্র। শুধু নিজের মুক্তি নয় বরং মানবজাতিকে চিরকালীন দুঃখ-দুর্দশা থেকে স্থায়ীভাবে মুক্তি দেয়ার লক্ষ্যে বুদ্ধদেব তাঁর ধর্মবাণী প্রচার করেছেন। তাঁর বাণী ও উপদেশসমূহে পরিবেশে মানুষের স্থান, মানুষ প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে কীরূপ আচরণ করবে, এ ধরণের দিকনির্দেশনা রয়েছে।

আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে মহাকারুনিক গৌতম বুদ্ধ যে বাণী প্রচার করেছিলেন তা কোন নির্দিষ্ট স্থান, কাল বা পাত্রের উদ্দেশ্যে ছিল না। তিনি তাঁর ধর্মবাণী প্রচারের মাধ্যমে কোনো ধর্মীয় জাতি-গোষ্ঠীও প্রতিষ্ঠা করতে চাননি। মানবজাতি শুধু নয়, সমগ্র জীব ও জগতের কল্যাণেই বিমুক্তির বাণী প্রবর্তন এবং প্রচার করেছিলেন তিনি। 'জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক'–বুদ্ধের এ অসীম উদার বাণীতে সে সত্যই প্রতিভাত হয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তাকে সর্বপ্রাণবাদী (Pan-psychismist)[৬২] বলা হয়। তথাগত বুদ্ধের প্রজ্ঞাপিত চতুরার্য সত্য, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, বিদর্শন ভাবনা, দান (ত্যাগ), শীল (চরিত্র), বিনয়, সূত্র–সবকিছুতেই রয়েছে মানুষ কিভাবে সুখী হতে পারে, অপরের মাঝে সুখ বিলাতে পারে, কিভাবে নিজের ও পরের কল্যাণে নিজেকে নিবেদিত করতে পারে তার সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা। মনুষ্যত্ব অর্জন ও বিকাশে বুদ্ধ কেবল মার্গ বা পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। এজন্য তিনি মুক্তিদাতা নন-মুক্তির দিকনির্দেশক মাত্র। তিনি বুঝেছিলেন, মানুষের মাঝে ঠেসে থাকা সহজাত

লোভ, হিংসা, মোহ, ক্রোধ, ঘৃণা প্রভৃতি রিপু মানুষকে মানুষ হিসেবে বিকশিত হতে দেয় না। তাই এসব রিপুকে দমন এবং জয় করার পথও তিনি নির্দেশ করেছেন।

মহামতি বুদ্ধের মতে, মানুষের মধ্যে এক অনন্য প্রতিভা লুকিয়ে আছে। এই সুপ্ত প্রতিভার জাগরণ ঘটাতে পারলেই মানুষ সাধারণ থেকে অসাধারণ হয়ে উঠতে পারে। এজন্য প্রয়োজন আত্মশক্তি এবং চিত্তবিশুদ্ধি। এই পরিশুদ্ধি অর্জনে আসে মানবজীবনের পূর্ণতা। বুদ্ধ এ পূর্ণতা লাভের উপায় দেখিয়ে গেছেন। পূর্ণতার এ পথ সবার জন্য সমান উন্মুক্ত। উপমহাদেশে বিদ্যমান পরা জাগতিক চিন্তা থেকে মহামতি গৌতমবুদ্ধ একটি স্বাধীন যুক্তিনির্ভর চিন্তাধারা প্রবর্তন করেন। মানবজাতিকে দুঃখ-কষ্ট থেকে চিরমুক্ত করার জন্য তিনি নির্বাণ নামক এক শাশ্বত পন্থার কথা বলেন।

বৌদ্ধধর্মে পরিবেশে মানুষের পাশাপাশি অন্যান্য অ-মানব প্রাণী ও উদ্ভিদের সমান গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। তিনি তৎকালীন সমাজে ব্রাহ্ম ধর্মের আচার-সর্বস্বতা, পুরোহিত প্রাধান্য, যজ্ঞে পশু বলির প্রবণতা ও এগুলো থেকে গড়ে ওঠা প্রকৃতিবাদ ও প্রাকৃতিক শক্তির প্রতি মানুষের গভীর ভীতির প্রেক্ষাপটে মানুষ ও প্রাকৃতিক পরিবেশের সম্পর্কে পুনর্মূল্যায়ন করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। তিনি সকলের মনে ও বিশ্বাসে বিশ্বের সকল উদ্ভিদ ও প্রাণী যে প্রাণের সহমর্মিতায় নিবিড়ভাবে যুক্ত, পরস্পরের উপর নির্ভরশীল তা বোঝাতে চেয়েছেন। এ কারণে তাঁর প্রচারিত ধর্মকে সর্বপ্রাণবাদী বলা হয়। তিনি সবসময় মৈত্রী ও করুণার দ্বারা জীবকে ভালবাসতে বলেন। শিষ্যসংঘের উদ্দেশ্যে তিনি উচ্চারণ করেছিলেন – সমগগানং তপঃসুখ। অর্থাৎ সমগ্রের তপস্যাতেই সুখ ও শান্তি। সকল জীবের প্রতি বুদ্ধের একটি অমর অবদান হল 'পঞ্চশীল'। এখানে শীল বলতে চরিত্র বিশুদ্ধির উত্তম নীতিসমহের কথা বলেছেন। গৌতম বুদ্ধ মানুষের চরিত্র বিশুদ্ধির জন্য যে সমস্ত নিয়ম বিধিবদ্ধ করেছেন, সেগুলোই শীল নামে অভিহিত। অর্থাৎ প্রাণী হত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যাকথন, মাদকদ্রব্য সেবন প্রভৃতি হতে বিরত থাকাই হল তাঁর পঞ্চশীল।

মহামানব বুদ্ধের প্রথম শীলে প্রাণী হত্যা না করার এবং প্রাণী হত্যার কোনোরূপ কারণ না হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। বুদ্ধের মতে যাদের প্রাণ আছে তারাই প্রাণী। অন্যান্য প্রাণীর মতো মানুষ এক ধরনের প্রাণী। মানুষের যদি বেঁচে থাকার অধিকার থাকে, তাহলে অন্য প্রাণীদের তা থাকবে না কেন? আমার কাছে যদি নিজের জীবন প্রিয় ও মূল্যবান হয়, অন্যের কাছেও তার জীবন প্রিয় ও মূল্যবান হবে না কেন? আমার যেমন সুখ-দুঃখ অনুভূতি রয়েছে, তেমনি অন্য প্রাণীরও তা রয়েছে। আমি যেমন প্রীতিকর জিনিস পেলে সুখী হই এবং আঘাত পেলে দুঃখ অনুভব করি, জগতের অন্যান্য প্রাণীরও তেমনি প্রীতিকর দ্রব্যে সুখ পায় এবং আঘাতে দুঃখ অনুভব করে। আমার সুখ আমার কাছে

কাম্য হলে অন্যের সুখ আমার কাছে কাম্য হওয়া উচিত। জীবে দয়া হচ্ছে করুণার যথার্থ সংজ্ঞা। প্রাণী হত্যার পালি শব্দ হল 'পানাতিপাতো'। 'পানো' শব্দের অর্থ হল প্রাণী অর্থাৎ জীবনীশক্তি বুঝায়। 'আতিপাতো' অর্থ হলা অকালে পতন। সুতরাং আয়ুস্কাল পূর্ণ হতে না দিয়ে অকালে জীবনী শক্তির ধ্বংস সাধনই 'পানাতিপাতো' বা প্রাণীহত্যা। যিনি জীব জগতের প্রতি সর্বদা অপরিসীম মৈত্রী ও করুণায় অনুপ্রাণিত থাকেন তার পক্ষে প্রাণীহত্যা অসম্ভব। মৈত্রী ভাবনায় বুদ্ধ মানুষকে অন্য প্রাণীদের প্রতি মৈত্রী ধর্ম অনুশীলন করতে বলেছেন। তাছাড়া গৌতম বুদ্ধ মনে করেন মানুষ নিজের মঙ্গলকামনায় উপসনা ও দেবার্চনার জন্য যে যজ্ঞবলি, পশুবলি দেয় সেগুলোকে অধর্ম ও অসার বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি সবসময় বলেছেন, প্রাণকে হত্যা করো না, জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক, শত্রুহীন হোক, অহিংসিত হোক, সুখী আত্মা হয়ে কাল হরণ করুক।

গৌতমবুদ্ধ তাঁর সময়ে গঙ্গা তীরবর্তী অঞ্চলে বনিক ও বৃত্তিজীবী সম্প্রদায়ের দ্রুত উত্থান, কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির প্রসার এবং বাণিজ্যিক নগরায়নের প্রভাবে স্বাভাবিক বসতি থেকে বন্যপ্রাণীর ক্রমশ সংখ্যা হ্রাস উপলব্ধি করেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, জৈন ও বৌদ্ধ উভয় ধর্মেই ধর্মীয় ও দার্শনিক তত্ত্বে জীবহত্যার প্রতি কঠোর নিষেধাজ্ঞা কেবল তাত্ত্বিক ছিল না, বরং এর একটি অর্থনৈতিক দিকও ছিল। গঙ্গা উপত্যকায় কৃষির অভাবনীয় সাফল্য ও গুরুত্ব বেড়ে যাওয়ায় পশুসম্পদ বিশেষ করে গবাদি পশুর প্রয়োজনীয়তা বেড়ে যায়। নির্বিচারে পশুহত্যা গবাদি পশুর সংখ্যা হ্রাসসহ কৃষির ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। তাই নির্বিচারে পশুহত্যার পরিবর্তে পশু, বিশেষত গবাদি পশুর পরিচর্যা ও সংরক্ষণ অসীম গুরুত্ব লাভ করে। এতে করে তৎকালীন সমাজের অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা থেকেই বৌদ্ধ ও জৈনধর্মে অহিংসার প্রতি আস্থা ও পশুহত্যার প্রতি তীব্র বিরাগ উদ্ভুত হয়েছিল।[৬৩] ফলে বুদ্ধের সকল বাণীর মধ্যে সর্বজীবে দয়া ও করুণার কথা বারবার উচ্চারিত হয়েছে। এটা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বুদ্ধের জীবপ্রেমের মধ্যেও মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি লুকায়িত ছিল। কেননা পশুসম্পদ কমে গেলে প্রকারন্তরে মানুষই অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

জাতকের বিভিন্ন গল্পে বুদ্ধের জীবন ও বাণীতে মানুষের পাশাপাশি পশু পাখিরাও সমান অংশীদার হয়েছে। এসব জাতক কাহিনীতে বুদ্ধের বিভিন্ন পূর্বজন্মের কথা বর্ণিত হয়েছে– সেখানে তিনি পশু বা পাখিরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মূলত জাতক কাহিনীতে প্রকৃতির একচ্ছত্র আধিপত্য লক্ষ্য করা যায়। সেখানে পশুপাখি, গাছপালার কথা বলা হয়েছে। জাতক কাহিনীর কেন্দ্রীয় চরিত্র বোধিসত্ত্ব– তিনি ভাবী বুদ্ধ। বৌদ্ধশাস্ত্র অনুসারে কেবল এক জন্মের কর্মফলেই কেউ সম্যকসম্বুদ্ধ হতে পারে না। যিনি বুদ্ধ হবেন তিনি বোধিসত্ত্বরূপে নানা কর্মের মাধ্যমে চরিত্রের উৎকর্ষসাধন করবেন। জাতক

কাহিনীতে বোধিসত্ত্বের পূর্বজন্মে বিভিন্ন পশুপাখি হয়ে জন্ম ও বৃক্ষলতাগুল্ম ইত্যাদির সাথে নিবিড় সম্পর্কের কথা উল্লেখ আছে।[৬৭] এখানে যেসকল বৃক্ষলতাদি ও জীবজন্তুর উল্লেখ পাই, তাদের মধ্যে অন্যতম হলঃ পলাশ, শাল, মাধবীলতা, কুরুবক, কেতক, উশীর, মুচুকুন্দ, তটর, তাল, জুঁই, ঘেঁটু, শিরীষ, চেতস, বেত, অশোক, বনমল্লিকা, বকুল, পুন্নাগ, আসন, পিয়াশাল, শাসল, সরল, চম্পক, যুথিকা, কিংশুক, কোবিদার, তূণ, অর্জুন, কদলী, দেবদারু, প্রিয়ঙ্গু, পদ্মক, কালাগুরু, চন্দন, নাগকেশর, তিরীতক, লোধ্র, কর্ণিকার, ভূর্জপত্র, নীলোৎপল, কুমুদ, শ্বেত শতদল এবং মন্দা ইত্যাদি অন্যতম। এছাড়া মহাকপিজাতক ও আম্রজাতকে আমের উল্লেখ আছে। শরভমৃগজাতকে গন্ডাম্র নামক আমেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। বৌদ্ধদর্শন ও সাহিত্যে দেখা যায়, বড় বড় বৃক্ষের শ্রদ্ধার আশ্রয়ে এক একজন বৃক্ষদেবতা থাকেন। এ বৃক্ষদেবতাগণ হলেন: পলাশজাতক-১, পলাশজাতক-২, বৃক্ষধর্মজাতক ইত্যাদি। এছাড়া আরও ৬৪টি জাতকে বৃক্ষদেবতার কথা আছে, এতে করে উপলব্ধি করা যায় যে, বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনে বৃক্ষকে বিশেষ মর্যাদা দেয়া হয়েছে। আবার দেখা যায় বৌদ্ধধর্মে বিশেষ কিছু গাছকে Symbolic member of Buddhist order এর স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।[৬৪] মূলতঃ বৌদ্ধ ধর্মে মানবকেন্দ্রিকতাবাদের কথা বলা হলেও এ স্বীকৃতিতে বৌদ্ধধর্মকে আধুনিক বাস্তুতন্ত্রীয় ধারণার গভীর বাস্তুবিদ্যার (Deep ecology) খুব কাছাকাছি মনে করা যায়।[৬৫]

হিমবন্ত প্রদেশে তিনশত যোজন[৬৬] উচ্চতায় তিন হাজার যোজন বিস্তৃত বনাঞ্চল ছিল। এসকল বনাঞ্চলে যে সকল পশুপাখি রয়েছে তার উল্লেখ জাতকে পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: ময়ূর, চিল, পাপিয়া, কোকিল, কুরর, হাঁস, সারস, কবুতর, ভৃঙ্গরাজ, হস্তীলিঙ্গ, চকোর,নেকড়ে, মৃগ, রুরু হরিন, বন্য গরু, গন্ডার, গোকর্ণ হরিণ, সিংহ, ভাল্লুক, বিড়াল, উদবিড়াল, হাতি, শশকর্ণি, চমরী, কদলি, তরক্ষু প্রভৃতি।

গৌতম বুদ্ধ পরিবেশের সকল সত্তার প্রতি সমান চিন্তা-চেতনার মাধ্যমে বৌদ্ধধর্মের বাস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেন। বৌদ্ধ বাস্তুতন্ত্রীয় চেতনার গভীরে একটি চিন্তন নিবিড়ভাবে লিপ্ত হয়ে আছে যা বিগত দুই সহস্রাব্দে ধরে বৌদ্ধদর্শনকে সঞ্জীবিত করে রেখেছে, তা হল প্রতীত্যসমুৎপাদ।[৬৭] প্রতীত্যসমুৎপাদ অনুসারে এ জগৎ সংসারে বিনা কারণে কোন কিছু ঘটে না। যা কিছু ঘটে, তা কোন না কোন কারণের উপর নির্ভর করেই ঘটে। পারস্পরিক নির্ভরতাকেন্দ্রিক এই মতবাদ অনুসারে বিশ্বের সমগ্র বাস্তুমন্ডলের (বায়ুমন্ডল, অশ্মমন্ডল, জলমন্ডল ও জীবমন্ডল) সকল অপ্রাণ ও সপ্রাণ

উপাদানগুলি পারস্পরিক নির্ভরতার সূত্রে গাঁথা। প্রত্যেক জীব স্বীয় প্রজাতির সাথে বাঁধা আবার বৃহত্তরভাবে বিভিন্ন প্রজাতির সাথেও বাঁধা।[৬৮]

অর্থাৎ বৌদ্ধ ধর্মে কোন জীব বা বস্তুকে স্বয়ংসিদ্ধ, সার্বভৌম, শ্রেষ্ঠতম বলা যাবে না। তারা একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। কেউ কারও অধীন নয় বরং সমমর্যাদাসম্পন্ন। এ ধরণের পারস্পরিক নির্ভরতার কারণে বৌদ্ধদর্শনে কার্যকারণ সম্পর্কের অন্য একটি বিশেষ দিক হল কর্মবাদ। কর্মবাদ প্রতীত্যসমুৎপাদেরই একটি ভিন্নরূপ মাত্র। কর্মবাদ অনুযায়ী মানুষকে তার কৃতকর্মের ফল অবশ্যই ভোগ করতে হবে। যে যেমন কর্ম করবে সে তেমন ফল ভোগ করবে। জীবজগৎ ও প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে যা কিছু প্রতিনিয়ত ঘটছে তার সবই কর্মফলের পরিণতি। বুদ্ধের এ সংক্রান্ত বাস্তুতন্ত্রীয় (Ecological) চিন্তাধারা কয়েকটি নৈতিক ও তাত্ত্বিক ধারণার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এগুলো হল: প্রতীত্যসমুৎপাদ– পারস্পরিক নির্ভরতার শর্ত, কর্ম– প্রতিটি কাজের অবশ্যই কারণ আছে, দুঃখ– দুঃখ অতৃপ্ত বাসনা, ধর্ম– পারস্পরিক কর্তব্য পালন, ও শীল– সদস্যগণের চর্চা, পাপের দমন, অনুশাসন।[৬৯]

বৌদ্ধ পরিবেশবিদরা মনে করেন দুঃখ সম্পর্কে সকলের সমান সচেতনতা থাকলেই সকল জীবের প্রতি করুণা উৎসারিত হবে। ধম্মপদে বলা হয় কোনো জীবের ক্ষতি নয় বরং তাদের মঙ্গল কামনা করা উচিত। মাতা যেমন প্রাণ দিয়েও পুত্রকে রক্ষা করেন, তেমনি সকল প্রাণীর প্রতি দয়া থাকবে। বিভিন্ন নিকায়গুলির সুত্তে জীবের (উদ্ভিদ ও প্রাণীর) প্রতি মৈত্রী ও করুণার কথা বলা হয়েছে। যেমন, অঙ্গুত্তর নিকায়ে বলা হয়েছে,

How astonishing it is, that a man should be so evil as to break a branch off the tree, after eating his fill. [৭০]

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন মানবকেন্দ্রিকতার ঊর্ধ্বে উঠে বিশ্বের সবকিছুর মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরতার মাধ্যমে ঐক্য স্থাপন করার চেষ্টা করে। তাছাড়া বৌদ্ধ পরিবেশবিদদের পারস্পরিক নির্ভরতা ও কার্যকারণ সম্পর্কের মধ্যে আধুনিক বাস্তুতন্ত্রীয় ধারণার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। কেননা বাস্তুতন্ত্র ইকোস্ফিয়ার (Ecosphere) এর সকল মানব ও অমানব সত্তাকে একই সূত্রে আবদ্ধ করে। এক্ষেত্রে বুদ্ধের পরিবেশ ভাবনা ও বাস্তুতন্ত্রীয় দর্শন নিয়ে বলা যায়– The Buddhist environmental Philosophy is a shift from ego-centric stance to an eco-centric orientation.[৭১]

৪.৫ জৈনধর্ম

উৎপত্তির প্রাচীনতার দিক থেকে জৈনধর্মকে বৈদিক ধর্ম হয়ত বলা যায় না কিন্তু আর্যধর্ম অবশ্যই বলা যায়। কারণ ভারত উপমহাদেশে বসতি স্থাপন করার সময়কাল থেকে আর্য সংস্কৃতির মধ্যে দুটি পরস্পর বিরোধী ধারা বিদ্যমান থাকতে দেখা যায়। এর একটি হল বেদভিত্তিক সংস্কৃতি, অপরটি হল বেদবিরোধী সংস্কৃতি। বৌদ্ধদর্শন এবং জৈন চিন্তাধারা বেদবিরোধী বা নাস্তিক্যবাদী সংস্কৃতির বাহক।

জৈনধর্ম মানুষ ও পরিবেশের সম্পর্ক নিয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ধর্মমত প্রকাশ করেছে। জৈন বিবর্তনবাদে বলা হয়েছে যে, সকল আত্মাই সমান। তবে আশ্রয় এর তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন শরীরীরূপে তার প্রকাশ ঘটে। জৈন দার্শনিকরা সকল বস্তু ও প্রাণীকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করেন। প্রথমত সমস্ত বস্তুকে ছয়টি ভাগে ভাগ করেন। ১) চেতনা ২) বস্তু ৩) ধর্মাষ্টিকায় ৪) অধমাষ্টিকায় ৫) দেশ ও ৬) কাল। সকল প্রাণীকে আবার ছয়টি ভাগে ভাগ করেছেন। ১) মৃত্তিকাশরীরী ২) সলিলশরীরী ৩) বায়ুশরীরী ৪) অগ্নিশরীরী ৫) উদ্ভিদ ও ৬) প্রাণী।[৭২]

জৈনদর্শনে বিশ্বের দুপ্রকারের উপাদানের কথা বলা হয়েছে জীব ও অজীব। যা আধুনিক বাস্তবিদ্যার সজীব (Biotic) ও অজীব (Abiotic) এর সমার্থক। তারা সজীব সত্তাকে বিচিত্র ও জটিল শক্তির এক লীলাভুমি মনে করেন।[৭৩]

জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর মানুষকে সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন এবং বলেছেন মানুষ যেহেতু সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব তাই সজীব ও অজীব সকল বস্তুনিচয়ের সাথে ভাল আচরণ করা তাদের নৈতিক দায়িত্ব। জীবন ও প্রকৃতির মধ্যে যে সম্পর্ক আছে, শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে মানুষের একটি অনস্বীকার্য দায়িত্ব থেকে যায়। তিনি আরও বলেন, যিনি তরুলতা, উদ্ভিদ ইত্যাদির ধ্বংসের ফলে উদ্ভূত ক্ষয়ক্ষতির আশু ও সুদূরপ্রাসারী পরিণাম অনুধাবন করতে পারেন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেন। জৈন ঐতিহ্যের এ ধারা জৈনধর্মকে পরিবেশের সাম্য ও পরিবেশ সংরক্ষণের আধার করে তুলেছে।

'জৈন' শব্দের অর্থ হল যিনি জিনের শিষ্য বা অনুচর। অর্থাৎ যিনি হিংসা, ঘৃণা, আসক্তির মতো মানসিকতাকে জয় করে মনের উন্নত পর্যায়ে উন্নীত হতে পেরেছেন।[৭৪] জৈনধর্মে প্রথম থেকেই সর্বজীবের প্রতি অহিংসার কথা গভীরভাবে বলা হয়েছে। যে পঞ্চমহাব্রত জৈন ধর্মালম্বীদের অনুসরণ করতে বলা হয়েছে তার প্রথমটিই হল অহিংসা। জীবকে হিংসা করো না, জীবকে আঘাত করো না; সর্বজীবের প্রতি সহিষ্ণু হতে হবে। মুদ্রার অপর পিঠের মতো অহিংসার অপর পিঠ হল দয়া, সর্বজীবে

দয়া করা। সমাজ ও প্রকৃতির ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য সর্বজীবে সমদৃষ্টি ও দয়ার শিক্ষা পাঠ আবশ্যক যা জৈনধর্মে প্রাথমিকভাবেই দেয়া হয়েছে।

জৈনধর্মে কাউকে আঘাত বা হত্যা করা থেকে বিরত থাকার কথা বারবার বলা হয়েছে। জৈনধর্মগ্রন্থ দশ-বৈ-কালিকাসূত্রে উল্লেখ আছে, "সর্বে জীবা ভি ইচ্ছন্তি জীবিয়াম মরিজ্জিয়ুম। তমহা পানি বহস ঘোরং নিগ্গান্থা বজয়ন্তি নামং।"[৭৫]

অর্থাৎ জৈন মতে বেঁচে থাকার জন্য সকল প্রাণীকে পরস্পরের ওপর কোনো না কোনোভাবে নির্ভরশীল থাকতে হয়। তাই শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে মানুষের এ প্রাণের ধারাকে অব্যাহত রাখা এক গুরু দায়িত্ব। বাঁচো ও বাঁচতে দাও জৈনধর্ম এ তত্ত্বে বিশ্বাসী। তাই তারা যজ্ঞে পশুবলি নিন্দনীয় বলে বিবেচনা করেছেন। পশুদের নির্যাতন, তাদেরকে প্রয়োজন মতো খাবার ও পানীয় না দেওয়াকে গর্হিত আচরণ বলে মনে করা হয়। আহার হিসেবে কোনো প্রাণীকে শিকার করাকে নিষেধ করেছেন; শাকাহারী হবার পরামর্শ দিয়েছেন। জৈনচর্চায় বেঁচে থাকার প্রয়োজনে প্রকৃতি থেকে, পরিবেশ থেকে বাঁচার উপাদান এমনভাবে সংগ্রহ করতে হবে যেমন মৌমাছিরা ফুলের কোন ক্ষতি না করে তার থেকে মধু সংগ্রহ করে। জৈনধর্ম মতে আহারের জন্য প্রাণীহত্যা করলে বাস্তুতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্থ হবে। এমনকি কোন প্রাণীর চিরতরে বিলুপ্তির সম্ভাবনাও থাকতে পারে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, ব্রিটিশ ও ফরাসি ঔপনিবেশিকরা নির্বিচারে ডোডোপাখি মেরে ভক্ষণ করার কারণে ডোডোপাখি পৃথিবী থেকে চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যায়। তবে দিগম্বর জৈনাচার্য অমৃতচন্দ্র ও তাঁর পরবর্তী জৈনাচার্য অমিতগতি সার্বিক অহিংসার বিরুদ্ধে যে সব যুক্তি দেখানো হয়েছে সেগুলো খন্ডন করেন। সার্বিক অহিংসার বিরুদ্ধে যুক্তি দেখানো হয় যে, বাঘ, সাপ, বিচ্ছু ইত্যাদি অনিষ্টকারী ও হিংস্র জীবদের নিধন করা উচিত, তাহলে অন্য জীবেরা রক্ষা পাবে। কিন্তু জৈনাচার্য অমিতগতি প্রমুখেরা এ যুক্তির অসারতা প্রমাণ করে বলেন, তথাকথিত হিংস্র প্রাণী নির্মূল করার কোনো অর্থ হয় না। এটা অনেকটা একটা বড় গাছকে আরও বড়ো করার জন্য তার ডালপালা ছেটে দেবার মতো। বাঘ হরিণ খায়, গরু-ছাগলও খায় এবং যখন নিজের এলাকায় খাদ্যের অনটন হয় তখন মানুষও খায় । অতএব, দেখলেই মেরে ফেলো-এ ধরণের যুক্তি নির্বোধের যুক্তি। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে বাঘ হরিণ খেয়ে হরিণের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে। নতুবা হরিণের সংখ্যা বেড়ে গিয়ে বাস্তুতন্ত্র বিপর্যস্ত হবে। প্রকারান্তরে মানুষের জন্য বাসযোগ্য পৃথিবী গড়ে তোলা সম্ভব হবে না।

বস্তুতঃ, জৈনধর্মে আমরা আধুনিক বাস্তুতন্ত্র বলতে যা বুঝি তার সকল প্রসঙ্গগুলি পরিষ্কারভাবে নেই। তবে এখানে অহিংসা ও তার থেকে উদ্ভূত জীবসংরক্ষণ ও জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণের প্রসঙ্গটির স্পষ্ট

উল্লেখ আছে। জৈনোচার্যদের উপদেশ ও অনুশাসনের মধ্যে বাস্তুতন্ত্রের আধুনিক ধারণার বেশ কিছু মিল খুঁজে পাওয়া যায তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাছাড়া মানুষকে সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে নৈতিক দায়িত্ব সম্পন্ন হয়ে প্রকৃতির সকল সত্তার প্রতি সমদৃষ্টি ও দয়ার কথা বলা হয়েছে যা মূলত জীব অস্তিত্ব তথা মানব অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার অন্যতম হাতিয়ার।

উপরের আলোচনা থেকে গভীরভাবে দৃষ্টি দিলে উপলব্ধি করা যায় যে, মানুষ সম্পর্কে ইসলাম, ইহুদি ও খ্রিষ্টান ধর্মের ধারণা প্রায় কাছাকাছি। তিনটি ধর্মই বলে যে, আল্লাহ তা'য়ালার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বা আশরাফুল মাখলুকাত হচ্ছে মানুষ। মানুষকে আল্লাহ পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে সৃষ্টি ও প্রেরণ করেছেন। কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টিকর্তা মানুষকে এত জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে বিশেষণ দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, তা তিনিই ভালো জানেন। তবে পৃথিবীর প্রাকৃতিক সুন্দরের সাথে মানানসই এবং মানব ও পরিবেশ কল্যাণ-বান্ধব কর্ম ও পরিকল্পনা গ্রহণ করে পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশকে আরও সুন্দর ও বাসযোগ্য করার জন্য সন্দেহাতীতভাবে মানুষই সর্বোত্তম ও উপযুক্ত প্রাণী।

তথ্যনির্দেশ

১. C.J. Ducasse, *A Philosiphical Scrutiny of Religion*, The Ronald Press company, NewYork, p.7

২. আল কুরআন, ৫: ৩২

৩. আল-মুজামুল ওয়াসিত, পৃষ্ঠা-৭৬৮

৪. আল কুরআন, ৯৫: ১-৪

৫. সহীহ হাদীস সংকলন বুখারী শরীফ, হাদিস নং-৫৮৭৩, পঞ্চম খন্ড, পৃষ্ঠা.২২৯৯; সহীহ হাদীস সংকলন মুসলীম শরীফ, হাদিস নং ৬৮২১, অষ্টম খন্ড, পৃষ্টা-৩২

৬. আল কুরআন, ৪০:৬৮

৭. Abdullah Yusuf Ali ,*The meaning of he Holy Quran* , P.1222

৮. আল কুরআন, ২:২৯

৯. আল কুরআন, ৩১:২০

১০. আল কুরআন, ২:৩৪

১১. আ-আলুসী, রুহুল মাআ'নী, খন্ড ৮, পৃ. ১৫১

১২. আল কুরআন, ১৭: ০৭

১৩. আল কুরআন, ৯৫: ৪

১৪. আল কুরআন, ১৭: ৭০

১৫. আল-কুরআন, ৭: ৭৪

১৬. আল কুরআন, ৩১: ২০

১৭. আল কুরআন, ২২: ৬৫

১৮. আল কুরআন, ২:২৯

১৯. আল কুরআন, ১১৪:১-৩

২০. আল কুরআন, ১৬: ৮০

২১. তিরমিযী, সুনানুত-তিরমিযী, কিতাবু, সিফাতিল-কিয়ামা ওয়ার রাকাইক ওয়াল ওয়া, হাদীস নং - ২৩৫২, দারুল ফিকার, বৈরুত, ১৯৮৩ইং

২২. তিরমিযী, প্রাগুক্ত, কিতাবুল-বিররে ওয়াস-সিলা, হাদিস নং-১৮৪৭

২৩. নাসাঈ, সুনানুন নাসাঈ, কিতাবুদ-দ্বহায়া, হাদীস নং- ৪৩৭০। আহমাদ, মুসনাদিল কুফিয়িন, হাদিস নং-১৮৬৫১।

২৪. আল কুরআন, ২:২০৫

২৫. আল কুরআন, ২:২২

২৬. আল কুরআন, ১৬:১৫

২৭. আল কুরআনঃ ১৪:৩২

২৮. Scientific Indications in the Holy Quran, (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। প্রকাশকাল ১৯৯০ খ্রিঃ পৃ.২৩৮-২৪০ এবং ৪৫-৭৪, সূরা নাহলের ১৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে)

২৯. আল কুরআন, ২১:৩১

৩০. আল কুরআন, ১৬:১৫

৩১. মোহাম্মদ আবুল কাসেম মজুমদার, *পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ইসলাম*, অগ্রপথিক, জুলাই,২০০০, পৃ.১০৬-১০৭

৩২. A.A. Macdonell, *Lectures on comparative Religion*, p.1

৩৩. ডাঃ এন.সি বোস, *কোরআন বাইবেল ও বিজ্ঞান*, জোনাকী প্রকাশনী, ২০১০,পৃ. ৪৮

৩৪. John Passmore, Man's Responsibility for Nature:Ecological problems and western Traditions, Duckworth, London,1974, p.8

৩৫. বাইবেল, আদিপুস্তক, ২:২৬-২৭। উল্লেখ্য যে, এ অধ্যায়ে ব্যবহৃত বাইবেলের উদ্বৃতিসমূহ বাংলাদেশ সোসাইটী, ১৯৯০ থেকে নেওয়া হয়েছে।

৩৬. বাইবেল ,আদি পুস্তক, ১:২৮

৩৭. বাইবেল, লূক, ৬:১-৫

৩৮. বাইবেল, আদি পুস্তক, ৬:১৮-২২

৩৯. বাইবেল, আদি পুস্তক, ৯:১-৪

৪০. বাইবেল, আদি পুস্তক, ১:২৯

৪১. Morttrag. Lan L... *Design with Nature*, Doubleday & Company. Inc. New York, 1969: (*গবেষণা পত্রিকা*, ইমাম মুহাম্মদ ইবনু সা'উদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব: ১৪১৫ হিঃ) ত্রয়োদশ সংখ্যা, পৃ. ২৬-৩০।

৪২. Lynn White, *The Historial Roots of our Ecological Crisis*, Science, vol.155, 1967, p.1205

৪৩. White Lynn, (1967), Ibid, pp.1203-1207

৪৪. Ibid.

৪৫. কালীপ্রসন্ন দাস, *পরিবেশ দর্শন- মানবকেন্দ্রিকতাবাদ ও পরিপোষক উন্নয়ন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৬৭

৪৬. ঋগ্বেদ, ৪/৫৭/৪

৪৭. ঋগ্বেদ, ৪/৫৭/৩

৪৮. ঋগ্বেদ, ৪/৫৭/৫

৪৯. ঋগ্বেদ, ১০/১০১/৫

৫০. এক দ্রোন আধুনিক মাপে প্রায় তিরিশ লিটার

৫১. ঋগ্বেদ, ১০/১০১/৭

৫২. ঋগ্বেদ, ৭/৬২/৫

৫৩. সামবেদ, উত্তরার্চিক, পঞ্চম অধ্যায়, পঞ্চম খন্ড, মন্ত্র ৫১৬

৫৪. শুভেন্দু গুপ্ত, প্রাচীন ভারতে পরিবেশ চিন্তা,সাহিত্য সংসদ,২০১২, পৃ. ৪৮

৫৫. সাম, উত্তর, ৫/৫/৫১৮

৫৬. শুক্লযর্জবেদ, ১২শ অধ্যায়, মন্ত্র ৬৭-৬৯

৫৭. শুক্লযর্জুবেদ, ১২শ অধ্যায়, মন্ত্র ৯৫

৫৮. অথর্ববেদ, দ্বাদশ খন্ড, প্রথম অনুবাক,তৃতীয় ও চতুর্থ সূক্ত

৫৯. অথর্ববেদ, ১২/১/৫

৬০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'তপোবন' *রবীন্দ্র রচনাবলী*, শতবার্ষিকী সংস্করণ, একাদশ খন্ড, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫৮৯

৬১. অথর্ববেদ, ১২/১/৫

৬২. প্রকৃতির সর্বত্রই আত্মা বিরাজিত এবং সমগ্র বিশ্বজগতই জীবন্ত যিনি এ তত্ত্বে বিশ্বাসী তাকে সর্বপ্রাণবাদী বলা হয়।

৬৩. রণবীর চক্রবর্তী, *প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে*, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৪০৯ বঙ্গাব্দ,পৃ.৭৫

৬৪. শুভেন্দু গুপ্ত, *প্রাচীন ভারতে পরিবেশ চিন্তা,সাহিত্য সংসদ*, ২০১২, পৃ. ১১৯

৬৫. ঈশান চন্দ্র ঘোষ, *জাতকমন্ডলী*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত, ১৯৭৮

৬৬. 'যোজন' প্রাচীন ভারতের দূরত্বের একক। বিষ্ণুপুরাণ এর ষষ্ঠ খন্ডের প্রথম অধ্যায় বিভিন্ন পরিমাপ এর কথা বলা হয়েছে। সেখানে উল্লেখ আছে, ১ যোজন = ৯.০৯ মাইল

৬৭. মজ্জিম নিকায়, খন্ড: ২, পৃ.৩২

৬৮. কোনাল্ড ডবলিউ স্বোয়েরার, *বুদ্ধিজম অ্যান্ড ইকোলজি: চ্যালেঞ্জ এন্ড প্রমিস*, হার্ভাড ফোরাম অব রিলিজিয়ন অ্যান্ড ইকোলজি, ১৯৯৮

৬৯. শুভেন্দু গুপ্ত, *প্রাচীন ভারতে পরিবেশ চিন্তা*,সাহিত্য সংসদ, ২০১২, পৃ.১১৬

৭০. অঙ্গুত্তর নিকায়, সম্পাদনা এইচ মরিস ও এইচ হার্ডি, খন্ড-৩, পালি টেক্সট সোসাইটি, লন্ডন, ১৯০০, পৃ. ২৬২

৭১. 'মিডল লেংন্থ সেয়িংস' পদ্মশী ডি সিলভার এনভায়রনমেন্টাল ফিলসফি অ্যান্ড এথিকস ইন বুদ্ধিজম এ উল্লিখিত, নিউইয়র্ক স্টেটমার্টিন প্রেস, লন্ডন, ১৯৯৮,পৃ.৩১

৭২. শুভেন্দু গুপ্ত, *প্রাচীন ভারতে পরিবেশ চিন্তা*, সাহিত্য সংসদ, ২০১২, পৃ. ১১১

৭৩. পূর্বোক্ত, পৃ.১১১

৭৪. আর.কে ভট্টাচার্য, এ সামারি অব জৈন ফিলসফি, ১৯৬৭, পৃ. ৩০

৭৫. দশ-বৈ-কালিকাসূত্র, গাঁথা ২১৯2017.

উপসংহার

মানবজাতির কল্যাণই কি আমাদের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত নাকি প্রকৃতির প্রতিও আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে। পরিবেশ নীতিদার্শনিকগণ বর্তমানে এ প্রশ্নগুলোর প্রেক্ষিতে দুটি প্রতিক্রিয়াশীল দলে বিভক্ত। এদের মধ্যে একদল মানবকেন্দ্রিক হিসেবে পরিচিত যারা সমস্ত নৈতিক বিষয়কে মানুষের স্বার্থের ভিত্তিতে দেখে। অন্যদল হল অ-মানবকেন্দ্রিক যারা কেবল মানুষ নয় বরং অ-মানব প্রাকৃতিক সত্তাসমূহকেও নৈতিক দিক থেকে বিবেচনা করে। এ মতানুসারে প্রকৃতির ক্ষুদ্র ব্যাকটেরিয়া থেকে শুরু করে মহাসাগর পর্যন্ত সবকিছুর স্বতঃমূল্য আছে। প্রথমপক্ষ প্রকৃতির উপরে মানুষের আধিপত্যকে কেবল বাস্তবতার নিরিখে নয় বরং সভ্যতার আবশ্যক শর্ত হিসাবে বিশ্বাস করে চলছে। দ্বিতীয়পক্ষ এ আধিপত্যবাদীদের আদর্শকে চ্যালেঞ্জ জানায় এবং প্রকৃতির অধিকারকে মানুষের নিয়ন্ত্রণ থেকে বাঁচানোর উপর গুরুত্ব আরোপ করে। এ অভিসন্দর্বে আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি যে মানুষ হিসেবে মানবকেন্দ্রিকতাবাদ সমর্থন করা যৌক্তিক ও ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা এবং সেটা সবল অর্থে নয় বরং দুর্বল অর্থে। অর্থাৎ সবল অর্থে মানবকেন্দ্রিকতাবাদ পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে হুমকিস্বরূপ হতে পারে কিন্তু দুর্বল অর্থে মানবকেন্দ্রিকতাবাদ পরিবেশ রক্ষায় এবং এ পৃথিবীকে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারে। তাছাড়া আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে এ সংক্রান্ত আলোচনাসহ দেখানোর চেষ্টা করেছি যে, অ-মানবকেন্দ্রিক মতবাদ অবৈজ্ঞানিক, অবাস্তব এবং আবেগ নির্ভর। সুতরাং এটা বলা যায় যে এ গবেষণাপত্রটি সবল মানবকেন্দ্রিকতাবাদ ও অ-মানবকেন্দ্রিকতাবাদদের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ। এটি পরিবেশগত মূল্যবোধকে উপলব্ধি করার এমন একটি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ উপায় যা প্রকৃতির সাথে মানুষের সম্পর্কের অন্তর্নিহিত মূল্য স্থাপন করে। এ ধরণের পরিবেশ নৈতিকতা একদিকে যেমন প্রকৃতির উপযোগিতাকে প্রাধান্য দেয় অন্যদিকে প্রকৃতির প্রতি স্বেচ্ছাচারী মূল্যায়নকে এড়াতে পারবে যার চূড়ান্ত পরিনতি হবে বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য পৃথিবী।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দিকে জন লক, জ্যা জ্যাক রুশো, টমাস জেফারসনের মতো রাজনৈতিক দার্শনিকদের লেখায় অধিকারের আধুনিক ধারণার রূপটি পরিলক্ষিত হয়।[১] তারা বহুদিন ধরে প্রচলিত প্রাচীন আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন। আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে মুক্তি ঘোষণা এবং আমেরিকান কৃষ্ণাঙ্গদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে সাতাশি বছরের ব্যবধান ছিল।[২] দুই শতাব্দীর বেশি সময় লাগলেও এ ধারণাগুলি দ্বারা আমরা এখনও প্রভাবিত হচ্ছি। এখনও নারীর উপর পুরুষের আধিপত্য, গরীবের উপর ধনীর, কৃষ্ণাঙ্গদের উপর শ্বেতাঙ্গদের, শিশুদের উপর

বড়দের, এক জাতির উপর অপর জাতির এবং সাম্প্রতিককালে প্রকৃতির উপর মানুষের যে আধিপত্য এগুলো নিয়ে আমরা ভাবছি। আলবার্ট শোয়েটজার একবার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে মানুষের নৈতিক চেতনা সমস্ত বর্ণের মর্যাদা বাড়নো থেকে পুরো সম্প্রদায়কে লালন করতে প্রসারিত হতে পারে।[৩] তাই মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবেশের জন্য ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে বলে কিছু পরিবেশ দার্শনিক মনে করেন। যদিও পরিবেশ দর্শনে মানবকেন্দ্রিকতাবাদকে নিয়ে বহু সমালোচনা হয়ে থাকে। কিন্তু মানবকেন্দ্রিক যুক্তিগুলোই বাস্তব জগতের পরিবেশগত নীতিমালার সিদ্ধান্তগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এটা পরিষ্কার যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে পরিবেশভিত্তিক যে আন্দোলনগুলো হয়েছে সেখানে মানবকেন্দ্রিক যুক্তিগুলোই বেশি সফল হয়েছে। যার কারণে সাধারণ জনগণ উপলব্ধি করতে শুরু করে যে, প্রাকৃতিক পরিবেশের যে বিপর্যয় হচ্ছে তা মানুষের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা সর্বোপরি বেঁচে থাকার জন্য হুমকিস্বরূপ।

বিগত কয়েক সহস্রাব্দে জনসংখ্যা এতো বিস্তৃত হয়েছে যে তারা এ পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি রূপের পরিবর্তন করেছে। যদিও পৃথিবীর বাস্তুসংস্থান সর্বদা স্বাভাবিকভাবেই বিবর্তিত হচ্ছে। গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, সারা পৃথিবীজুড়ে বেশকিছু প্রজাতি বিলুপ্তি হয়েছে। এ কথা ঠিক যে অনেক প্রজাতি প্রাকৃতিকভাবেও বিলুপ্ত হয়েছে। যেমন, আজ থেকে পয়ঁষট্টি মিলিয়ন বছর পূর্বে ডাইনোসর প্রজাতি বিলুপ্ত হয়েছে যেখানে মানুষের কোন ভূমিকা ছিল না।[৪] কিন্তু সেই বিলুপ্তির পরিমান নগন্য। উদাহরণস্বরুপ, একটি প্রজাতি স্বাভাবিকভাবে বিলুপ্ত হতে গড়ে দুই থেকে তিন বছর সময় লাগে। আমেরিকার প্রখ্যাত জীববিজ্ঞানী ও প্রকৃতিবাদী এডওয়ার্ড অসবর্ন উইলসন এর মতে, এখন প্রতিদিন ১০০ থেকে ১৪০টি প্রজাতি অথবা বছরে ৪ থেকে ৬ হাজার প্রজাতি বিলুপ্ত হচ্ছে। এবং এ বিলুপ্তির পেছনে প্রকৃতির উপর মানুষের অযাচিত হস্তক্ষেপকেই তিনি দায়ী করেছেন। জনসংখ্যার বৃদ্ধির ফলে মানুষের প্রয়োজনকে গুরুত্ব দিয়ে পরিবেশের সম্পদগুলোর উপর অবাধ হস্তক্ষেপ চলছে। পরিবেশবিদরা হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে, পরিবেশগত সমস্যা যেমন- বৈশ্বিক উষ্ণতা, প্রজাতির বিলুপ্তি, তথা বাস্তুতন্ত্রের প্রক্রিয়াগুলো ব্যাহত হওয়ার ক্ষেত্রে মূলত সমাজের প্রচলিত কিছু সাধারণ রীতি-নীতিই দায়ী। যদিও এ সমস্যাগুলির অধিকাংশই বর্তমান মানবগোষ্ঠীর জীবনযাপনের জন্য মারাত্মক হুমকির সৃষ্টি করেছে। তবে এটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আরও বেশি তীব্রতর হয়ে উঠবে। এসব দিক বিবেচনায় পরিবেশ দার্শনিকগণ এমন মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলেন যা পরিবেশকে সুরক্ষার মাধ্যমে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুন্দর, বাসযোগ্য ও টেকসই পৃথিবী উপহার দিবে। লক্ষ্য করলে দেখা যায় কিছু মানবকেন্দ্রিকতাবাদী দার্শনিক আছেন যারা তথাকথিত কর্ণকপিয়ান (Cornucopian) দের দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করে। কর্ণকপিয়ানরা পৃথিবীতে

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এবং সীমিত সম্পদের ফলে যে যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে পারে তা অস্বীকার করেন। তারা দাবি করেন যে, যদিও সম্পদের সীমাবদ্ধতা ও জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে অতিরঞ্জিত করা হয় তারপরও মূলত এ সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিকে উন্নত করতে হবে। এক্ষেত্রে তারা প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা বা তার শোষণ সীমিত করার জন্য কোন আইনী নিয়ন্ত্রণ বা নৈতিক প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন নি। মূলত এ ধরণের দৃষ্টিভঙ্গি সবল মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি যা কেবল মানুষকে নৈতিক অবস্থানের জন্য স্বীকৃতি দেয় পরিবেশ বিপর্যয়ের জন্য দায়ী। পাশ্চাত্য দর্শনে এ ধরণের মানবকেন্দ্রিকতাবাদের প্রভাব থাকলেও এটি অনেক পরিবেশ নীতিবিদদের দ্বারা যথেষ্ট আক্রমণের শিকার হয়েছে। এ জাতীয় চিন্তাবিদরা দাবি করেন যে, নীতিবিদ্যাকে মানুষের বাইরেও প্রসারিত করতে হবে এবং নৈতিক অবস্থানকে প্রাকৃতিক জগতের সাথে মানিয়ে নেয়া উচিত। কেউ কেউ দাবি করেন যে, নৈতিকতার বিস্তার সংবেদনশীল প্রাণী, অন্যান্য জীব তথা বাস্তুতন্ত্রের সামগ্রিক সত্তা, নদী, প্রজাতি ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রসারিত করা উচিত। ফলে কিছু পরিবেশ নীতিবিদ পরামর্শ দিচ্ছেন যে, মানবকেন্দ্রিকতাবাদ ছাড়াই পরিবেশকে মূল্যায়ন করা সম্ভব। যদিও অনেক পরিবেশবাদী দার্শনিক নিজেদেরকে মানবকেন্দ্রিকতাবাদের তকমা থেকে দূরে রাখতে চান। কিন্তু আমরা এক্ষেত্রে বলতে চাই যে, বর্তমানে পরিবেশ নীতিবিদ্যায় মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত হচ্ছে। গতানুগতিক মানবকেন্দ্রিকতাবাদ মূলত সবল মানবকেন্দ্রিকতাবাদ যা অ-মানব প্রাকৃতিক সত্তাসমূহের উপর স্বেচ্ছাচারী শোষণ, কর্তৃত্বকে উৎসাহ দেয়। কিন্তু বর্তমানে নতুন ধরণের যে আলোকিত মানবকেন্দ্রিকতাবাদের উন্মেষ ঘটেছে তা পরিবেশ সুরক্ষায় ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে।

এ ধরনের আলোকিত মানবকেন্দ্রিকতাবাদ মূলতঃ দুর্বল মানবকেন্দ্রিকতাবাদ। এটা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, পরিবেশ নিয়ে আমাদের উদ্বেগ উৎকণ্ঠা বস্তুতঃ মানবজাতির স্বার্থের কথা চিন্তা করেই হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, পরিবেশ দূষণ আমাদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করছে, সম্পদ কমিয়ে দিয়ে আমাদের জীবনমানকে হুমকির সম্মুখীন করছে, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আমাদের বাসস্থান ঝুঁকির সম্মুখীন হচ্ছে, জীববৈচিত্র্য নষ্ট হওয়ার কারণে সৌন্দর্য্যের উৎস হারাতে শুরু করছে। ঠিক এখানেই দুর্বল মানবকেন্দ্রিকতাবাদী নীতিবিদ্যা দাবি করে যে, মানুষের মঙ্গল ও সমৃদ্ধির জন্য আমরা পরিবেশকে সম্মান করতে বাধ্য থাকি। মানুষকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনা ছাড়াও এ ধরণের মানবকেন্দ্রিকতাবাদ পরিবেশ নীতিবিদ্যার নৈতিক অবস্থানের প্রসারণে ভূমিকা পালন করছে। এ অবস্থান কেবল অ-মানব প্রাকৃতিক জগতেই নয়, বরং এমন মানুষ যারা এখনও এ ধরিত্রীর বুকে আসেনি অর্থাৎ ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নিয়েও চিন্তা করে। তারা মনে করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নিয়ে ভাবতে হবে কেননা জলবায়ু পরিবর্তন এবং সম্পদ হ্রাসের মতো অনেক পরিবেশগত সমস্যা ভবিষ্যতের মানুষকে বর্তমানের মানুষের চেয়ে অনেক

বেশি প্রভাবিত করবে। তাছাড়া এটা স্পষ্ট যে, সমসাময়িক মানুষের কথা বিবেচনা করে আমরা যে সকল কার্য এবং নীতিমালা তৈরী করে থাকি তার বড় একটা প্রভাব ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উপর পরিলক্ষিত হবে। এ তথ্যের আলোকে কিছু দার্শনিক ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি দায়বদ্ধতার উপর তাদের পরিবেশগত নৈতিকতা প্রতিষ্ঠা করেছেন। অবশ্যই একথা বলা যায় যে, ভবিষ্যৎ মানুষের নৈতিক অবস্থান রয়েছে। যদিও কিছু দার্শনিক ভবিষ্যতের মানুষের পক্ষে এমন অবস্থানকে অস্বীকার করেন এবং দাবি করেন যে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কোন নৈতিক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত নয়। কেননা তারা পারস্পরিক বিনিময় করতে পারে না। সুতরাং আমরা তাদের জন্য কোন কাজ করলে বিনিময়ে তারা আমাদের জন্য কিছুই করতে পারে না। তবে অন্যান্য দার্শনিকরা এ যুক্তির প্রেক্ষিতে বলেন যে, সাধারণত মৃত ব্যক্তির প্রতি আমাদের দায়িত্ব আছে যদিও এক্ষেত্রে তাদের সাথে আমাদের কোন পারস্পরিক সম্পর্ক থাকে না। ঠিক তেমনি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতিও আমাদের দায়িত্ব রয়েছে। তাই কেউ কেউ স্বীকার করেন যে, যদিও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাদের জন্য কিছু করতে পারে না তারপরও পরবর্তী প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য পৃথিবী উপহার দেয়া আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। বিপরীতে কেউ কেউ দাবি করেন যে, সম্ভবত ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি আমাদের কোন বাধ্যবাধকতা নেই। কারণ কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে আমরা চিনি না অথবা তাদের প্রয়োজন সম্পর্কে আমরা জানি না। বৃটিশ দার্শনিক ডেরেক এন্থনি পারফিট (Derek Anthony Parfit, ১৯৪২-২০১৭) এটাকে অ-পরিচয় সমস্যা (Non-identity Problem) বলে অভিহিত করেন।[৫] এ সমস্যার মূল বিষয় হল রাষ্ট্রগুলো যে নীতিগুলো প্রণয়ন করবে তা নাগরিকদের চলাচল, শিক্ষা, কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলবে। ভবিষ্যতে যার অস্তিত্ব থাকবে তারা বর্তমানের মানুষের কার্যকলাপ দ্বারা প্রভাবিত হবে। তারা কে তা বোঝা যাচ্ছে না। তাছাড়া যেহেতু ভবিষ্যতের লোকেরা আমাদের কর্মকান্ডগুলোর সুবিধাগুলি গ্রহণের জন্য কোন নির্দিষ্ট সেট নেই, তাই আমরা কাকে নৈতিক অবস্থান দেব ? দ্বিতীয়ত, ভবিষ্যতের কোনও মানুষ কিভাবে বৈধভাবে অভিযোগ করতে পারেন যে, আমাদের পরিবেশগত ধ্বংসাত্মক নীতিগুলো দ্বারা তারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে ? এমনও হতে পারত আমরা যদি এ ধরনের নীতিমালাগুলো অনুসরণ বা প্রণয়ন না করতাম তাহলে তাদের অস্তিত্বও থাকত না। 'অ-পরিচয় সমস্যার' প্রতিক্রিয়া হিসাবে যুক্তি দেয়া হয় যে, ভবিষ্যতে কারা উপস্থিত থাকবে তা আমরা জানি না, তবে আমরা জানি যে কিছু মানুষের অস্তিত্ব থাকবে এবং তাদের স্বার্থও থাকবে। সমস্যার দ্বিতীয় দিক হিসেবে আমরা দাবি করতে পারি যে, যদিও ভবিষ্যত প্রজন্মগুলি তাদের অস্তিত্বের দ্বারা আমাদের পরিবেশগতভাবে ধ্বংসাত্মক নীতিগুলি থেকে কোন কোন ক্ষেত্রে উপকৃত হবে তবুও সেই উপকার তাদের কাম্য নাও হতে পারে।

সর্বোপরি, কারো দ্বারা সামগ্রিকভাবে উপকৃত হওয়া সত্ত্বেও কোন বিশেষ ক্রিয়া দ্বারা কারও ক্ষতি করা যায় না। এক্ষেত্রে উদাহরণস্বরূপ বলা যায়– একটি ফ্লাইটে একজন কৃষ্ণাঙ্গ মানুষকে নিতে অস্বীকার করেছিল। কিন্তু পরবর্তীতে প্লেনটি ক্র্যাশ করে। এ কৃষ্ণাঙ্গ মানুষটি ফ্লাইটে উঠার সুযোগ না পাওয়ার ফলে বেঁচে গিয়ে উপকৃত হওয়া সত্ত্বেও সে কি বিমানসংস্থা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়নি ?

তাছাড়া ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নিয়ে আমাদের অজ্ঞতা রয়েছে। কেবল তাদের পরিচয় নিয়েই আমাদের তথ্যের অভাব আছে শুধু তা-ই নয় বরং তাদের একটি সুন্দর জীবন সম্পর্কে আমাদের কোন ধারণা নেই। তারা কি ধরনের প্রযুক্তিগত অগ্রগতি সাধন করবে সে সম্পর্কেও কোন ধারণা নেই। এমনওতো হতে পারে ভবিষ্যতের মানুষ বর্তমান প্রজন্মের রেখে যাওয়া বিরল প্রজাতি, খনিজ সম্পদ ইত্যাদি পেয়ে সন্তুষ্টি না হয়ে কোন বিকল্প জ্বালানীর উৎস সন্ধান করে এবং সফলতাও পায়। এ জাতীয় বিষয়ে অজ্ঞতা ভবিষ্যত প্রজন্মের প্রতি আমাদের দায়িত্ববোধকে জটিল করে তোলে।

এ সম্পর্কিত সমস্যার জবাব দেওয়ার জন্য কিছু দার্শনিক যুক্তি দিয়েছিলেন যে, আমরা ভবিষ্যতের লোকদের সম্পর্কে সব কিছু জানি না, আমরা কেবল কিছু যুক্তিসঙ্গত অনুমান করতে পারি। উদাহরণস্বরূপ: রাষ্ট্রদার্শনিক ব্রায়ান ব্যারি (Brian Barry) যুক্তি দেখিয়েছেন যে, যা কিছু ঘটুক না কেন অথবা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রয়োজন সম্পর্কে যতই অনিশ্চিত হইনা কেন ভবিষ্যতের লোকদের কিছু মৌলিক চাহিদা যেমন খাদ্য, জ্বালানী, বায়ু, পানি, ন্যুনতম স্বাস্থ্য ইত্যাদি প্রয়োজন হবে।[৬] ব্যারি এইভাবে যুক্তি দেখান যে, আমাদের বাধ্যবাধকতাগুলি এ বিষয়টিই নিশ্চিত করে থাকে যে আমরা ভবিষ্যতের প্রজন্মকে তাদের মৌলিক চাহিদা মেটাতে বাধা দেব না। এর ফলে আমাদের দূষণ, সম্পদ হ্রাস, জলবায়ু পরিবর্তন এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির মাত্রা বিবেচনা করে নীতিমালার যথাযথভাবে সংশোধন করতে আমাদের প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করা উচিত। কারও কারও কাছে এটি রক্ষণশীল নীতি হিসাবে মনে হতে পারে, তবে এটা উল্লেখ করা দরকার যে, মানব সভ্যতার ইতিহাসে বেশিরভাগ সময়ই সমসাময়িকদের চাহিদা পূরণ হয়নি, ভবিষ্যত প্রজন্মের কথা না হয় বাদই দিলাম । এ দুর্ভাগ্যজনক সত্যটি আরও একটি সমস্যার দিকে ইঙ্গিত করে যা পরিবেশ নীতিবিদ্যায় মানবকেন্দ্রিকতাবাদকে মুখোমুখি হতে হবে। এখন প্রশ্ন হলো বর্তমান প্রজন্মের চাহিদা এবং স্বার্থগুলি অস্বীকার করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রয়োজন মেটানোর জন্যে রেখে দিলে বর্তমান প্রজন্মের প্রতি অবিচার হবে কি? আমরা কি ন্যায়সঙ্গতভাবে বর্তমান প্রজন্মের স্বার্থগুলোকে উপেক্ষা অথবা বঞ্চিত করতে পারি?

স্পষ্টতই, নৈতিক অবস্থানের সামান্যতম পরিবর্ধনের ফলে উত্থিত সমস্যাগুলি বাস্তব এবং কঠিন। এটি সত্ত্বেও বেশিরভাগ পরিবেশ দার্শনিক মনে করেন যে, এ জাতীয় মানবকেন্দ্রিক নীতিগুলি বেশি দূর যেতে পারে না এবং তারা মানুষের বাইরেও নৈতিক অবস্থানকে প্রসারিত করতে চায়। কিন্তু আমরা দাবি করি যে, এ জাতীয় মানবকেন্দ্রিক নীতগুলি অবশ্যই ইতিবাচক ফল বহন করে।

দুর্বল মানবকেন্দ্রিকতাবাদ যেখানে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বিষয়টি দেখে সেখানে সবল মানবকেন্দ্রিকতাবাদ কেবল বর্তমান সময়ের মানুষের চাহিদা রক্ষা করার চেষ্টা করে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে বর্তমান মানুষের চাহিদা পূরণের সাথে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চাহিদা সংরক্ষণে যদি সংঘর্ষ হয় তাহলে কি ঘটবে ? নরটন এই সংঘর্ষটি চিহ্নিত করেন।[৭]

অর্থনীতিবিদরা এক্ষেত্রে "Trade Off" নীতি ব্যবহার করেন। এই Trade off নীতি অনুসারে বর্তমান মানুষের স্বার্থকে ত্যাগ করে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য উপকার করতে হবে। কিন্তু সবল মানবকেন্দ্রিকতাবাদীরা প্রায়শই যুক্তি দেন যে, বর্তমান প্রজন্মের সুবিধার জন্য পরিবেশকে সর্বোচ্চভাবে আমাদের ব্যবহার করা উচিত। পাশাপাশি দেখা যায় যে কিছু অর্থনীতিবিদ দাবি করেন যে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি আমাদের কোন দায়বদ্ধতা নেই কারণ তাদের চাহিদা, চাওয়া-পাওয়া সম্পর্কে আমরা অবগত নই যার কারণে এগুলো প্রতিষ্ঠা করা খুব কঠিন। এই চিন্তার রেখাটি প্রথম আমেরিকান অর্থনীতিবিদ রবার্ট সলো (Robert Solow) প্রনয়ণ করেন এবং এটি "অজ্ঞতার সমস্যা' নামে পরিচিত যা মূলত ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা থেকে মুক্তি দেয়।[৮] সলো দাবি করেন যে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি আমাদের একমাত্র দায়বদ্ধতা হল বেঁচে থাকার উপকরণের মজুত বৃদ্ধি করা। তিনি মনে করেন ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কি চায় তা আমরা জানি না তাই বড় মাপের মূলধন বা মজুদ রেখে যাওয়াই তাদের জন্য কল্যাণকর।

যাই হোক, একটি বৃহৎ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমরা অবশ্যই ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষা করতে চাইবো। তাই সলোর দৃষ্টিভঙ্গিকে আমরা গ্রহণ করতে পারছি না। এ প্রসঙ্গে নরটন একটি বিষাক্ত টাইম বোমার উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন।[৯] ধরা যাক, এমন একটি বিষাক্ত টাইম বোমা আছে যা দেড়শ বছর ধরে পৃথিবীকে নিরাপদ রাখবে কিন্তু তারপরেই এটি বিস্ফোরিত হবে। সলো বলবে এক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি আমাদের কোন দায়বদ্ধতা নেই কেননা তাদের স্বার্থ সম্পর্কে আমরা অবগত নই। সম্ভবত তারা এই বিষাক্ত পরিবেশ থেকে নতুন কিছু উদ্ভাবন করবে যাতে করে তাদের জ্বালানি সংকট নিরসন হবে কিংবা দূরবর্তী গ্রহগুলো ব্যবহারের উপায় খুঁজে বের করবে। কিন্তু উপরোক্ত এ উদাহরণটি থেকে বেশিরভাগ মানুষই বিষাক্ত বোমা বিস্ফোরনকে চূড়ান্তভাবে

দায়িত্বজ্ঞানহীন মনে করবে। চূড়ান্তভাবে আমাদের স্বীকার করতে হবে মূল্য প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে স্থানান্তরিত হয়। নরটনের ভাষায়– inculcating certain values and for ensuring that those value are perpetuated in future generations.[১০]

নরটন আরো বলেন, আমাদের এখনও উচিত পরিবেশগত সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং এর মূল্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং প্রচার করা। সুরক্ষাবাদী নীতি এবং ধারণার মাধ্যমে নৈতিক বাধ্যবাধকতাবোধগুলো প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া যাতে করে তাদের মধ্যে পরবর্তী প্রজন্মের প্রতি ভালাবাসা, শ্রদ্ধা এবং যত্নের মনোভাব তৈরী হয়।[১১]

রেখাবিশিষ্ট পেঁচার উদাহরণে আমরা পেঁচাকে রক্ষা করতে চাই কারণ এটি বাস্তুসংস্থানে ব্যাপক অবদান রাখে ফলে এর অবদানমূলক মূল্য রয়েছে। কিন্তু কাঠ সংগ্রহকে আমরা সমর্থন করিনি কেননা মূল্য বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম উভয়ের জন্য সুবিধাজনক। পেঁচাকে পেঁচার জন্য রক্ষা করা হচ্ছে না বরং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম একটি সুন্দর, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর বাস্তুতন্ত্র পাবে এ জন্যই তাদেরকে টিকিয়ে রাখা হচ্ছে। তাছাড়া আমরা তাদেরকে রক্ষা করছি মানুষের সাংস্কৃতিক, নান্দনিক মূল্য এবং জীববৈচিত্র্যের দিক বিবেচনা করে।

আমরা দেখি যে, অ-মানবকেন্দ্রিকতাবাদের স্বতঃমূল্যের আদর্শটি বাস্তুতন্ত্রের স্বাস্থ্য সমস্যা সমাধানে ব্যবহার করা যায় না। তাছাড়া ক্যালিকট স্বতঃমূল্য ধারণাটি ব্যাখ্যার জন্য যে জৈব সহানুভূতির কথা বলেন তা ত্রুটিযুক্ত, বিভ্রান্তিকর এবং তাত্ত্বিকভাবে সাংঘর্ষিক। তাঁর অপেক্ষাকৃত সবল স্বার্থ ও অপেক্ষাকৃত দুর্বল স্বার্থের ভিত্তিতে মূল্য নিরূপনের মানদন্ড পরিবেশ ফ্যাসিবাদের কবলে পড়ে। নেলসনও ক্যালিকটের ন্যায় অ-মানব সত্তার স্বতঃমূল্যকে দাবি করেন। এক্ষেত্রে তিনি কার্বুলেটর এর মতো জিনিসগুলোর স্বতঃমূল্য দাবি করেন। তিনি বলেন যে, আমরা কার্বুলেটরকে যন্ত্রতুল্য মূল্যে মূল্যায়ন করি যেখানে এই কার্বুলেটরের প্রতি আমাদের নৈতিক বাধ্যবাধকতা আছে।[১২] কিন্তু এক্ষেত্রে বলা যায় কোনকিছুর স্বতঃমূল্য থাকা মানে এই নয় যে আমাদেরকে জোর করে তাদের উপর নৈতিক বাধ্যবাধকতা চাপিয়ে দেয়া হবে।

তাই আমরা পরিবেশ ফ্যাসিবাদ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য অ-মানবকেন্দ্রিকতার বিরুদ্ধে দাবি উপস্থাপনপূর্বক হারগ্রভের দুর্বল মানবকেন্দ্রিক স্বতঃমূল্যের অবস্থান, নরটনের দুর্বল মানবকেন্দ্রিক অবদানমূলক মূল্যের অবস্থান এবং হেওয়ার্ড এর দুর্বল মানবকেন্দ্রিকতাবাদকে গ্রহণ করাকেই শ্রেয় বলে মনে করছি।

ক্যালিকট ও আমেরিকান দার্শনিক লুইস ম্যামফোর্ড (Lewis Mumford,1895-1990) মানব প্রজাতির ঘনত্ব এবং তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলের সাথে যে অঞ্চলগুলো মানুষের বসবাস এবং নিয়ন্ত্রণ বা কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত তাদের মধ্যে একটি পার্থক্য তৈরী করেন।[১৩] যুক্তরাজ্যের নৃতাত্ত্বিক এবং দার্শনিক নাইজেল রেপুর্ট (Nigel Rapport)ও দাবি করেন যে, মানুষের বাসস্থান এবং জীববৈচিত্র্যকে ধ্বংস থেকে মুক্ত করার জন্য এবং অখন্ডতা রক্ষার জন্য জীববৈচিত্র্যের একীকরণ ও উন্নয়ন করতে হবে।[১৪] ক্যালিকট এবং ম্যামফোর্ড উভয়ই মনে করেন কিছু জায়গাতে বসবাসের জন্য টেকসই ব্যবস্থাপনা তৈরী এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করলে তা অন্যান্য অঞ্চলগুলোর পরিপুরক হিসেবে কাজ করবে। এক্ষেত্রে তারা অভয়ারণ্য বা জাতীয় উদ্যানের কথা বলেন।[১৫] তাছাড়া তারা ধারণা করেন যে, জনবহুল ও জনহীন স্থানগুলির বিভাজন স্বীকৃতী দেয় যে, সমস্ত জায়গাগুলিতে মানুষের বাস করা বা ব্যবহার করা উচিত নয়। যেসকল অঞ্চল মানবমুক্ত সেসকল জায়গার জীববৈচিত্র্য মানুষের জন্য সুফল বয়ে আনে। ফলে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, জীববৈচিত্র্যের এই ব্যবস্থাপনা অধিকতর নিরাপদ ও ফলপ্রসু। তাছাড়া যদি কেউ এ সিদ্ধান্তে আসে যে, কোন এলাকাকে মানব-মুক্ত করলে সেই এলাকার জীববৈচিত্র্যের আরও অখন্ডতা তৈরী হয় তবে এর অর্থ দাঁড়াবে বাস্তুসংস্থানগুলি মানুষের ব্যবহার মুক্ত করা নিজেদেরই লক্ষ্য হবে। কিন্তু আমরা মনে করি যে, এর ফলে বড় একটা সমস্যা তৈরী হবে। সেটা হল কোন বাস্তুসংস্থানই মানবমুক্ত হতে পারে না। যদি বাস্তুসংস্থানগুলিতে অখন্ডতা প্রয়োগ করতে গিয়ে মানুষকে বাদ দেয়া হয় তাহলে সেটা বাস্তবে সম্ভব হবে না। কেননা বিশ্বে সবচেয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিও মানুষের দ্বারা প্রভাবিত। যেমন এন্টার্কটিকার মতো সর্বাধিক নির্জন স্থানেও মানুষের বসবাস আছে। লিচ রিসকভস্কি (Lech Ryszkowski) এ বিষয়টি তুলে ধরে বলেন যে, পৃথিবীতে খুব কমসংখ্যক জায়গা আছে যা মানুষের দ্বারা প্রভাবিত নয়। বাস্তুসংস্থানের বেশিরভাগ অঞ্চলই মানুষের ক্রিয়াকলাপ দ্বারা প্রভাবিত। এমনকি জাতীয় উদ্যান, রিজার্ভ অঞ্চলগুলোও মানুষের বাহ্যিক কার্যকলাপের কারণে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে।[১৬]

আমেরিকান রাষ্ট্রদার্শনিক হান্নাহ্ এরেট (Hannah Arendt) দাবি করেন যে, পৃথিবীর ৪৮% স্থলভাগ মানুষের অধিকারে এবং আমরা যদি পাহাড়, বরফ এবং মরুভূমিকে স্থলভাগ থেকে বাদ দিই তাহলে স্থলভাগের ৭৫% মানুষের দ্বারা প্রভাবিত।[১৭] চার্লস মায়েল (Charles Mayell)ও দাবি করেন যে, মানুষের পদচিহ্ন পৃথিবীর ৮৩% জমি জুড়ে, সেখানে ৯৮% ভূখন্ডকে ব্যবহার করে চাল, গম বা ভুট্টা জন্মানো সম্ভব।[১৮] সুতরাং সবখানেই আমাদের প্রভাব ছড়িয়ে রয়েছে এবং এটির হ্রাস পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। প্রাকৃতিকতা মডেল (Naturalness Model) দ্বারা বোঝা যায় যে,

যেখানে মানুষের বাসস্থান ও ক্রিয়াকলাপ কম থাকে সেখানে বাস্তুসংস্থান স্বাস্থ্যকর হয়।[১৯] মূলতঃ প্রাকৃতিকতা মডেল দাবি করে যে, বাস্তুসংস্থানের স্বাস্থ্য প্রাকৃতিক জগতেই ভাল থাকে। কিন্তু আমরা বলতে পারি, আদিমকালের প্রাকৃতিক অবস্থা মানুষের দ্বারা পরিবর্তিত বাস্তুসংস্থানের চেয়ে বেশি স্বাস্থ্যকর ছিল এটা বিবেচনা করার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।[২০] আমরা কিভাবে বাস্তুসংস্থানগুলিকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাব যেখানে তা ছিল মানবমুক্ত ? এটি একটি যৌক্তিক দ্বন্দ্ব কারণ প্রকৃতিকে পুনরায় আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে আমাদের সুবিবেচনাপ্রসূত হস্তক্ষেপ দরকার। অধিকন্তু কখনও কখনও মানুষের ক্রিয়াকলাপ বাস্তুতন্ত্রকে আরও স্বাস্থ্যবান করতে সহায়তা করে। উদাহরণস্বরুপ আমরা কৃত্তিম বনভূমির কথা বলতে পারি যেখানে মানুষের অংশগ্রহণে সেটি আরো সমৃদ্ধ হতে পারে।

যে বাস্তুসংস্থান অপরিবর্তিত সেটাকে মানুষ বেশি পছন্দ করছে কিংবা মানুষের হস্তক্ষেপ ছাড়া যে সকল বাস্তুসংস্থান রয়েছে তা বেশি স্বাস্থ্যকর এমন কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই। এর দ্বারা এটা বুঝানো হয় যে, প্রাকৃতিক এবং অপরিবর্তিত বাস্তুসংস্থান মানুষের দ্বারা ব্যবহৃত অপ্রাকৃতিক বাস্তুসংস্থানের চেয়ে বেশি পছন্দের মনে হলেও বাস্তুসংস্থানের একটি অপরিহার্য অংশ হিসেবে মানবজাতিকে তার থেকে বাদ দিয়ে চিন্তা করা যাবে না।

এখন আমরা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করাবো দুর্বল মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে কী ধরণের মূল্যবোধ একটি স্বাস্থ্যকর বাস্তুতন্ত্রের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারি। কানাডার গবেষক জি. ফরগেট (G. Forget) এবং জে. লেবেল (J. Lebel) দাবি করেন যে, বাস্তুতন্ত্রের স্বাস্থ্য (Ecology Health) চূড়ান্তভাবে মানবকেন্দ্রিক কেননা আমরা কেবল আমাদের উপকারের দিক বিবেচনা করে এটিকে বজায় রাখি। যদি এটি মানবজাতির জন্য মারাত্মকভাবে ক্ষতিকর কিংবা ধ্বংসাত্মক হতো তাহলে পরিবেশ নীতিমালায় বাস্তুতন্ত্রের স্বাস্থ্যকে সমর্থন করা হতো না।[২১] এক্ষেত্রে নরটন বলেন যে, আমরা বাস্তুতন্ত্রের স্বাস্থ্যকে রক্ষা করার চেষ্টা করি কিংবা রক্ষা করতে আমাদের বাধ্যবাধকতা রয়েছে তার কারণ বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ব্যবহার ও উপকারের জন্য।[২২]

বাস্তুতন্ত্রের কার্যক্রম যদি সুষ্ঠুভাবে চলমান থাকে তাহলে আমদের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং নান্দনিক কার্যক্রমও ঠিক থাকবে। যদি আমরা দীর্ঘমেয়াদী মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করি তাহলে বাস্তুতন্ত্র যথেষ্ট পরিমাণে সুরক্ষিত থাকবে। কারণ আমরা মানবজাতির দীর্ঘমেয়াদী সুস্বাস্থ্য রক্ষা করতে চাই। অন্যকথায় বলতে গেলে বাস্তুতন্ত্রের সুরক্ষা ব্যতীত এ পৃথিবীকে বসবাসের উপযোগী করা একেবারেই অসম্ভব।

সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষের ধারাবাহিক উন্নতি ঘটছে কারণ বাস্তুতন্ত্র থেকে ব্যবহারিক মূল্যের পণ্যাদি প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করতে পারছে। মানবজাতি বাস্তুতন্ত্রের পণ্য এবং পরিষেবার উপর নির্ভর করে । তবে প্রায়শই আমরা বাস্তুতন্ত্র যতটুকু দিতে পারবে অবিবেচকের মত তার চেয়ে বেশি প্রত্যাশা করি। কিন্তু এর ফলে দিন দিন বাস্তুতন্ত্রের ক্ষতিসাধন হচ্ছে। মূলত এই গ্রহের দীর্ঘমেয়াদী স্থায়িত্ব নিশ্চিত করার জন্য বাস্তুতন্ত্রের কার্যকারিতা বজায় রাখতে হবে। কেননা পৃথিবী টিকে থাকলে মানুষ টিকে থাকবে।

আমাদের এই গবেষণায় যেহেতু সবল মানবকেন্দ্রিক অবস্থানকে বর্জন করে দুর্বল মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ করেছি তাই আমাদের গৃহীত পদক্ষেপকে সফল করতে হলে স্পষ্ট কারণ দেখাতে হবে কেন আমরা বাস্তুতন্ত্রের প্রতি যত্নশীল হবো। আমরা অবশ্যই বাস্তুতন্ত্রের প্রতি নৈতিক আচরণ করি কেননা এতে করে তাদের থেকে ব্যবহারিক সুবিধা পাই। সবল মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তুতন্ত্রের কেবল যেটা প্রয়োজনীয় সেটাকে গ্রহণ করে অন্যগুলোকে বর্জন করে। এদিক থেকে দুর্বল মানবকেন্দ্রিকতাবাদ সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে এবং বাস্তুতন্ত্রের সেই অংশকেও অন্তর্ভূক্ত করে যে অংশ সরাসরি মানুষের কাজে লাগে না। কিন্তু তাকে মূল্যায়িত করলে পরোক্ষভাবে মানুষই উপকৃত হবে। কেননা বাস্তুতন্ত্রের যে উপাদানটি বর্তমানে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হয় কালের বিবর্তনে ও প্রযুক্তির কল্যাণে সেটাও আমাদের অন্যতম প্রয়োজনীয় সামগ্রী হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। বর্তমানে সেই উপাদানটির ব্যবহারিক মূল্য সম্পর্কে উদাসীন থাকাটা বরং আমাদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতাকেই নির্দেশ করে উপাদানটির মূল্যহীনতাকে নয়। এটা বলা হয়ে থাকে যে, প্রকৃতি এমন কিছু সৃষ্টি করেনি যা এ পৃথিবীকে সকলের জন্য বাসযোগ্য করতে কোন ভূমিকা পালন করে না। অর্থাৎ প্রত্যেকটি প্রাকৃতিক উপাদানই এ পৃথিবীকে বাসযোগ্য করার জন্য প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ভূমিকা পালন করছে।

মানুষের জন্যই কিছু অ-মানব প্রজাতির ব্যবহারিক মূল্য স্বীকার করা হয়। মানুষ তার চাহিদাসমূহ যেমন, খাদ্য, বস্ত্র, ওষুধ, বিভিন্ন উপকরণ, জ্বালানী, বিনোদনের জন্য অ-মানব প্রাকৃতিক সত্তার উপর নির্ভরশীল। বেঁচে থাকার জন্য আমাদের যে সমস্ত পুষ্টি প্রয়োজন সেগুলো প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে বিভিন্ন প্রজাতি থেকে আসে। গৃহপালিত প্রজাতিগুলোর বেশিরভাগই সরাসরি খাবারের জন্য ব্যবহৃত হয় তবে বন্য প্রজাতিও আমাদের খাদ্য সরবরাহে অবদান রাখে। বিশেষ করে উন্নয়নশীল এবং সর্বাধিক প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত দেশগুলোতে তাদের খাবারের জন্য প্রজাতির উপর নির্ভর করে। আমাদের গৃহপালিত প্রায় সকল প্রজাতি বন্য প্রজাতি থেকেই এসেছে এবং বতর্মানের কিছু বন্য

প্রজাতি ভবিষ্যতে সম্ভবত গৃহপালিত প্রজাতিতে পরিণত হবে। সবল মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে যেহেতু মনে করা হয় যে কেবল মানুষেরই নৈতিক অবস্থান রয়েছে এবং যেহেতু যতক্ষণ না প্রজাতিগুলির অস্তিত্ব থাকছে ততক্ষন প্রাণীদের খাওয়া কোন সমস্যা নয়। কোনরূপ নৈতিকতা ছাড়াই এ দিকটি আমাদেরকে প্রজাতি সংরক্ষণের জন্য জোরালো উৎসাহ দেয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে কেবল যে প্রজাতিগুলো মানুষের প্রয়োজনে লাগে সেগুলো সংরক্ষণের তাগিদ দেয়। অপরদিকে দুর্বল মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তুতন্ত্রের সকল বিষয়কে গুরুত্ব দেয়। কেননা বাস্তুতন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো থাকলে মানুষের স্বাস্থ্যও ভাল থাকবে। কারণ মানুষও বাস্তুতন্ত্রের অংশবিশেষ। খাবারের জন্য বিভিন্ন প্রজাতি সংরক্ষণ যদিও আশাব্যঞ্জক তথাপি এটি সহজ ব্যাপার নয়। খাদ্যের উপাদান হিসেবে বিভিন্ন প্রজাতিকে ব্যবহার করতে গিয়ে অনেক প্রজাতি ইতোমধ্যে বিলুপ্তির পথে। অনেকে মনে করেন যে, মানবকেন্দ্রিক করণবাদ এক্ষেত্রে অযৌক্তিক বা অদক্ষ। তাই বলা যায় যে, যে সকল প্রজাতি বংশবৃদ্ধিতে বেশি উর্বর বা প্রতিপালন করা যায় অর্থাৎ উৎপাদনশীল এবং পরিচালনা করা সহজ সেগুলোকে মানুষের খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করাই শ্রেয়। কিন্তু যেগুলো বিলুপ্তির পথে সেগুলোকে খাবার হিসেবে গ্রহণ না করাই উত্তম। আমরা যদি দেখি যে কোন একটি প্রজাতি বিভিন্ন প্রকার পুষ্টি সরবরাহ করে এবং সহজে বংশবৃদ্ধি করে তাহলে তাদেরকে আমরা পালন করার জন্য আগ্রহী হই। কিন্তু একই সময়ে অন্যান্য প্রজাতিগুলোর প্রতি উদাসীন থাকি। আমরা মূলতঃ অর্থনৈতিক দিক থেকে চিন্তা করেই প্রজাতিগুলোকে প্রাধান্য দিই। সংরক্ষণের দৃষ্টিভঙ্গির একটা সমস্যা হতে পারে যে প্রজাতিগুলো মানুষের জন্য মূল্যবান এবং মানুষের পুষ্টির উৎস হিসেবে এসকল প্রজাতিগুলোকে গৃহে পালন করে। এর ফলে প্রজাতিগুলোর জিনগত পরিবর্তন ঘটে এবং এ সকল প্রজাতির জন্য মানুষের তৈরী গৃহস্থালী রূপটিই তাদের পূর্বের প্রাকৃতিক জীবনের চেয়ে বেশি উপযুক্ত হয়ে পড়ে। ফলে দেখা যায় যে, মানুষ তার প্রয়োজনের কথা চিন্তা করে সবসময় গৃহপালিত প্রজাতিকেই গুরুত্ব দেয় এবং অন্যান্য প্রজাতিগুলোকে খুব একটা গুরুত্ব দেয় না। তাছাড়া মানুষ অন্য প্রজাতিগুলোকে তাদের গৃহপালিত প্রজাতির জন্য কাজে লাগায়। প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্ষেত্রেও এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। খাদ্য হিসাবে সয়া চাষের জন্য অনেকে রেইন ফরেস্টকে ধ্বংস করে। আমেরিকান বাস্তুবিদ রবার্ট রিক্লেপস (Robert Ricklefs) বলেন যে, কোন প্রজাতিকে তার অর্থনৈতিক মূল্যের দিক থেকে চাষাবাদ করলে তা প্রাকৃতিক পরিবেশের সুরক্ষার জন্য কোন ভাল ভিত্তি হতে পারে না।[২৩] যেহেতু বিভিন্ন প্রজাতির ব্যবহারিক গুরুত্ব বিভিন্ন মাত্রার হয়ে থাকে, তাই সবল মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি বুঝাতে পারে যে, কিছু প্রজাতি অন্য প্রজাতির চেয়ে মূল্যবান। এক্ষেত্রে দেখা যাবে যে, কম মূল্যবান প্রজাতিগুলোকে মানুষ কেবল ভুলেই যাবে না বরং এগুলো চরমভাবে নিপীড়িত হওয়ার ফলে সময়ের

ব্যবধানে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। প্রজাতিগুলোর জিনগত বৈচিত্র্য হ্রাস পাবে। প্রকৃতিতে যদি অধিক সংখ্যক প্রজাতি থাকে তাহলে তা মানুষের জন্যই ভাল কেননা অসংখ্য প্রজাতির মধ্যে মানুষ ঐ প্রজাতিগুলোকেই খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে যেগুলোর মধ্যে কোন এক প্রজাতি অসুস্থ বা আঘাতপ্রাপ্ত হলে আমরা আমদের পুষ্টিসাধনের জন্য অন্য আরেকটি প্রজাতিকে বিকল্প খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করতে পারি।

আমরা লক্ষ্য করলে দেখি যে, আমাদের প্রায়ই সকল উৎপাদিত ও পালিত প্রজাতিগুলোর উৎপত্তি বন্য প্রজাতি থেকেই। এর দ্বারা সুস্পষ্ট যে, বৃহত্তর জীববৈচিত্র্য আমাদের জন্য উপযোগী প্রজাতি সরবরাহে অধিকতর সম্ভাবনা সৃষ্টি করতে পারে। আরও লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, নতুন কোন প্রজাতি চাষ অর্থাৎ হাইব্রিড প্রজাতির জন্য জিনের যে স্থানান্তর করা হয় তার জন্য বন্য প্রজাতির প্রয়োজন। উদাহরণ হিসেবে নরম্যান মায়ার্স (Norman Myers) ১৯৭০ সালে আমেরিকার ভুট্টার ক্ষয়রোগ দ্বারা তাদের অর্ধেক ফসল নষ্ট হয়েছিল তার উল্লেখ করেন। তখন তারা এ সমস্যাকে মোকাবেলার জন্য মেক্সিকোতে যেখানে এর উৎপত্তিস্থল সেখানকার ভুট্টার সাথে প্রজনন করে চাষ বৃদ্ধি করে।[২৪] এ থেকে বলা যায় যে, বন্য প্রজাতির প্রাকৃতিক সত্তার বিলুপ্তি হলে মানুষেরই ক্ষতি হয়। আর এদের রক্ষা করলে মানুষ উপকৃত হয়।

প্রজাতি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে চিকিৎসাক্ষেত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্তমানে আমরা যে সকল ওষুধ ব্যবহার করি তার অধিকাংশই উদ্ভিদ থেকে তৈরী। ভবিষ্যতে এর সংখ্যা আরও বৃদ্ধি হবে বলে মনে করা হচ্ছে। অনেক উদ্ভিদ পড়ে আছে যেগুলো এখন পর্যন্ত কোন চিকিৎসায় ব্যবহার হবে কিনা তার পরীক্ষা করা হয়নি। অনাবিষ্কৃত এ সকল উদ্ভিদ কিংবা প্রাকৃতিক সত্তাকে যদি আমরা আগেই ধ্বংস করে দিই তাহলে আমাদেরই ভবিষ্যতের সম্ভাবনার ক্ষেত্রগুলো সংকুচিত হবে এবং প্রকারান্তরে মানবজাতিকে অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে।

এটা সত্য যে, আমরা আমদের প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহার করি এমন অনেক উপাদান অ-মানব প্রাকৃতিক সত্তা থেকে পেয়ে থাকি। বিশেষ করে কাঠ যা পেপার টাওয়েল থেকে শুরু করে বাড়ি তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়। কাঠ এবং অন্যান্য জৈব পণ্যসমূহ জ্বালানী হিসাবেও গুরুত্বপূর্ণ। অর্ধেকেরও বেশি উন্নয়নশীল দেশগুলিতে ব্যবহৃত জ্বালানী সরবরাহ কাঠ থেকে আসে। তানজেনিয়া ও উগান্ডায় জ্বালানী চাহিদার পাঁচ ভাগের চার ভাগ কাঠ দিয়ে সম্পন্ন হয়। এমনকি শিল্পোন্নত দেশগুলোতেও কাঠ হল শক্তির (Energy) একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। অপেক্ষাকৃত ঘন বনাঞ্চলযুক্ত সুইডেনের ১৭% জ্বালানি খরচ মেটানো হয় কাঠ থেকে।[২৫] জৈব জ্বালানী হচ্ছে নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস যা অনেকের

কাছে অ-নবায়নযোগ্য শক্তির বিকল্প হিসেবে গুরুত্বপুর্ণ। বিভিন্ন প্রজাতিকে উপকরণ হিসেবে অতিমাত্রায় ব্যবহারের কারণে দিন দিন বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে । কাঠকে জ্বালানী, কাগজ, আসবাবপত্র ইত্যাদি হিসেবে ব্যবহারের কারনে বিশ্বের বনভূমির বড় একটি অংশ কেটে ফেলা হচ্ছে। বিশেষ করে রেইন ফরেস্ট উজাড় করে সেখানে কৃষিকাজের জায়গা তৈরী করার জন্য অনেক বন বর্তমানে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। কাঠ ছাড়াও অসংখ্য প্রাণী এবং উদ্ভিদ বর্তমানে হুমকির সম্মুখীন। হাতির দাঁত এবং গন্ডারের শিং মানুষের নিকট খুবই জনপ্রিয়। এই জনপ্রিয়তার কারণে বর্তমানে হাতি এবং গন্ডার উভয়ই বিলুপ্তির দ্বারপ্রান্তে। অন্যান্য অনেক প্রজাতি পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে গেছে যা আমাদের প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করতো। তাই কেবল ব্যবহারিক দিক বিবেচনা করে অ-মানব প্রাকৃতিক সত্তাসমূহকে ভোগ করলে বাস্তুতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয় যা প্রকারান্তরে মানুষেরই ক্ষতি হয়।

লক্ষ্য করলে দেখা যায়, কিছু প্রজাতি সূচক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রজাতিগুলোকে এক ধরণের প্রারম্ভিক সতর্কতা হিসাবে ব্যবহার করা হয়। যেমন: কানারি পাখিকে যেখানে খনিগুলো গভীর এবং অক্সিজেনের সংকট থাকতো সেখানে ব্যবহার করা হতো। ফলে তাদেরকে তাদের ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে বিশেষভাবে ব্যবহারিক মূল্যে মূল্যায়িত করা হয়। কিন্তু দিন দিন সূচক বিলুপ্ত হতে যাচ্ছে। তাই মানুষের উচিত এ সকল বিলুপ্তপ্রায় সূচক প্রজাতিকে রক্ষা করা। যদি আমরা তা করতে না পারি তাহলে তা আমাদের জন্য ব্যাপক ক্ষতি বয়ে আনবে।

পর্যটন শিল্পের কারণে প্রজাতি সংরক্ষণ করা হয়। এ ধরণের প্রজাতি দ্বারা মানুষ দু'ধরণের ব্যবহারিক মূল্য পেয়ে থাকে। প্রথমত: এদের দ্বারা মানুষ বিনোদন, অনুপ্রেরণা, নান্দনিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারে। দ্বিতীয়ত: পর্যটকদের নিকট থেকে আর্থিক সুবিধা লাভ করা যায়। পর্যটন এবং ভ্রমন ব্যবসা হল বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম ব্যবসায়ের খাত। প্রাকৃতিক স্থান সমূহের পর্যটন চাহিদা বর্তমানে খুবই বেশি। এ খাত থেকে আয় আসার ফলে অনেক মানুষ প্রকৃতিকে সুরক্ষার চেষ্টা করে। এমনকি যারা প্রকৃতির সংরক্ষণের ব্যাপারে উদাসীন তারাও প্রকৃতিকে রক্ষা করার চেষ্টা করে। পর্যটনের জন্য পর্যটকদের মধ্যে অ-মানব প্রাকৃতিক সত্তার প্রতি এক ধরণের ভালবাসা সৃষ্টি হয়।

এটা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরিবেশ দূষণ অনৈতিক কেননা এটি অন্যজনের জীবনকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে, যেমন: কল-কারখানার বায়ু দূষণের ফলে মানুষ অসুস্থ হয়। একইভাবে, প্রাকৃতিক সম্পদের অপচয়মূলক ব্যবহারকে অনৈতিক বলে বিবেচনা করা হয় কারণ এটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ঐ সম্পদ থেকে বঞ্চিত করে। ১৯৭০ সালে হোমস রলস্টন এ বিষয়ে যুক্তি দেন যে, জীব বৈচিত্র্যের সুরক্ষার জন্য মানুষের নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে কারন এটি না করলে ঈশ্বরের সৃষ্টির

প্রতি অসম্মান দেখানো হবে। পরিবেশ নীতিবিদ্যার একডেমিক ক্ষেত্র হিসেবে পরিগণিত হওয়ার পূর্বে রক্ষণশীলরা যেমন: জন মুইর (John Muir) এবং Aldo Leopold যুক্তি দেখান যে, প্রাকৃতিক জগতের স্বতঃমূল্য আছে কারণ প্রকৃতির সৌন্দর্যের নিজস্ব নান্দনিক আবেগ রয়েছে এবং প্রাকৃতিক জগতের কর্তৃত্ব/শোষণের উপর নৈতিক বাধা আছে। ১৯৭০ এর দশকে পরিবেশ নীতিবিদ্যা যখন একাডেমিক ক্ষেত্র হিসাবে উদীয়মান হচ্ছে তখন এ বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত গবেষকগণ মানবকেন্দ্রিকতাবাদের দুটি মৌলিক চ্যালেঞ্জ নিয়ে কাজ করেন:

প্রথমত: তাঁরা প্রশ্ন করেন যে, মানুষকে অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় উচ্চতর বিবেচনা করা উচিত কিনা?

দ্বিতীয়ত: তারা এ পরামর্শও দিয়ে থাকেন যে, প্রাকৃতিক পরিবেশের স্বতঃমূল্য নির্ধারিত হতে পারে মানুষের প্রতি তাদের অবদানের উপর।

বাস্তুকেন্দ্রিকতাবাদীরা মনে করেন, প্রকৃতির অসংখ্য প্রজাতির মধ্যে মানুষ আছে এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ স্বতন্ত্রভাবে মূল্যবান।

আমরা প্রকৃতির উপর মানবকেন্দ্রিক আধিপত্যের অথবা কর্তৃত্বের (domination) স্বপক্ষে কিছু যুক্তি (Arguments) পর্যালোচনা করে দেখানোর চেষ্টা করবো যে সবল মানবকেন্দ্রিকতাবাদ সমর্থিত কর্তৃত্বের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবেশ সুরক্ষা তথা এ পৃথিবীকে বাসযোগ্য করার ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়। বরং দুর্বল মানবকেন্দ্রিকতাবাদ সমর্থিত সহযোগীতার (cooperation) মনোভাবই মানুষ এবং প্রাকৃতিক উপাদানের মধ্যে মেলবন্ধন স্থাপন করে পৃথিবীকে বর্তমান এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য হিসেবে গড়ে তুলতে পারে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে মানুষ কেন প্রকৃতির উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে? কর্তৃত্বের অন্যতম কারণ হলো মানুষের এমন সব গুনাবলী আছে যেগুলো অন্যান্য প্রাকৃতিক উপাদানের মধ্যে নেই। যেহেতু হোমোসেপিয়েন্স অন্যান্য প্রজাতির চেয়ে উচ্চতর সেহেতু তাদের কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যেমন: যন্ত্রপাতি ব্যবহারের দক্ষতা, ভাষাগত দক্ষতা, যোগযোগের ক্ষমতা, যৌক্তিক ক্ষমতা, বৈজ্ঞানিক সক্ষমতা, ঐচ্ছিক প্রজনন ক্ষমতা, সংস্কৃতি, ইচ্ছার স্বাধীনতা ইত্যাদি। এ গুনগুলোর উপস্থিতির কারণে মানুষ অ-মানব প্রাণী ও প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তার করে। অধিকন্তু যদি এগুলো আমাদের প্রয়োজনগুলোকে পূরণ করতে না পারে তাহলে আমরা এদেরকে মূল্যহীন মনে করি। অ-মানব প্রাণীগুলো মানুষের চেয়ে নিম্নতর, সে কারণে অ-মানব সত্তা মানুষের দ্বারা ব্যবহৃত হবে। কিন্তু যুক্তিতে এটা টিকবে না। কারণ যে বিশেষ গুণের কথা বলা হয়েছে যেমন: কথা বলার

ক্ষমতা, যৌক্তিক দক্ষতা, ভাষার দক্ষতা, যোগাযোগের ক্ষমতা এগুলো কেবল মানুষের আছে কিন্তু অ-মানব সত্তার নেই এজন্য এরা নিম্নতর (Inferior) এটা ঠিক নয়। কারণ বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত যে অন্যান্য প্রাণীজগতের সদস্যরাও মানুষের মত কথা বলতে পারে, এমনকি পানির নিচে যে তিমি মাছ সেও কথা বলতে পারে এবং একে অপরের সাথে পারস্পরিক যোগাযোগ করতে পারে। কুকুর, হাতি এদেরও নিজস্ব ভাষা আছে। হাতি, শিয়ালেরও বুদ্ধি আছে। এরাও সামাজিক জীব। এরা দলবদ্ধ হয়ে বসবাস করে। তাদের মধ্যে নেতৃত্বের শ্রেণীবিন্যাস আছে। যেমন: হাতিদের মধ্যে মহিলা হাতিদেরকে নেতা বানানো হয়।

নিরপেক্ষভাবে বলতে গেলে এটাই বলা যুক্তিসংগত যে মানুষের মধ্যে বিদ্যমান গুণগুলোর প্রায় সবগুলোই অমানব প্রাণীর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এমন কিছু বিশেষ ও অতুলনীয় গুণ প্রাণীদের মধ্যে রয়েছে যা মানুষের মধ্যে নেই। উদাহরণস্বরূপ: একটা কুকুরের আমাদের চেয়ে দু'হাজারগুণ বেশি ঘ্রাণশক্তি আছে। যে কারণে বিশ্বের বিভিন্ন বিমানবন্দর এবং আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা অবৈধ অস্ত্র বা দ্রব্যকে সনাক্ত করার জন্য এদেরকে ব্যবহার করে থাকে। আবার একটি হাঁসকে যদি পাত্রে দুধ দেওয়া হয় তাহলে হাঁসটি কেবল নির্যাসটুকু গ্রহণ করে অপ্রয়োজনীয় পানির অংশটুকু বর্জন করতে পারে যা আমরা যন্ত্রের সাহায্যেও করতে পারি না। আবার একটি শকুন আট কি.মি দূর থেকে শিকার সনাক্ত করতে পারে যা মানুষ পারে না। একটি হাতি দু'বছর পরেও একটি কংকালের ঘ্রান নিয়ে বুঝতে পারে যে এ হাতিটি তার বংশধর ছিল। যা মানুষ DNA পরীক্ষা করেও নিশ্চিত হতে পারে না। এরকম অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে যা অ-মানব প্রাণীর আছে কিন্তু মানুষের মধ্যে নেই। তারপরেও যদি যুক্তির খাতিরে ধরেও নিই যে, আমাদের অনেক অতুলনীয় গুণ আছে তার অর্থ এই নয় যে এ গুণাবলির কারণে আমরা অন্যের উপর আধিপত্য বিস্তার করবো। বরং যদি আমি গুণের দিক দিয়ে সর্বোৎকৃষ্ট হই তাহলে আমার দায়িত্ববোধটা তুলনামূলকভাবে বেড়ে যায়, এটা আমাকে কর্তৃত্ব করার অধিকার দেয় না। উদাহরণস্বরূপ: একটি পরিবারের পাঁচ ভাইবোন। তাদের মধ্যে যদি একজন সবচেয়ে বেশি বুদ্ধিমান হয় তাহলে তার দায়িত্বটা অন্যদের চেয়ে বেশি হয়, এক্ষেত্রে যে বুদ্ধিমান সে যদি নিজেকে বিশেষ গুণের অধিকারী ভেবে অন্যদের উপর কর্তৃত্ব করে তাহলে এই পরিবারে অশান্তি নেমে আসবে। একইভাবে এই পৃথিবীটাও একটি পরিবার। যদি আমরা মনে করি যে মানুষ হিসেবে আমরা বেশি গুণবলীর অধিকারী, তাহলে আমাদের বৌদ্ধিক ক্ষমতা, বৈজ্ঞানিক ক্ষমতা, উৎপাদন ক্ষমতা, যোগাযোগের ক্ষমতা ইত্যাদি গুণগুলোকে ব্যবহার করে পৃথিবীকে বসবাসের উপযোগী করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারি। আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল সবার জন্য একটি বাসযোগ্য পৃথিবী গড়ে তোলা। তাহলে এই বিশ্বকে বাসযোগ্য করার জন্য আমাদের

গুণগুলো প্রয়োগ করে কর্তৃত্বের (domination) পরিবর্তে সহযোগীতার (co-operation) মনোভাবকে কাজে লাগিয়ে অভিষ্ঠ লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারি। যদি আমরা কর্তৃত্ব করি তাহলে লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে না। কারণ লক্ষ্য অর্জন করতে হলে প্রয়োজন সহযোগীতা (co-operation), কর্তৃত্ববাদ (domination) নয় এবং এই সহযোগীতার হাত সম্প্রসারণ সম্ভব দুর্বল অর্থে মানবকেন্দ্রিকতাবাদকে গ্রহণ করার মাধ্যমে – সবল অর্থে নয়।

তথ্যনির্দেশ

১. Donald Worster, The Intrinsic Value of Nature, *Environmental Review,* Vol.4, No.1, p. 44

২. *Ibid.*

৩. *Ibid.*

৪. Joseph R. DesJardins, *Environmental Ethics: An Introduction to Environmental Philosophy*,Wardsworth, 2013, p. xi.

৫. Derek Anthony Parfit, 'Future People, the Non-Identity Problem, and Person-Affecting Principles,' *Philosophy and Public Affairs*, Vol. 45, No.2, 2017, pp.118–157.

৬. B. Barry, 'Justice Between Generations' in *Law Morality & Society: Essays in Honor of H.L.A. Hart*, P.M.S. Hacker and Joseph Raz (Eds.) Clarendon Press, Oxford, 1977, p. 268.

৭. B. Norton, , 'Intergenerational equity and sustainability', in *Searching for Sustainability*, Cambridge University Press, Cambridge, 2003, p. 422.

৮. R.M. Solow, 'Sustainability: An economist's perspective', in R. Dorfman, and N. Dorfman, (eds.) *Economics of the Environment: Selected Readings*, W.W.Norton and Company, New York, 1993.

৯. B. Norton, 'Intergenerational equity and sustainability', in *Searching for Sustainability*, Cambridge University Press, Cambridge, 2003, p. 436.

১০. *Ibid*.p.436.

১১. *Ibid*.p.437.

১২. J.L. Nelson, 'Health and disease as 'thick concepts' in ecosystemic contexts', *Environmental Values*, Vol.4, No.4, 1995, p. 316.

১৩. J.B. Callicott, & K. Mumford, 'Ecological Sustainability as a Conservation Concept', *Conservation Biology,* Vol. 11, No. 1, 1997, pp. 32-40.

১৪. D.J. Rapport, 'Ecosystem health, ecological integrity, and sustainable development: toward consilience', *Ecosystem Health*, Vol.4, No.3, 1998, pp. 145-46.

১৫. S.P. Bratton, 'Alternative models of ecosystem restoration', in R. Costanza, B.G. Norton, and B.D. Haskell, (eds.) *Ecosystem Health: New Goals for Environmental Management*, Island Press, Washington D.C., 1992.

১৬. L. Ryszkowski, 'The coming change in the environmental protection paradigm', in P. Crabbé, A. Holland, L. Ryszkowski, and L. Westra, (eds.) *Implementing EcologicalIntegrity: Restoring Regional and Global Environmental and Human Health*, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2000, p.52

১৭. L. Hannah, D.Lohse, Ch. Hutchinson, J.L. Carr, and A. Lankerani, 'A preliminary inventory of human disturbance of world ecosystems', *Ambio*, Vol. 23, 1994, pp. 246-250.

১৮. H. Mayell, 'Human "footprint" seen on 83 percent of Earth's land, 2002.

১৯. E.J.S. Hearnshaw, R.Cullen, and K.F.D. Hughey, 'Ecosystem health demystified: An ecological concept determined by economic means', *Economics and Environment Network Workshop*, The Australian National University, Canberra, 2005, p.2.

২০. *Ibid*. p. 4.

২১. G. Forget, and J. Lebel, 'An ecosystem approach to human health', *International Journal of Occupational and Environmental Health*, Vol.7, No. 2, 2001, pp. 3-36.

২২. B. Norton, A new paradigm for environmental management, in R. Costanza, B.G. Norton, and B.D. Haskell, (eds.) *Ecosystem Health: New Goals for Environmental Management,* Island Press, Washington D.C, 1992, p. 24.

২৩. Robert E. Ricklefs, *The economy of nature,* Freeman ,1997, p.598.

২৪. Norman Myers, "Tropical forests and life on earth" in Head, Suzanne & Heinzman, Robert, *Lessons of the Rainforest* , Sierra club books, 1990, pp.13-24.

২৫. Millennium Ecosystem Assessment 2005, p.3

গ্রন্থপঞ্জি

১. আবু তাহা হাফিজুর রহমান (অনূদিত), *মানব প্রকৃতির স্বরূপ অন্বেষা*, (মূল) David. Hume, *A Treatise of Human Nature*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮১

২. ইসলাম,আমিনুল, *প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাশ্চাত্য দর্শন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৮

৩. আল কুরআন

৪. বাইবেল, আদি পুস্তক

৫. ঋগ্বেদ

৬. অথর্ববেদ

৭. শুক্লযর্জবেদ

৮. দশ-বৈ-কালিকাসূত্র

৯. খালেক,এ. এস. এম.আব্দুল, *প্রায়োগিক নীতিবিদ্যা*, অনন্যা, ঢাকা, ২০০৯

১০. দাস, কালী প্রসন্ন (অনূদিত), *আন্তর্ব্যক্তিক সম্পর্ক, ব্যবস্থাপনা ও নেতৃত্ব: সংকট নিরসনে ৭টি অভ্যাস*, (মূল) Stephen R.Covey, *The 7 Habits of Highly Effective People*, দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০০৬

১১. হালদার, গোপাল, *সংস্কৃতির রূপান্তর*, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৪

১২. শর্মা, দ্বিজেন, *চার্লস ডারউইন ও প্রজাতির উৎপত্তি*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৭

১৩. গুপ্ত, দীক্ষিত, *নীতিশাস্ত্র*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ২০০৭

১৪. চৌধুরী, পরমেশ, *পরিবেশ বিজ্ঞানী রবীন্দ্রনাথ*, মণ্ডল বুক হাউস, কলিকাতা, ১৪০৫

১৫. রায়, প্রদীপ কুমার (অনূদিত), *ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা*, (মূল) Peter Singer, *Practical Ethics*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬

১৬. আখতারুজ্জামান, ম., *বিবর্তনবাদ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৮

১৭. ওয়াহাব, শেখ আবদুল, *কান্টের নীতিদর্শন*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা, ঢাকা, ১৯৮২

১৮. সেন, সমরেন্দ্রনাথ, *বিজ্ঞানের ইতিহাস*, শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ, কলকাতা, ১৯৯৪

১৯. মজুমদার, মোহাম্মদ আবুল কাসেম, *পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ইসলাম*, অগ্রপথিক, জুলাই,২০০০

২০. গুপ্ত, শুভেন্দু, *প্রাচীন ভারতে পরিবেশ চিন্তা*,সাহিত্য সংসদ, ২০১২, পৃ.১১৬

২১. করিম, সরদার ফজলুল, *এ্যারিস্টটল-এর পলিটিক্স*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থ সংস্থা, ঢাকা, ১৯৮৩

২২. ইসলাম, সিরাজুল (সম্পাদিত), *বাংলাপিডিয়া*, খন্ড ২, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩

–, *বাংলাপিডিয়া*, খন্ড ৫, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩

–,*বাংলাপিডিয়া*, খন্ড ৯, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩

২৩. বেগম, হাসনা (অনূদিত), *উপযোগবাদ*, (মূল) J.S. Mill, *Utilitarianism*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৮

২৪. চৌধুরী, হাসানুজ্জামান (অনুবাদ ও ভূমিকা), *পরিবেশ ও পুঁজিবাদ*, সাহিত্যিকা, ঢাকা ২০০৪

২৫. দাস, কালী প্রসন্ন, "ইহুদি-খ্রিষ্টীয় দৃষ্টিতে মানুষ ও পরিবেশ", *দর্শন ও প্রগতি*, গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, জুন-ডিসেম্বর, ১৯৯৯

–,"পরিবেশ নীতিবিদ্যা: উদ্ভব ও বিকাশ" হাসান আজিজুল হক (সম্পাদিত), কুসুমে কুসুমে চরণচিহ্ন, মফিজউদ্দিন আ. স্মৃতিসংসদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, ২০০৩

–,"পাশ্চাত্যের ভূ-নৈতিকতা", নতুন দিগন্ত, সমাজ-রূপান্তর অধ্যয়ন কেন্দ্র, ঢাকা, ২০০২

২৬. শর্মা, দ্বিজেন, "প্রকৃতির প্রতারণা: একটি জীব-সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা",*বাংলা জার্নাল*, অন্টারিও, কানাডা, ১০ম বর্ষ, ১৮শ সংখ্যা, ডিসেম্বর, ২০১২

২৭. Alexander, H., *The State of the Community Landcare Movement in Australia*, National Landcare Program, Canberra, 1995

২৮. Allenby, B. and Richards, D. (eds), *The Greening of Industrial Ecosys-tems*, National Academy Press, Washington DC, 1994

২৯. Altshuler, A., *The Urban Transportation System: Politics and Policy Innovation*, MIT Press, Cambridge, Mass, 1979

৩০. Amos, N., Kirkpatrick, J.B. and Giese, M., *Conservation of Biodiversity, Ecological Integrity and Ecologically Sustainable Development: a Discussion Paper*, ACF and WWFN ESD Policy Unit, Melbourne, 1993

৩১. Aquinas, St. Thomas, *Summa Contra Gentiles*, English Dominican Fathers (translated), Benbigr, Brother, Chicago, 1928.

Australian Government 1990, *Ecologically Sustainable Development: a Commonwealth Discussion Paper*, AGPS, Canberra 1992a, *National Strategy for Ecologically Sustainable Development*, AGPS, Canberra

_, 1992b, *Compendium of ESD Recommendations*, AGPS, Canberra

_, 1992c, National Greenhouse Response Strategy, AGPS, Canberra

_, 1994, *Climate Change, Australia's national report under the United Nations Framework Convention on Climate Change*, Commonwealth of Australia, Canberra

৩২. Attfield, Robin, *A Theory of Value and Obligation*, Croon Helm, London, 1987

_, *Environmental Ethics*, Polity Press, UK, 2003,

_, *Environmental Ethics: An Overview for the Twenty-First Century*, Polity Press, UK, 2003

_, *The Ethics of Environmental Concern*, 2nd edition, The University Georgia Press, London. 1991

৩৩. Bentham, Jeremy, *The Principles of Morals and Legislation*, Oxford University Press, Oxford, 1974

৩৪. Bookchin, Murray, *Toward an Ecological Society*, Black Rose Books, USA, 1980

৩৫. Botzler, R. G. & Armstrong, S. M., *Environmental Ethics*, 2nd edition, McGraw Hill Co. Inc, Boston, USA, 2003

৩৬. Bourke,V. J., *Ethics*, Macmillan and Co., New York, 1951

Dhaka University Institutional Repository

৩৭. BoYle, Alan E. and Anderson, Michael R. (eds.), *Human Rights Approaches to Environmental Protection*, Oxford University Press, 1998

৩৮. Burenhalt, G. (ed.), *The Illustrated Encyclopedia of Humankind*, vols. 1 and 2, Harper, San Francisco, 1992

৩৯. Carefoot, G.L. and Sprott, E.R., *Famine on the Wind: Plant Diseases and Human History*, Angus & Robertson, London ,1969

৪০. Charles Darwin, *The Origin of Species By Means of Natural Selection*, Senate, England, 1994

৪১. Charman, P. E. V. and Murphy, B. W., *Soils: their Properties and Management*, Sydney University Press, Sydney,1991

৪২. Cohen, G. and O'Connor, J., *Fighting Toxics: A Manual for Protecting your Family, Community and Workplace*, Island Press, Washington DC, 1990

৪৩. Cobb, J.B., *'An index of sustainable economic welfare'*, Development nos. 3/4, 1990

৪৪. Coplestone, F., *A History of Philosophy*, Image Books, New York, 1962

৪৫. Covey, Stephen R., *The 7 Habits of Highly Effective People*, Simon & Schuster, London, 1989

৪৬. Devall, Bill & Sessions, George, Deep Ecology*: Living as if Nature Mattered*, Peregrine Smith Book, Salt Lake City, 1985

৪৭. Edwards, Paul (ed.), *The Encyclopedia of Philosophy*, Vol. 7, The Macmillan Company & the Free Press, New York, 1986

৪৮. Elliot, Robert (ed.), *Environmental Ethics*, Oxford University Press, New York, 1995,

_, *Faking Nature: The ethics of environmental restoration*, Routledge, London and New York, 1997

Dhaka University Institutional Repository

৪৯. Gare, Arran E., *Postmodernism and the Environmental Crisis*, Routledge, London and New York, 1995

৫০. Hanna, Susan et el. (eds.), *Rights to Nature: Ecological, Economic, Cultural, and Political Principles of Institutions for the Environment*, Island Press, California, 1996.

৫১. Hargrove, Eugene C., *Foundations of Environmental Ethics*, Prentice Hall, New Jersey, 1989

৫২. Harvey, David, *Justice, Nature and the Geography of Difference*, Blackwell Publishers, USA, 1996

৫৩. Hayward, Tim, *Ecological Thought: An Introduction*, Polity Press, Cambridge, 1995

৫৪. Hill, Donald (eds.), *Applied Philosophy: Morals and metaphysics in contemporary debate*, Routledge, London and New York, 1991

৫৫. Hospers, John (ed.), *The Monist*, Vol. 67, No. 4, October, 1984,

৫৬. Hume, David, *A Treatise of Human Nature*, Bigge, Selby L. A. (ed.), Oxford University Press, Oxford, 1896

৫৭. Jardins, Joseph R. Des (ed.), *Environmental Ethics: Concept, Policy and Theory*, Mayfield Publishing Co. USA,

_, Environmental Ethics, 2nd edition, Wordsworth Publishing Company, New York, 2001

৫৮. Kant, I., *Fundamental Principles of the Metaphysic of Ethics*, 10th edition, Tr. by Abbott, T. K., Longmans, London, 1979

Lectures on Ethics, Infield, Louis (translated), Harper & Row Publishers, New York, 1967

৫৯. Light, Andrew and Rolston III, Holmes (eds.), *Environmental Ethics: An Anthology*, Blackwell, USA, 2003.

৬০. Lillie, William, *An Introduction to Ethics*, 3rd edition, Methuen & Co. Ltd., New York, 1955

Dhaka University Institutional Repository

৬১. Locke, John, *Two Treatise of Government*, Laslett, Peter (ed.), New American Library, New York, 1963

৬২. McLaren, Duncan, et al., *Pollution Injustice: The Geographic Relation Between Household Income Polluting factories*, Friends of the Earth, London, 1999

৬৩. Mitchell, C.D., *Grappling with greenhouse: Understanding the Science of Climate Change, National Greenhouse Advisory Panel*, Department of the Arts, Sport, The Environment and Territories, 1992

৬৪. Mill, J. S., *Utilitarianism*, Bobbs Merrill, Indianapolis, 1971

৬৫. Miller, G. Tyler Jr., *Living in The Environment,* 6th edition, Wordsworth Publishing Company, California, 1990

৬৬. Norman, C. et al. (eds.), *Environmental Policy: New Direction for the twenty-first century*, 4th edition, CQ Press, Washington, 2000

৬৭. Norton, Bryan G., *Toward Unity Among Environmentalists*, Oxford University Press, New York, 1991

৬৮. Palmer, Joy A., (ed.), *Fifty Great Thinkers on the Environment,* London, 2004

৬৯. Passmore, John, *Man's Responsibility for Nature: Ecological Problems and Western Traditions,* Duckworth, London, 1974 (2nd edition, 1980)

৭০. Pearce, D. et al., *Blueprint for a Green Economy*, Earthscan, London, 1989

৭১. Plumwood, Val, *Feminism and the Mastery of Nature*, Routledge, London, 1993

৭২. Regan, Tom and Singer, Peter (eds.), *Animal Right and Human Obligations,* 2nd edition, Prentice Hall, New Jersey, 1989

৭৩. Rolston III, Holmes, *Environmental Ethics: Duties to and Values in Nature,* Temple University Press, Philadelphia, 1988

Dhaka University Institutional Repository

৭৪. Ross, D. W., *The Early History of Land-Holding Among the Germans*, Soul and Burgbee, Boston, 1883

৭৫. Sabine, George H., *A History of Political Theory, Henry Holt and Company*, New York, 1951

৭৬. Simmons, I. G., *Changing the Face of the Earth: Culture, Environment*, History, Basil Blackwell, USA, 1989

৭৭. Singer, Peter (ed.), *A Companion to Ethics*, Blackwell, Oxford, UK, 1993,

_, Animal Liberation, Avon Books, New York, 1975

৭৮. Small, John & Witherick, Michael, *A Modern Dictionary of Geography*, ARNOLD, London, 1995

৭৯. Stevenson, C. L., *Ethics and Language*, Yale University Press, New Haven, CT, 1944.

৮০. Taylor, Paul W., *Principles of Ethics: An Introduction*, Wordsworth Publishing Company, California, 1975

_, *Respect for Nature: A Theory of Environmental Ethics*, Princeton University Press, Princeton, 1986

৮১. Thilly, F., *A History of philosophy*, Central Book Depot, Allahbad,1978

৮২. Warren, K. J. (ed.), *Ecological Feminism*, Routledge, London, 1994

৮৩. Winkler, Earl R. and Coombs, Jerrold R. (eds.), *Applied Ethics: A Reader*, Blackwell, 1993

৮৪. Wolff, Robert Paul, *Understanding Rawls*, Princeton University Press, Princeton, 1977

৮৫. World Commission on Environment and Development (WCED) 1987, *Our Common Future, Oxford University Press*, Oxford, 1988

৮৬. Worster, D. *Nature's Economy*,, Cambridge University Press, Cambridge, 1985

Dhaka University Institutional Repository

৮৭. Zeller, E., *Outlines of the History of Greek Philosophy*, Routledge & Kegan Paul, London, 1963

ARTICLES

১. Adelman, I., Morris, C., Fetini, H. and Golan-Hardy E. 1992, 'Institutional change, economic development and the environment', Ambio vol. 21, no. 1, pp. 106-11

২. Allen, B. J. 1988, 'Environmental ethics and village agriculture', in Hughes, P. J. and C. Thirlwall (eds) *The Ethics of Development: Choices in Development Planning*, Papers from the 17th Waigani Seminar, UPNG Press, pp. 6-20

৩. Arrow, K., Bolin, B., Costanza, R., Dasgupta, P., Folke, C., Holling, C.S., Jansson, B-0., Levin, S., Maler; K-G., Perrings, C. and Pimentel, D. 1995, 'Economic growth, carrying capacity, and the environment', Science vol. 268, pp. 520-1, reprinted in *Ecological Economics* vol. 15, pp. 91-5

৪. Attfield, Robin, "Ethics and the Environment: The Global Perspective", in Almond, Brenda (ed.), *Introducing Applied Ethics*, Blackwell, UK, 1995

৫. Barry, Brian, "Sustainability and Intergenerational Justice", In Dobson, Andrew (ed.), *Fairness and Futurity: Essays on Environmental Sustainability and Social Justice*, Oxford University Press, Oxford, 1991

৬. Barker, T., 'More jobs, less pollution', *New Economy*, vol. 2, no._ 3 (Autumn), Institute for Public Policy Research, London, 1995

৭. Beckerman, W., 'Economic growth and the environment: whose growth? whose environment?', *World Development*, vol. 20, pp. 481-96, 1992

Dhaka University Institutional Repository

_, “Sustainable development”: is it a useful concept?' *Environmental Values*, vol. 3, 1994

_, 'How would you like your "sustainability", sir? weak or strong? a reply to my critics', *Environmental Values*, vol. 4, 1995

৮. Beder, S., 'The hidden messages within sustainable development', *Social. Alternatives*, vol. 13, no. 2, 1994

৯. Blakers, A., 'Hydroelectricity in Tasmania revisited', *Australian Journal of Environmental Management*, vol. 1, 1994

১০. Blakers, A. and Diesendorf, M., 'A scenario for the expansion of solar and wind generated electricity in Australia', *Australian Journal of Environmental Management*, vol. 3, 1996

১১. Blakers, A., Crawford, T., Diesendorf, M., Hill, G. and Outhred, H., The Role of Wind Energy in Reducing Greenhouse Gas Emissions, Study on behalf of Unisearch Ltd, *Dept. of the Arts, Sport, the Environment, Tourism and Territories*, Canberra,1991

১২. Brajer, V., 'Recent evidence on the distribution of air effects', *Contemporary Policy Issues*, vol. 10, no. 2, 1992

১৩. Brown, V.A. and Greene, D., Local Government State of the Environment Reports. Summary Report: a Review of the First Year, *Department of Local Government and Cooperatives*, Canberra, 1994

১৪. Bullard, Robert D., "Anatomy of Environmental Racism and the Environmental Justice Movement", in Dryzek, John S. and Schlosberg, David (eds.), *Debating The Earth : The Environmental Politics Reader*, Oxford University Press, London, 1998

১৫. Cadman, T., 'Sourcing North American timbers: implications for Australia’s built environment', in *Rethinking the Built*

Dhaka University Institutional Repository

Environment: Pro-ceding of Catalyst '95 Conference, ed. J. Birkeland, 1995

১৬. Callahan, Daniel, "What Obligations Do We Have to Future Generations", In Partridge, Ernest (ed.), *Responsibility to Future Generations: Environmental Ethics,* Prometheus Books, Buffalo, New York, 1981

১৭. Cameron, J., 'The precautionary principle—core meaning, constitutional framework and procedures for implementation', in Harding, R. and Fisher, L. (eds) *The Precautionary Principle: Conference Papers, Institute of Environmental Studies*, University of New South Wales, Sydney,1993

১৮. Carmen, R., 'The logic of economics vs. the dynamics of culture: daring (to (re)invent the common future', in *Feminist Perspectives on Sustainable Development,* ed. W. Harcourt, Zed Books, London, 1994

১৯. Callicott, John Baird, "Non-Anthropocentric Value Theory and Environmental Ethics", *American Philosophical Quarterly*, Vol. 21, 1984

_, "The Conceptual Foundations of the Land Ethics", in Callicott, John Baird, *Defense of the Land Ethics*, State University of New York Press, Albany, 1989,

_, "Animal Liberation: A Triangular Affair", in Scherer, Donald and Attig, Thomas (eds.), *Ethics and the Environment*, Prentice-Hall, Inc, New Jersey, 1983,

_, "Non-Anthropocentric Value Theory and Environmental Ethics", in *American Philosophical Quarterly*, Vol. 21, No. 4, 1984

_, "Intrinsic Value, Quantum Theory and Environmental Ethics", in *Environmental Ethics*, Vol. 7, 1985

Dhaka University Institutional Repository

২০. Cowell, Mark, "Ecological Restoration and Environmental Ethics", in *Environmental Ethics*, Vol. 15, No.1, 1993

২১. Dobel, Patric, "The Judeo-Christian Stewardship Attitude Toward Nature", in Pojman, Louis P. (ed.), *Environmental Ethics*, Jones and Bartlett Publishers, London, 1994

২২. Elliot, Robert , "Environmental Ethics", in Peter Singer (ed.), *A Companion to Ethics*, Blackwell, USA, 1993

২৩. Hargrove, Eugene C., "Weak Anthropocentric Intrinsic Va lue", in *The Monist*, Vol. 75, No. 2, April, 1992

২৪. Hayward, Tim, "Anthropocentrism: A Misunderstood Problem", in *Environmental Values*, Vol. 6, 1997

২৫. Lee, Keekok, The Source and Locus of Intrinsic Value: A Reexamination", *"The Environmental Ethics,* Vol. 18, 1996

২৬. Leopold, Aldo, "The Land Ethic" in Scherer, Donald and Attig, Thomas (ed.), *Ethics and the Environment*, Prentice Hell, New Jersey, 1983

২৭. Moore, G. E., "The Conception of Intrinsic Value", in *Philosophical Studies*, Routledge & Kegan Paul Ltd, London, 1922

২৮. Naess, Arne, "A Defense of Deep' Ecology Movement", in *Environmental Ethics*, Vol. 6, 1984

_, "The Shallow and the Deep: Long Range Ecology Movement", *Inquiry*, Vol. 16, 1973,

_, "A Defense of Deep Ecology Movement", *Environmental Ethics*, Vol. 6, 1984,

_, "Ecosphy T: Deep versus Shallow Ecology", in Louis P. Pojman (ed.), *Environmental Ethics: Readings in Theory and Application*, Jones and Bartlett Publishers, London, 1994

Dhaka University Institutional Repository

২৯. O'Neill, John, "The Varieties of Intrinsic Value", in *The Monist*, Vol. 75, No. 2, April, 1992

৩০. Regan, Tom, "Weak Anthropocentric Intrinsic Value", ink Chris Par (ed.), *The Environment*, 2"d edition, Routledge, London, 2001

৩১. Rodman, John, "Four forms of Ecological Consciousness Reconsidered", in Donald Schere & Thomas Attig (eds.), *Ethics and the Environment*, Practice Hall Inc., New Jersey, 1983

৩২. Rolston III, Holmes, "Value in Nature and the Nature of value", in Andrew Light and Holmes Rolston III, (eds.), *Environmental Ethics: An Anthology*, Blackwell Publishers Ltd. UK, 2003 ,

_, "Values at Stake: Does Anything Matter: A Response to Ernest Partridge", in Louis P. Pojman (ed.), *Environmental Ethics: .Readings in Theory and Application*, Jones and Bartlett Publishers, London, 1994

_, "Yes, Value is intrinsic in Nature", in Louis P. Pojman (ed.), *Environmental Ethics: Readings in Theory and Application*, Jones and Bartlett Publishers, London, 1994

৩৩. Rechard Routhley and Val, Routhley, "Against the Inevitability of Human Chauvinism", in Robert Elliot, (ed.), *Environmental Ethics*, Oxford University Press, New York, 1995 ,

_, "Human Chauvinism and Environmental Ethics", D. S. Mannison et al. (eds.), *Environmental Philosophy*, Department of Philosophy, Australian National University, 1980

৩৪. Routhley, Val, 'Critical note on, "Passmore, John, Man's Responsibility for Nature, London, Duckworth, 1974"1, in *Australasian Journal of Philosophy*, Vol. 53, No. 2, August 1975

৩৫. Schweitzer, Albert, "The Ethics of Reverence for life", in *Civilization and Ethics*, Unwin Books, London, 1997

Dhaka University Institutional Repository

৩৬. Skolimowski, Henryk, "The Dogma of Anti-Anthropocentrism and Ecophilosophy", *Environmental Ethics*, Vol. 6, 1984

৩৭. Sprigge, T. L. S., "Are There Intrinsic Values in Nature?", in Brenda Almond and Donald (ed.), *Applied Philosophy: Morals and Metaphysics in Contemporary*, Debate, Routledge, London and New York, 1991

৩৮. Sterba, James P., "Reconciling Anthropocentric and Non-anthropocentric Environmental Ethics", in Hugh LaFollette, (ed.), *Ethics in Practice: An Anthology*, Blackwell, USA, 1997

৩৯. Taylor, Paul W., "Are Humans Superior to Animals and Plants?" in *Environmental Ethics*, Vol. 6, 1984

৪০. White, Lynn, "The Historical Roots of our Ecological Crisis", in *Science*, 1967

******